অভিবাসী

বেগম জাহান আরা

আইডিয়া প্রকাশন
সাহিত্য-সংস্কৃতি
জ্ঞানচর্চা, ইতিহাস-ঐতিহ্য
সংগ্রহ, সংরক্ষণকেন্দ্র

www.আইডিয়া.বাংলা

অভিবাসী বেগম জাহান আরা
প্রকাশক মাসুদ রানা সাকিল
আইডিয়া প্রকাশন
রংপুর, বাংলাদেশ
✆+৮৮০১৭২৬ ৯৭৬৯৮২
© প্রকাশক
দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০২১
প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০
প্রচ্ছদ সাকিল মাসুদ
মুদ্রণ ও গ্রাফিক্স আইডিয়া প্রেস, রংপুর
মূল্য ৩০০ টাকা
অনলাইন পরিবেশক আইডিয়া.বাংলা
রকমারি ডট কম

OBHIBASHI BEGUM JAHAN ARA
Publisher Masud Rana Shakil
IDEA PROKASHON
Rangpur. ✆ 01726976982
e-mail adideabd@gmail.com
Price 300TK. $8
ISBN 978-984-522-095-8

স্বপ্নপিয়াসী প্রজন্মদের

এক

-হ্যালো মা, কেমন আছো?
-আমরা ভালো। তোরা কেমন?
-নতুন করে কী বলি মা, ভালো লাগছে না এখানে।
-এই কথাটা ছাড় তো বাবা।
-কী করে ছাড়ি মা বলো? কথাটা যে খুব সত্যি।
-বার বার একই কথা বললে কি আর সমস্যা দূর হবে?
-কিন্তু এতো ঠাণ্ডা যে কিছুতেই ভালো লাগে না। একটুও না।
-এই তো প্রথম ঠাণ্ডা পেলি। তাই একটু কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারি। এটা সয়ে যাবে মা।
-না মা তুমি বুঝবে না। মাইনাস ডিগ্রি শুধু নয়, মাইনাস দশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত ঠাণ্ডার চলাচল। কার ভালো লাগে বলো?
-তুই না বিদেশে পড়তে চাইতি সবসময়? ভুলে গেছিস সে কথা?
-কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিও না মা। সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছি আমি। কেনো কেউ বোঝো না আমার কষ্ট?
-ছি ছি, কি বলিস বাবা? তোকে সাহস দেয়ার জন্য বলছি। অন্যভাবে নিস না আমার কথা।
-সংসার, বাচ্চা, ঠাণ্ডা, একাকিত্ব সবটাই আমার বিপক্ষে মা।
-ও দেশে কি আর বাংলাদেশি কেউ নেই বলতো?
-সে তো নিশ্চয় আছে।
-তাদেরও কষ্ট হচ্ছে অবশ্যই। না কি?
-মনে হয় পালিয়ে যাই এ দেশ ছেড়ে।
-সে কি কথা নিরা? বলতে হয় না এসব।
-মাসুম তো সারাদিন লাপাত্তা। আমি একা একা হাঁপিয়ে উঠি।
-ওখানে বাংলাদেশি কারো সাথে পরিচয় হয়নি?
-হয়েছে কয়েকজনের সাথে।
-ওদের সাথে মেলামেশা করিস, হয়তো ভালো লাগবে।
-আমার ভালো লাগে না মা এখানে। তুমি একবার এসো না কিছু দিনের জন্য। না এলে ভাববো আমাকে বনবাসে দিয়ে ভালো আছো তোমরা।

মা আর মেয়ের এই ধরনের কথা আজকাল প্রায়ই হচ্ছে। ছয় সাত মাসেই এমন উচাটন হয়ে উঠলে তো বিপদ। সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নিরা। বাবা ইমতিয়াজ খান আর তার কয়েক বন্ধু মিলে ডাক্তারদের ফার্ম করেছিলেন সাত মসজিদ রোডে। অনেক দিন লেগেছে পসার জমাতে। কারণ তখন ডাক্তারের পাড়া ছিলো অন্যদিকে। সাত মসজিদ সড়কের ফার্মে লোকজন আসতো কম। এখন তো সাত মসজিদ পুরো রাস্তা জুড়েই ডাক্তারদের রমরমা ব্যবসা। ধানমন্ডি দুই নম্বরে ঢোকার পর থেকেই শুরু হয়ে গেছে ব্যবসা। ডানে বাঁয়ে হয় ডায়াগনস্টিক সেন্টার, নয় ডাক্তারদের চেম্বার। ধানমন্ডি দুই নম্বরের শেষ থেকে মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তাটুকুতে বেশ ক'টা হাসপাতালও হয়েছে এখন।

চোখের ডাক্তার ইমতিয়াজ আর মেহনাজ মিলির একমাত্র সন্তান নিরা। নয়নের মনি হিসেবে বড়ো হয়েছে মনিজা দিলশাদ নিরা। স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দে আদরে আহ্লাদে বড়ো হয়েছে। মোটামুটি শান্ত স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু একবার রাগ হলে বিপদ হয়ে যেতো ছোটোবেলায়। সেটাও বোঝাতে বোঝাতে কমে গেছে অনেক। ছোটোবেলা থেকেই শখ ছিলো বিদেশে পড়বে। মানে শখের স্বপ্নটা মনে তুলে দিয়েছিলো মিলিই। মেয়েকে কোলে নিয়ে দুলে দুলে বলতো, আমার সোনা লেখাপড়া শিখে বিদেশ যাবে, কত্ত বড়ো চাকরি করবে, কত্ত দেশ দেখবে। তুই তো আমাদের ছেলেই রে। লেখাপড়া শিখলে ছেলে মেয়েতে তফাত কি আর?

ও লেভেল পাশ করলো নিরা ভালোভাবে। এ-লেভেল থেকেই শুরু হলো তার আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সের জন্য বিদেশে লেখালেখি। মা বলে, এখনই কী রে মা? এ-লেভেলটা পাশ করে নে। গিটারের কোর্সটা শেষ কর। আর কিছুদিন আমাদের কাছে থাক।

বাবা বলে, ছেড়ে দাও। ও যদি নিজে নিজে কিছু করতে পারে তাহলে করুক না। আগে কিছু হোক তো!

নিরা স্বপ্নে বিভোর। লেখালেখি চলছে। হয়ে যাবে কোথাও না কোথাও। ছুটির দিন মন ভালো থাকলে সে কি ধুম ধাড়াক্কা গিটার বাজানো! দু-তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। ওদের একজন বেশ ভালো কিবোর্ড বাজায়। মেয়েটার নাম জুলিয়ানা। ওর বাবাও ডাক্তার। বাকি দু'তিনজন ভোকালিস্ট। গায় পপসং। গলা খারাপ নয়, কিন্তু গানের ঢঙই এমন যে মিলির খুব একটা পছন্দ না। তার পছন্দ নজরুলের রাগ প্রধান গান। শখ ছিলো তারও গান শেখার। কিন্তু হয়নি মওলানা নানার জন্য। যাক যেদিন গেছে তা তো গেছেই।

সামনে পরীক্ষা। তবু মেইল চেক করে নিরা। যদি কোনো খবর আসে! ভালো কিছু পেলে সে চলে যাবে সাত সাগর পাড়ি দিয়ে। পশ্চিম হলে ভালো। নাহয় দক্ষিণ, মানে অস্ট্রেলিয়া হলেও আপত্তি নেই। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে হলেও, মানে আমেরিকা বা কানাডা হলেও চলে যাবে। এরই মধ্যে তার দুজন বন্ধু চলেও গেছে নিউজিল্যান্ড আর তাসমানিয়ায়।

মা বাবা চায় না যে, নিরা বিয়ের আগে বাইরে যাক। কিন্তু বলে না সে কথা নিরাকে। ভেতরে ভেতরে নিরার বিয়ের চেষ্টা করে তারা। নিয়তি। ভালো এসেও গেলো। যেনো প্রজাপতি উড়ে এলো ঘরে। সদ্য এমবিএ পাশ করে এক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির চাকরিতে যোগ দিয়েছে শোয়েব মাসুম। মনকাড়া ছেলে এক কথায়। ভালো স্পোর্টসম্যান। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে ছাড়া ক্রিকেট খেলাই হতো না। এখন আর যেতে পারে না কাজের চাপে।

নিরার সাথে মাসুমের পরিচয় হলো। বাবা মা পর্যায়ে পরস্পরের বাড়িতে শুরু হলো যাওয়া আসা। বাকিটা প্রজাপতিই টেনে নিয়ে গেলো বলতে হয়। দু তিন মাসে যতোটা জানা যায়, তারই ভিত্তিতে ঊনিশ বছরের নিরাকে অনিচ্ছাসত্ত্বে বসতে হলো বিয়ের পিঁড়িতে। মিলি বললো নিরাকে, বিয়েটা হলো ভাগ্য মা। কোথায় কখন কার সাথে কার জোড়া মিলে যায়, কেউ বলতে পারে না। বাবা বললো, তোর কপাল ভালো রে মা। মাসুমও বিদেশে যেতে চায় উচ্চতর ডিগ্রি করতে। হয়তো আগামি বছরেই যাবে। তুই চাইলে বিয়ের পর ভর্তি হতে পারিস কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে।
-না বাবা এখানে ভর্তি হয়ে কি হবে আর? নিরা বলে।
-বসে থাকতে ভালো লাগবে না। তাই বলছিলাম।
শ্বশুর প্রফেসর খায়ের সাহেবও চান, নিরা ভর্তি হোক। শাশুড়ি নাজিফা চান, পড়ার পাশাপাশি নিরা একটা রান্নার কোর্স করুক। ওরা সবাই ভোজনরসিক। বিদেশে গেলেও রান্নাটা কাজে লাগবে।

মিলি ভাবে, নিরার গিটারের কথা কেউ বলে না। কি সুন্দর বাজায় মেয়েটা! এই সময়ে বিদেশে গেলে কোর্সটা আর করা হবে না। তারও গান শেখা হয়নি, মেয়েটারও গিটার শেখা হবে না। সব সময় যে বাড়ির প্রতিকূল অবস্থার জন্য শখের কিছু করা হয় না, তা নয়। পরিস্থিতিও দায়ী থাকে। মনকে বোঝায় মিলি।

যাচ্ছি যাবো করে হানিমুনে যেতেই দেরি হলো মাস তিনেক। ওখান থেকে ফিরে এসে নিরা জানালো, সে ক্যারিং। মাসুম তো মহা খুশি। বাড়ির বড়ো

ছেলে সে। তার বাবার শখ ছিল, নাতি-নাতনি আসুক ঘরে। সাধ আছে সাধ্য আছে, এতো বড়ো বাড়ি খাঁ খাঁ করে। মা নাজিফাও খুশি। তবে এই বয়সে দাদি হতে কেমন লাগবে সেটা ভাবে মাঝে মাঝে। তা বলে এতো তাড়াতাড়ি আসবে সুখবর, সেটা ভাবেনি কেউ।

নিরার মা বাবা খুশি হতে পারেননি। নিরা কিছু বুঝতে পারছে না। বিয়ের তিন মাস যেতে না যেতেই এমন কিছু ঘটবে সেটা ভাবেই নি তারা। খুব যে সচেতন ভাবে তারা হানিমুনের সময় কাটিয়েছে তাও নয়। তবে মাসুম বেশ উদার। বউকে বললো, তুমি চাইলে বাচ্চা নেবে, নাহলে 'এম আর' করিয়ে নিতে পারো।

চমকে ওঠে নিরা। বলে, কি বলছো মাসুম?

-অপশন তোমার নিরা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাচ্চা কোলে এলে পারবে তো সামলাতে?

-পারবো। দুই বাড়িতেই ডাক্তার। চিকিৎসার চিন্তা নেই। আর আছে দুই মা। এতো ভাবছো কেনো?

-আমাদের বাড়িতে ডাক্তার পেলে কোথায়?

-সেজান তো হাফ ডাক্তার হয়েই গেছে।

-তাই বলো। ও তোমাকে বেশ পছন্দ করে ফেলেছে।

-ইমানকে বাদ দিচ্ছো কেনো?

-তাও ঠিক। মাসুম কি যেনো ভাবে।

-কি হলো? কোথায় গেলে?

-কে? আমি?

-হ্যাঁ। কদিন থেকেই দেখছি কি যেন ভাবো মাঝে মাঝে।

-তেমন কিছু না। মানে আগামি বছর যদি বাইরে চলে যাই, তখনকার কথাই ভাবি।

-তুমি বেশি বেশি প্র্যাক্টিক্যাল।

-তোমার কথা ভেবেই শুধু। বিদেশে তো আর কাজের লোক পাওয়া যাবে না। আমি কতোটা শেয়ার করতে পারবো তাও জানি না। পড়বে তো তোমার কাঁধেই সব। না?

-আমাদের বোকামির জন্যই তো সব হলো। তবে আমি কিন্তু স্পিরিটে নিয়েছি। প্রথম সন্তান যখন এসেই গেছে, তখন থাক ও আমাদের ভালোবাসা হয়ে।

-আমার ধারণা ছিলো, তুমিই এখন বাচ্চা চাইবে না। এখন দেখছি ব্যাপার অন্য রকম। মাসুম হাসে মিষ্টি করে।

-কি রকম? নিরাও হাসে চোখে চোখ রেখে।

-তুমি খুব মা মা হয়েছো এই ক'দিনেই।
-তার মানে?
-আর কিছুদিন বউ বউ থাকলে ভালো হতো আমার জন্য। অন্তত বছর খানেক তোমার শেয়ার দিতে চাইনি কাউকে। চোখ কুঁচকে হাসে মাসুম। এটা ওর দুষ্টুমির হাসি।
-হিংসুক। দুটো কিল বসিয়ে দেয় নিরা মাসুমের পিঠে।

শ্বশুর বাড়ি তার বেশ পছন্দ হয়েছে। ভারি ভালো মানুষ সবাই। নিজেদের বড়ো বাড়ি মহাখালিতে। মানুষ বলতে মাসুমের আর দুই ভাই, সেজান আর ইমান। ননদ নেই তার। তো একটা বাচ্চা-কাচ্চা ঘরে এলে ভালো লাগারই কথা।

শাশুড়ি নাজিফা খুব গিন্নি মানুষ। কে বলবে যে ইংলিশে অনার্স পাশ করা মহিলা। সারাদিন ভালো-মন্দ রান্না নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। অবসরে বই পড়তে ভালোবাসেন। কখনও রাত জেগেও পড়েন। তাঁর তিন ছেলের বন্ধু বান্ধবও অনেক। কেউ না খেয়ে যায় না এই বাড়ি থেকে। কাজের গণ্ডা খানেক লোকও ব্যস্ত থাকে ঘরের কাজে। কেমন লঙ্গরখানা টাইপের বাড়ি। নানা রকম সুখাদ্য খেতে ভালোবাসে সবাই। খাওয়া নিয়ে বেশি বাছাবাছি নেই। নিরাদের বাড়ির ঠিক উল্টো। ডাক্তারের বাড়ি যে, তা খানাপিনা দেখে বোঝা যায়। বেশ বাছা বাছি আছে খাবারের।

দিন কি বসে থাকে? ফুটফুটে ছেলে এলো নিরার কোল জুড়ে। মিলি আর ইমতিয়াজ খুব খুশি নাতি দেখে। কিন্তু নাজিফা আর খায়ের সাহেব চেয়েছিলেন নাতনি হোক। বাড়িতে একটা মেয়ে আসুক। মেয়ে না হলে বাড়ি মানায়? তাদের কপালে তো হয়নি। যাক, সবই ওপরওয়ালার ইচ্ছে। খুশি সবাই নতুন প্রজন্ম পেয়ে। গুটি গুটি হাত পা নাড়াচাড়া দেখে দেখে আশ মেটে না কারো। তিনদিনের বাচ্চা একবার ঠোঁট বাঁকা করে একটু হাসলো। সে কি তুমুল খুশি সবাই! এখনই হাসতে শিখে গেছে! কতদিন পরে বাড়িতে নতুন বাচ্চা! জ্যান্ত একটা পুতুল। ছবি তোলা হচ্ছে বেশুমার। হাসির, কান্নার, হাই তোলার, ঘুমের ছবি।

এবার একটা নাম চাই। কাজটা সহজ, কিন্তু আবার সহজ নয়। সে কি আয়োজন নাম রাখা নিয়ে! বাজারে নামের বই পাওয়া যায়। কিনতে হলো বই। কিন্তু একটা নয়, চারটা। কারণ একটা বই হলে কাড়াকাড়ি হচ্ছিলো। নিরাদের বাড়িতে একটা বই আর মাসুমদের বাড়িতে তিনটে বই। রীতিমতো গবেষণা শুরু হলো। আরবি ফারসি নাম দ্বিতীয় প্রজন্মের কারো পছন্দ হচ্ছে

না। এই গবেষণা দানা বাঁধলো মাসুম, সেজান, ইমান আর নিরার মধ্যে। ওদের অতি উৎসাহ দেখে বড়োরা ইস্তফা দিলো নাম খোঁজার কাজে।

ইমান বলেই দিলো মান্ধাতা আমলের নাম কিন্তু চলবে না। দুই অক্ষরের নাম হলেই সবচেয়ে ভালো হয়।
-তিন অক্ষর হতে পারে না কেনো? সেজান বলে।
-আমি নিরাপত্তা পছদ করি, মাসুম বলে। মানে, সেও কেটে পড়লো।
নিরা বলে তাহলে আমাদের দাদা নানাদের আমলের একটা যাহোক নাম রেখে ফেলো। পিচ্চি, বাবু, গুল্লু, লাল্টু, পুটুস, এই সব করতে করতে শেষে নাম একটা টিকে যায় ঐগুলো থেকে।
মাসুম বলে, এক কাজ করা যাক। নাম রাখার দায়িত্বটা বড়োদের ওপরেই ছেড়ে দেয়া যাক।
হা হা করে ওঠে ইমান, বলে, তাহলেই হয়েছে।
-ভাগ্য ভালো যে পিচ্চিটা মেয়ে নয়। তা হলে তো বড়োদের কাছ থেকে সেই হোসনে আরা, রওশন আরা, জেবুন্নিসা, করিমুন্নিসা এই সব নামের তালিকা আসতো, সেজান বলে।
-ঠিক বলেছো ভাই, নিরা তাল দেয়।
অশেষ গবেষণা করে অবশেষ তিনটে নামের তালিকা এলো, যেমন; শুভ্র, কথা, সময়। মাসুম কোনো নাম দেয়নি। সেখান থেকে নেয়া হলো, কথা। বাবা মায়েরা শুনে হেসে বললেন, এই নাম তো আগে শুনিনি রে বাবা। তো যাক, তোরা যখন ঠিক করেছিস, তখন কথা-ই সই।
ছেলের নাম হলো 'কথা'।

মেয়ের ফোন পেয়ে পেছন দিকে স্মৃতির ক্যানভাসের ওপর ঝটিকা সফর করে আসলেন মিলি। যাওয়ার সময় তো মনে হলো খুশিতে ডগমগ হয়ে দৌড়ে চলে গেলো নিরা। এই কয়েক মাসের মাথায় আর ভালো লাগে না কানাডায়? সে কি বাচ্চার কাজের জন্য? নাকি ঠাণ্ডার জন্য? মাসুম কি সময় দিতে পারে না? কিছুই তো বলে না মেয়ে। শুধু এক কথা, এখানে ভালো লাগে না।

বাবা মায়েরা বসে ঠিক করলেন, কেউ একজন গিয়ে মাস দুই থেকে আসুক। পরিযায়ি পাখিরা তবু আবহাওয়ার কারণে উত্তর মেরু থেকে উড়ে আসে বাংলাদেশে। এখনকার বাবা মায়েদের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। কাউকে না কাউকে উড়ে যেতে হবে মাইনাস ১৫-২৫ ডিগ্রি ঠাণ্ডার দেশে। পাখিরা প্রকৃতির অনুকূলে চলে। আর মানুষকে চলতে হয় পরিস্থিতির প্রতিকূলে। প্রকৃতির প্রতিকূল-অনুকূল বলে কিছু নেই। কিছু করারও নেই।

প্রশ্ন হলো কে যাবেন কানাডায়? অবশ্যই দুই মায়ের একজন। নাজিফার ভরা সংসার। মিলিরও ভরা সংসার একমাত্র স্বামীকে নিয়েই। মফস্বল শহরে মিলির শ্বশুর-শাশুড়ি আছেন। বয়স হয়েছে তাদের। পুরনো দিনের সংসার। কাজের লোকজন, আশ্রিতজন, পশু-পাখি নিয়ে থাকেন তারা। বললেই কি আর ছেলের বাসায় এসে থাকতে পারবেন? ছেলে-মেয়ের বিয়ে থা দিয়ে তারা নিজেদের মতো করে গুছিয়ে থাকেন। ধরে বেঁধে নিয়ে এলেও বেশিদিন থাকতে চান না। সে কি মাটির টান? কে জানে! মিলির নিজের বাবা মারা গেছেন অনেক আগেই। মাও নেই। ভাই-বোন ব্যস্ত নিজেদের নিয়ে।

মাসুমের দিকের দাদি-নানি আছে। দাদা-নানা নেই। তাদেরও একই অবস্থা। পুরনো দিনের গৃহস্থ পরিবার। দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন থাকে বাড়িতে। কালেভদ্রে ছেলে বা মেয়ের বাসায় আসেন তারা। থাকতে চান না ঢাকায়। কিছুই ভালো লাগে না ঢাকার। দেশের বাড়ির মতো টাটকা শাক-সবজি, মাছ পাওয়া যায় না। ছেলে মেয়েরা কথা বলে না। সময় নেই কারো। সারাদিন তারা ব্যস্ত। কিসে ব্যস্ত সেটাও বোঝেন না। বাড়িতে লোকজন আছে তবু গায়ে পড়ে কেউ বাড়তি কথা বলে না। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। খেজুরে আলাপ জানেই না এরা। শহুরে লোক বুঝি এমনই হয়। তাদের তো আর অত কাজ নেই। খেজুরে কথাই বেশি। এই করেই জীবন তো কেটে গেলো।

তার ওপর কথা আছে। নিরার চাচার বাসায় কিছুদিন ছিলেন মিলির শাশুড়ি, মানে নিরার দাদি। তেমন একটা মানিয়ে চলতে পারেননি। ইমতিয়াজের ছোটো ভাই ইলিয়াস ব্যবসা করে। সারাদিন কাজ তার। একবার ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মিলির শ্বশুরের পা ভেঙে যায়। তখন ইমতিয়াজ বাবাকে নিয়ে আসে ঢাকায়। পঙ্গু হাসপাতালে থাকতে হয়েছিলো পাঁচ সপ্তাহ। বাবার সেবার জন্য মাকেও আনতে হয়েছিলো। বাবা ভালো হয়ে বাসায় এলে ইলিয়াস বললো, এবার তার বাসাতে বাবাকে নিয়ে যাবে সে। বিপত্তি আর কাকে বলে। ওখানে যাওয়ার তিন দিনের মাথায় বিশেষ খবর পেয়ে নিরার দাদুকে চলে যেতে হয় দেশের বাড়ি কুমিল্লা। সদর থেকে বেশ কিছু দূরে বাড়ি।

নিরার দাদি থেকে গেলেন ইলিয়াসের বাসায়। ছেলে ব্যবসাদার লোক। সচ্ছল অবস্থা। ইলিয়াসেরও দুই মেয়ে। মানে, দুই ভাইয়ের তিন মেয়ে। ছেলে নেই কারো। সেটা নিয়ে শাশুড়ির দুঃখ ছিলো। মাঝে মাঝে বলতেন ছেলেদের, তোদের এতো কষ্টের সহায় সম্পদ সব পরের ছেলের জন্যই গুছিয়ে দিচ্ছিস। আগেকার দিনের মানুষ যেমন বোঝেন, যেমন শুনেছেন, সেটাই বলেন। এবং বলেন বেশ আফসোসের সাথেই।

ইমতিয়াজ ইলিয়াস এবং মিলি কিছু মনে করে না। কিন্তু ইলিয়াসের বউ সামিনার ভালো লাগে না। একদিন বলেই বসলো, জামাই পর হবে কেন মা?
-মেয়ে তো চলে যায় পরেরই বাড়ি মা। ছেলে তো আর যেত না।
-আজকাল ছেলেরাও চলে যায় নিজেদের আলাদা সংসারে।
-কিন্তু সম্পত্তি তো তারই থাকে। অন্য কেউ পায় না।
-দরকার হলে ঘর জামাই রেখে দেবো।
-কি বলো ছোটো বউমা? শাশুড়ি অবাক হয়ে বলেন, মেয়ে বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ি পাঠাবে না?
-যদি না পাঠাই, তাহলে জামাই আমার ঘরের ছেলে হয়ে যাবে। সামিনা নিজের মতো টেকাতে চেষ্টা করে।
-তা কি আর হয় মা? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাশুড়ি। মনে মনে ভাবেন, আজকালকার বউ-ঝিরা যেন কেমন হয়ে গেছে! পুরনো মানুষদের কথাকে পাত্তাই দেয় না। তাই তো ঠকে। কতো নজির আছে। ঘরজামাই একদিন সর্বস্ব দখল করে নেয়। আবার মেয়ের সুবাদে শ্বশুরের সম্পত্তি দু'হাতে ওড়ায়। দেউলিয়া করে দেয় সংসার, সম্পদ সব।

তো শ্বশুর চলে গেলেও শাশুড়িকে, মানে ইলিয়াসের মাকে যেতে দিলো না ইলিয়াস। খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছোটো ছেলের বাসায় থাকলেন নিরার দাদি। একেতো স্বামীকে ছেড়ে তিনি থাকেননি কখনও। মানুষটা আলাভোলা। সব গুছিয়ে তুলে দিতে হয় হাতে। তবে বয়স্ক খালাটা আছে, সে পারবে। পর হলে কী হবে। খুব খাঁটি মানুষ খালা। তিন কুলে কেউ ছিলো না একমাত্র চার বছরের নাতনি ছাড়া। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় তাদের গ্রামের বহু লোক মারা যায়। কাছিমের প্রাণ বলে বেঁচে আছে সে আর তার নাতনিটা। অথবা কানা যম দেখতে পায়নি তাদের। এই আফসোস উঠলে আর রক্ষা নেই।

বিদেশি সাহায্য এলো দেশে। অনাহার জর্জরিত শিশুদের তখন অনেক মা বাবা বেচে দিয়েছে বা দিয়ে দিয়েছে স্বচ্ছল লোকদের কাছে। অন্তত খেয়ে পরে বেচে থাকবে। সেই বছরই খালাও বেচে দিয়েছে তার নাতনিকে এক বিদেশি দম্পতির কাছে। তারপর সে ভিক্ষা করতো। কীভাবে যেন ইমতিয়াজের চোখে পড়ে যায়। অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো পথের ধারে। ডাক্তার মানুষ, চিকিৎসা করে বাঁচিয়ে তোলে। সেই থেকে খালা তাদের বাড়িতে আছে। বড়ো দুঃখি মানুষটা। তার মনে কতো যে মায়া! চল্লিশ বছর হয়ে গেছে নাতনিকে বেচে দেয়া। তবু তার জন্য কাঁদে প্রায়ই। একই কথা, আর কি কোনোদিন দেখা হবে? লেখাপড়া করে নিয়ে গেছে সাহেব আর

মেমসাহেব। তার কোনো দাবিও নেই। কোন দেশে যে আছে তাও জানে না খালা।

নিজের সংসারে শাশুড়ি যেমন করে চলেছে, তা হয় না ইলিয়াসের বাড়িতে। শোয়া-বসা, খাওয়া-নাওয়া, রান্না-বাড়া, সব কিছুই অন্য রকম। বড়ো সমস্যা নয় কোনোটাই। তবু সবটাতেই বাধো বাধো লাগে। আর সমস্যা? সেটাও মানসিক। প্রথম সমস্যা হলো, অজু করবে কোথায় মা? বেসিনে হাত মুখ ধোয়া যায়। কিন্তু পা ধোবে কোথায়? যেখানেই ধোবে সেখানেই পানি পড়বে। পাথরের টাইলস বসানো বাড়ি। ঘষে মুছে ঝকঝকে করে রাখে কাজের লোকজন। রান্নাঘরের দরজাতে বসেও অজু করতে পারে না। পানি পড়ে বাহির বারান্দায়। এমন কি বাথরুমের মেঝেতেও পানি পড়তে পারবে না। আগের বাড়িতে এই ঢং ছিলো না। নতুন বাড়িতে নতুন ঢং মায়ের ভালো লাগে না।

তবে সামিনা বলে দিয়েছে কাজের লোকদের, মায়ের সব কাজে তারা যেনো হাত লাগায়। কাজ মানে তো প্রধানত দিনে কয়েকবার অজুর পানি মোছা। আর দৈনন্দিন জীবনে কাপড় ধোয়া, বিছানা করে দেয়া, একটু ফুট ফরমাস খাটা। কখনও মাথায় জবাকুশুম তেল আর একটু পানি চাঁদিতে বসিয়ে দেয়া। সবই করে কাজের মেয়ে কুলসুম।

অসুবিধে নেই কিছু মায়ের। কিন্তু উৎপাত মনে হয় তখন, যখন অজুর পানি মোছার জন্য উড়ে আসে দু'তিনজন। যেনো মহা একটা কিছু ঘটে গেছে। এখনি না মুছলেই নয় পানিটা। এ কেমন বাতিক হয়েছে বউটার?

আগে এসব ছিলো না। এখন শুধু বয়স বাড়ছে না, টাকা-পয়সা বাড়ছে, শান-শওকত বাড়ছে। বাড়ছে তার সাথে দাপট। ইলিয়াসও যেন কেমন হয়ে গেছে। নিজের ছেলেকে পর পর মনে হয়। গুনে গুনে কথা বলে। কথার ওপর কেউ যেনো ট্যাক্স বসিয়েছে।

সকালে এক সাথে নাস্তা করা হয়। টাপুর আর টুপুর পাখির মতো খায়। ইলিয়াস রুটি-পরাটা, ডিম, সবজি বা পাউরুটি-মাখন-ডিম যখন যা থাকে টেবিলে তাই খেয়ে নেয় চটপট। তারপর সে উঠে পড়ে। এবার সে যাবে অফিসে। সামিনা এক টুকরো পাউরুটি নিয়ে তখনও নাড়াচাড়া করে। দারুণ অনীহা প্রকাশ করে সে খাওয়াতে। ইলিয়াস বলে, এক টুকরো রুটি খেতে পারো না? খাও কী সারাদিন? এভাবে চলে?
-আজকাল একদম খেতে ইচ্ছে করে না গো। কি যে করি?
-ডাক্তারের কাছে যাও না কেনো?

-ঠিক আছে তুমি যাও না ভাই। আমি খাবো আস্তে আস্তে।
-ওকে, তুমি খেতে থাকো, আমি আসি মিনা। জরুরি মিটিং আছে। বা—ই।
-টিফিন বক্স নিয়েছো? আজ কাবাব আর লুচি দিয়েছি। কমলাটা খেও। ফিরিয়ে এনো না।
-ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি ঠিক মতো খেও। বলতে বলতে চলে যায় ইলিয়াস। ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, আসি মা।

শাশুড়ির খাওয়া হয়ে যায়। পাউরুটি তার ভালো লাগে না। আটার রুটি আর সবজি তার প্রিয় খাবার। মাঝে মাঝে পরাটা ডিম কলাও খায়। তারপর খুব ভালোবেসে খায় কড়া এক কাপ চা। সেটা বানাতেই পারে না কুলসুম। নিজে বানিয়ে খাওয়া যায় না বড়োলোকের বাড়ি। তাহলে নাকি কাজের লোক খারাপ হয়ে যায়। যাক, পানসে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মা চলে যান নিজের ঘরে।

মিনা বসে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটু করে কামড়ায়। টেবিল ফাঁকা হয়ে গেলে সে কাজের মেয়েটাকে ডাকে, কোথায় গেলি কুলসুম?
-জি আম্মা। এসে দাঁড়ায় কুলসুম।
-দেখতে পাচ্ছিস না আমি কিছু খেতে পারছি না?
-হ, দ্যাখতাসি তো। কি দিমু কন!
-তোর আব্বার জন্য যে কাবাব বানালি, সেটা আর নেই?
-হ, আছে তো। আন্যা দিই?
-দুটা কাবাব আন। আর পরাটা নেই?
-নাই, তয় বানাইতে কতসুম লাগবো?
-একটা পরাটা মচমচে করে বানিয়ে আন। গোল পরাটা বানাবি। আর শোন, কালকে মেহমান খাবার পরে রোস্ট ছিলো না ফ্রিজে?
-হ, আসে তো। সেউই-জর্দাও আছে।
-যা পারিস আন। খিদে আছে পেটে কিন্তু কিছু খেতে পারছি না। কি যে এক ঝামেলা হয়েছে। মিনা একা একা কথা বলে।

শাশুড়ি ঘরে বসে বসে শোনেন আর দেখেন, কাজের মেয়ে কি চটপট পরাটা বানিয়ে আনে। দুটো কাবাব আনে। ফ্রিজ খুলে মুরগির রোস্ট আর সেমাই-জর্দা মাইক্রো ওভেনে গরম করে এনে সাজিয়ে দেয় টেবিলে।

আবার ডাকে মিনা। এই কুলসুম, কালকের পোলাও আছে না?
-আছে আম্মা। আনুম গরম কইরা?
-আন না বাবা। বাসি পোলাও খেতে আমি ভালোবাসি, তুই জানিস না? মিষ্টি দইটাও বের করিস।

এই রোজকার নাটক সামিনার। কিছুই খেতে পারে না ইলিয়াসের সামনে। তারপর তার রুচি ফিরে আসে। অন্যদের জন্যে আসে না কাবাব, রোস্ট, পোলাও, জর্দা।

চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে উঠতে মিনার দেরি হয়। তারপর নিজের ঘরে কি করে তা মা জানেন না। শুধু শোনা যায় ফোনে কথা বলে কারও সাথে। কাজের লোকজন নির্দেশমতো রান্নাবান্না করে। এইবার নতুন দেখলেন মা যে, দুই ভাগে রান্না হয়। বাড়ির জন্য বাসমতি চালের ভাত, আর সেবকদের জন্য মোটা চালের ভাত। মাছ-মাংস রান্নার পরেও ওদের জন্য ছোট মাছের তরকারি, শাক-শুটকি, ভর্তা-ভাজি হয়। একটা বড়ো নিরামিষ হয় সবার জন্য।

দুপুরে আজানের সময় মায়ের খাওয়ার অভ্যেস। বাবারও তাই। খেয়ে বাড়ির কাছের মসজিদে যান নামাজ পড়তে। তো যা কিছু হোক দিয়ে ভাত খাওয়ার জন্য উসখুস করেন মা। কুলসুমেরা তখন গড়িয়ে গড়িয়ে শাক-সবজি রান্না করে। শুটকি রান্না করে জবর ঝাল দিয়ে। মাছ-মাংস হবে সবার পরে। নামাজ শেষ করে মা ঘুমিয়ে পড়েন। আড়াইটে বা পৌনে তিনটের সময় খাবার ডাক পড়ে। বয়সি মানুষ, তাকে আগেও তো খাবার দিয়ে দিতে পারে। দিয়েছেও দু-চার দিন। তখন তো মাছ-মাংস কাঁচা থাকে। তাই শাক নিরামিষ আর ডাল দিয়ে খেতে দিয়েছে কুলসুম।

সে রান্না যদি স্বাদের হতো তাহলে কথা ছিলো না। খাওয়া নিয়ে মায়ের বাছবিচার নেই। তাই বলে শাক ডাল দিয়ে বাড়িতেও খান না। টাটকা মাছ বাড়িতে আসে রোজই। হয় নিজেদের পুকুরের, না হয় কেনা। ফলে খিদে নিয়েই শাশুড়িকে অপেক্ষা করতে হয়।

পরিবেশনটাও মায়ের ভালো লাগে না। আগেও লাগেনি। কিন্তু এমন শান শওকতের বাসায় সেদিনের পরিবেশন রীতি এখন কি আর মানায়? ছোট ছোট মেলামাইনের প্লেটে শাক-সবজি দেয় টেবিলে। চামচও ছোট ছোট। চা চামচ। সেই ছোটো প্লেটে খাদ্যবস্তুর পরিমান এতো কম যে, একজন ঠিক মতো খাবার তুলে নিলেই বলতে গেলে আর কিছুই থাকে না প্লেটে। মাছ মাংসের বাটিও ছোটো। কেউ কাউকে তুলে দেয় না। নিজে নিতে গেলে লজ্জা লাগে রীতিমতো। দু'টুকরো মাংস নিলে বাটি হালকা হয়ে যায়। ঝোল তো পড়ে থাকে তলায়। কুলসুমের ট্রেনিং ভালো। আবার একটুখানি তরকারি শাক সবজি দিয়ে যায়।

একদিন বড়ো মেয়ে টাপুর বললো, কিসের মধ্যে তরকারি দেয় ওরা মা? বড়ো বাটিতে বেশি করে তরকারি দিতে পারে না?
-কেন? অসুবিধে কোথায়? সামিনা বলে।
-ওই মেলামাইনের প্লেটগুলো তো বোনপ্লেট হিসেবেও ব্যবহার করা উচিত না। আর এতো ছোটো পাত্রে খাবার দেবেই বা কেন?
-বেশি বড়োলোকি দেখানো হচ্ছে না? বিরক্ত হয় সামিনা।
-না মা, রুচির ব্যাপার। আলমারি ঠাসা ভালো ভালো প্লেট বাটি। সেগুলো শুধু মেহমানদের জন্য?
-কেন রাতে ব্যবহার করা হয় না?
-তুমি তো বাবার সাথে প্রায় বাইরে যাও। তুমি না থাকলে কুলসুম বুয়া আমাদেরকে ওই সব বাসনেই খেতে দেয়।
সামিনা ভাবে, মা বোধহয় এসব কথা আলোচনা করেন বাসায়। বলে, আগে তো এসব নিয়ে কথা বলতে না তুমি টাপুর? শিখলে কোথায় এতো কথা?
-আমরা বড়ো হয়েছি মা। তাছাড়া বন্ধু-বান্ধবের বাসায় দেখি তো? আর আমাদের যদি বাসনপত্র-চামচ না থাকতো, তাহলে বলতাম না।
-তোমার বাবার আদরে আদরে বেয়াদব হয়েছো তোমরা।
-আমি কিছু বলিনি মা। টুপুর বলে, তবে আমি আপুর সাথে একমত। খাওয়ার টেবিলের এই রকম ফকির ফকির ভাব সত্যি ভালো লাগে না। চা চামচ দেবে কেনো শাক বা ভর্তা তুলতে?
-দেখেছেন মা, সামিনা শাশুড়িকে বলে, মেয়েদের কথার ধরণ?
-আমি কি বলি মা বলোতো?
-দাদি হিসেবে ওদেরকে আপনি শাসন করতে পারেন মা।

মা মনে মনে বলেন, ওরা তো ঠিক কথাগুলোই বলেছে। পারলে তিনি নিজেও বলতেন ঐ একই কথা। কিন্তু তাকে মানায় না এসব বলা। ছেলের সংসারে এসে কিচিমিচি করে অশান্তি বাধানো তার স্বভাবে নেই। তার এতোদিনের পুরনো সংসার। এমন আহামরি কিছু বাসনপত্র নেই। তবু এর থেকে ভালো বাসনে খাবার-দাবার দেয়া হয় টেবিলে। যাক, তিনি তো অতিথি। ক'দিন পরেই চলে যাবেন। তা ছাড়া খাওয়া-পরা নিয়ে কোনো রকম কথা বলা তার খুব অপছন্দ।

সবাই খেয়ে উঠে যায়। সামিনা ভাত নাড়াচাড়া করে। কুলসুমকে ডেকে বললো, তেলাপিয়া মাছের তরকারি করেছিস কেনো? আজকে না ভাজার কথা ছিলো?
আকাশ থেকে পড়ে কুলসুম। বলে, কইলেন না তো আম্মা।

-সকালে নাস্তার পরেই তো বলেছিলাম। কান কোথায় রেখে দিস?
-এখন আনমু ভাইজ্জা একখান?
-এখন তো খেয়েই ফেলেছি।
-পিলেটে দুগগা ভাত এহনও আছে আম্মা। খারান, আমি এক মিনিটেই ভাইজ্জা আনতাসি।
-মাছের গায়ে কয়েকটা চির দিস আর একটু সর্ষে বাটা দিয়ে মেখে মচমচে করে ভাজিস।

ঘরে বসে সব শোনেন মা। মনে মনে হাসেন। ভাবেন, এসব কলা কৌশল যে মেয়েরা জানে, তারাই পারে স্বামীকে বশে রাখতে। সামিনা খেতে পারে না দেখে ইলিয়াসের আফসোসের অন্ত থাকে না। বউ তো বেশ মোটা হয়ে যাচ্ছে। সেটা দেখে ইলিয়াস বলে, তুমি কি বাতাস খেয়ে মোটা হচ্ছো?

টাপুরের কথা সত্যি। সন্ধেবেলা ইলিয়াসের সাথে প্রায় বাইরে যায় মিনা। কখনও ক্লাবে, কখনও দাওয়াতে। মেয়েগুলো এতিমের মতো খেয়ে উঠে যায়। সামিনা না থাকলে দাদি এটা ওটা তুলে দেন পাতে। সেমাই বা পায়েস রান্না করিয়ে রাখেন সন্ধেবেলাতে। সেগুলো একটু খেতে বলেন। টাপুর টুপুর বেশ পছন্দ করে খায়। ভাব দেখে মনে হয়, দাদির সাথে ডিনার খেতে তাদের বেশ ভালোই লাগে। কি নিশ্চিন্তে সামিনা সন্ধেবেলায় বাইরে থাকে। টাকা হলে কি বাচ্চাদের ওপর থেকে মায়াও কমে যায়? কেমন কেমন লাগে তার। ইলিয়াস এত বদলে গেছে? ভালো লাগে না একটুও এই পরিবেশ।

সেই যে গেছেন মা ইলিয়াসের বাসা থেকে আর কখনও আসেননি। কোনো এক দূর্বল মুহূর্তে মা'ই দুঃখ করে বলেছিলেন মিলিকে ওই সব কথা। যাক। এখনকার সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো, নিরার কাছে যাবে কে কানাডায়? মেয়ের মায়েরই গরজ এবং দায়িত্ব বেশি। তাই মিলিকেই কথা পাড়তে হয় শাশুড়িমার কাছে।

শাশুড়ি গিন্নি-বান্নি মানুষ। পড়শিরা তাকে ডাকে দাদিজান বলে। নাম একটা ছিলো। সেটা হারিয়ে গেছে। কেউ তো আর তাকে ডাকে না নাম ধরে? ছেলে আর ছেলের বউয়েরা ডাকে মা বলে। স্বামী ডাকে বিবি বলে। মিলি জানে শাশুড়ির নাম হলো, জাহেদা খাতুন। দেশের বাড়িতে তিনি সবার দাদি। পড়শিদের কেউ কেউ দাদিজানও বলে। ছেলেদের কাছে তিনি মা। একমাত্র নাতনি নিরার কাছে 'দাদিমা'।

ঘরে আরবি আর বাঙলা পড়েছেন মা তার বাবার কাছে। বাবা নাকি বলতেন, জাহেদার বুদ্ধি খুব ভালো। কিন্তু মুসলমানের ঘরের মেয়ে। মেয়েদের স্কুল

থাকলে একটা কথা ছিলো। মেয়েকে কোএডুকেশনে পাঠানোর প্রশ্নই ছিলো না। তবে মা পড়ার চর্চা রেখেছেন। ছেলে-মেয়ের বই নিয়ে একা একা পড়তেন। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য যা পেতেন তাই পড়তেন। নানা রকম হাতের কাজ জানতেন মা। নকশি কাঁথা, কাপড়ের পাখা, রুমালে ফুল তোলা, ফুল পিঠা বানানোসহ সব কাজে আগ্রহ ছিলো। পাড়া পড়শিরা বাড়ি এসে মার কাছে কতো কাজ শিখেছে।

পড়শিরা তাদের দাদিজানের কাছে আসে নানা পরামর্শের জন্য। যে কোনো সমস্যাই হোক না কেন, বুঝেসুঝে সমাধান দিতে চেষ্টা করতেন তিনি। মোট কথা, বেশ জ্ঞানী মহিলা মিলির শাশুড়ি। তাই কোনো কথা বলার আগে ভেবেচিন্তে নিতেন । প্রয়োজনে আলোচনা করে নিতেন স্বামীর সাথে।

মিলির কানাডা যাওয়ার কথা শুনে চুপ করে থাকলেন কয়েক দিন। ভাবেন, কী দিন পড়লো বাবা? বাচ্চা হওয়ার সময় আগে মেয়েরা বাবা-মায়ের বাড়ি আসতো। এখন শুনি মা-বাবা বিদেশ পাড়ি দেয় নাতি-নাতনি হওয়ার সময়। এখন আবার নাতি নাতনিকে পালন করার জন্য মাকে যেতে হবে কানাডায়। তাঁদের আমলে এমন সেবা পাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি তাঁরা।

তবে হ্যাঁ, তাদের কালে একান্নবর্তী পরিবার ছিলো। সবাই সাহায্য করতো। বাড়িতে একটা বাচ্চা হলে সকলের আদরে হাতে হাতে বড়ো হয়ে যেতো। সেদিন আর নেই। সংসার ছোটো হয়েছে। একান্নবর্তী পরিবারের সুখ দুখের বন্ধন এবং কিছু শাসন বারণ কারো ভালো লাগেনি। সবাইকে একরকম করে চলতে হবে কেনো? এক রকম ভাত তরকারি খেতে হবে কেনো? এই ব্যক্তি পছন্দ ক্রমে ব্যক্তি স্বাধীনতায় গড়ায়। তখন সবাই আলাদা হতে চেয়েছে। হয়েছেও। বিশেষ করে পরের বাড়ির মেয়েরা বউ হয়ে এসে একান্ত নিজের পছন্দের সংসার চাইলো।

ছেলেরা লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত বউ ঘরে এনেছে। তাদের নিজেদের স্বপ্ন আছে না? তারা শ্বশুরের সেবা করতে চাইবে কেনো? শাশুড়ির মাথায় তেল দেয়া, অজুর পানি বদনায় ভরে দেয়া, রান্নাঘরে কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, এসব কাজ করতে চাইবে কেনো? ওসব তো কাজের লোকই পারে করতে। তারা ততক্ষণ গল্পের বই পড়বে বা স্বামীর সাথে গল্প করবে। টিভি দেখবে। স্বামী বেচারা ভালো মানুষ, যা দেবে তাই খাবে। ডাল-ভাত ফুটিয়ে নিতে আর কতক্ষণ? ব্যতিক্রমও ছিলো।

মা অনেক ভেবে বের করেছেন, একান্নবর্তী সংসার তো আর একদিনে ভাঙেনি! সংসারের কাজ রান্নাবান্না পরিবেশন এইসব নিয়ে খুটুরমুটুর লেগে

থাকতো একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে। এই বিষয়গুলো বাড়লো অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে। ছেলেরা রোজগার করে এনে সব টাকা বাবা মায়ের হাতে তুলে দেবে কেনো? তারপর বাবা যেটুকু দেবে সেটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ছেলে বউদের। তা কেনো? উল্টোটা হতে পারে না? ছেলের রোজগারের টাকা হাতে নেবে বউ। বাবা মাকে কিছু দেয়া যায় খুশি হয়ে। তাছাড়া সব ছেলে তো আর একরকম রোজগার করে না? যার আয় বেশি, আলাদা সংসার করার ইচ্ছে তার ততো বেশি।

সংসারে কেমন একটা অসন্তোষ মনে মনে ঘুরতে থাকে। এই থেকে একান্নবর্তী পরিবারে প্রথমে হাঁড়ি আলাদা হলো। সবাই আলাদা রান্না করে খেতে লাগলো। বাড়ি তো বাবার। সবার সমান অধিকার সে বাড়িতে। মা সবই লক্ষ্য করেছেন চারপাশের পরিবেশে। বদলে গেছে সব চোখের সামনেই।

ঘরে ঘরে ছেলে মেয়ে হলো। শিশুরা খেলতে গিয়ে ঠেলাঠেলি মারামারি তো হবেই। কখনও হাত পা ছড়েও যেতো। তাই নিয়ে তুলকালাম বেধে যেতো সময় সময় বড়োদের মধ্যেও। বাবা মায়ের শান্তির কথা, আপোসের কথা, পরিবারের ভালোবাসার কথা তখন আর কারোই ভালো লাগে না। ক্রমে ছেলেরা দাবি তোলে, বাড়ি ভাগ করে দেয়া হোক। তাও হয়। উঠোন ভাগ হয়। বাঁশ, কাঠ বা ইটের দেয়াল উঠে যায়। বাচ্চারা বোকা হয়ে থাকে কিছুদিন। ভাবে এমন কেনো হলো? সয়ে যায় তারপর।

ভেঙে পড়া সমাজের পরিবর্তন মা-বাবা দেখেছেন। কিন্তু কিছু করার নেই। নিজের মতো করে ছোট স্বাধীন সংসার সাজায় নতুন প্রজন্ম। তাদের ঘরেও ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শেখে। পরিবার পরিকল্পনার হাওয়া এলো দেশে। একটা দুটো করে বাচ্চা। মফস্বল শহরে থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়বে। তাও কোনো রকমে বাড়িতে থেকে হয়ে যায়। আর তো চলে না। উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকায় যেতে হয়। সেখানে থাকতে হয় হলে। ছেলেকেও, মেয়েকেও।

ভাগ করে নেয়া বাড়িটা একটু চাপাচাপি হতো। ছেলে মেয়ে ঢাকায় পড়তে গেলে খালি হয়ে যায় বাড়ি। ছুটি ছাটাতে আসে বাচ্চারা। ভরে ওঠে বাড়ি আবার। বুড়ো দাদা-দাদির খোঁজ খবর নেয় তৃতীয় প্রজন্ম। আনন্দে বুক ফেটে যায় দাদা-দাদির। নাতি-নাতনিরা এখনো ভালোবাসে তাদের! হবে না? রক্ত কোথায় যাবে?

মেয়েদের বিয়ে হয়ে চলে যায় অন্য বাড়ি। ঘনঘন বাপের বাড়ি আসা আর হয়ে ওঠে না। একদিকে পড়ে থাকে দাদা-দাদি। অন্য দিকে ছেলেদের সংসার। তাদের ছেলে মেয়ে। আগে এক বাড়িতে কি আনন্দে হইচই করে থাকতো তিন প্রজন্মের ছেলে মেয়ে। এখন এক বাড়ি ভেঙে তিন চারটাও হয়। প্রতি ঘরে ছোটো ছোটো সংসার। অনেক লোকজন সব মিলে। কিন্তু ভাব দেখে মনে হয় আত্মীয় নয় কেউ কারো, যেন প্রতিবেশী।

ঢাকায় যারা পড়তে যায় তারা আর মফস্বল শহরে ফিরে আসতে চায় না। রাজধানী নগরের ব্যাপারই আলাদা। পাশটাশ করে তারা চাকরি শুরু করে ঢাকায়। দেশের ছোটো শহরে যাওয়ার আকর্ষণ থাকে না আর।

বাবা মা চিঠি লেখে কতো। উত্তর আসে কদাচিৎ। ঢাকায় নতুন চাকুরেরা প্রথম প্রথম মেসে থাকে। বাবা মাকে যে আসতে বলবে তার উপায় থাকে না। তবু মায়ের রান্না ভালো-মন্দ কিছু নিয়ে আসেন বাবা। ছেলেকে খাবার দিয়ে এবং দেখে চলে যান সেইদিনই। এইতো প্রতিবেশী নিমাই সেদিন এসে বলে গেলো কথাটা। মা কষ্ট পান শুনে। তার ছেলেরাও তো আলাদা সংসারে থাকে। দেখা করে ফিরে আসতে হয় না সেটা মস্ত সৌভাগ্য তাদের।

একা সংসারের দ্বিতীয় প্রজন্মও একা হয়ে যায়। দাদা দাদি বুঝতে পারেন, পাখির ডানা হয়ে গেলে উড়ে যাবেই তো। সেটাই প্রকৃতি। ডানা হলে কোথায় উড়তে যাবে সেটা না জানার জন্যই বাড়ি ভাগ করে নিয়েছিলো যারা, তারা এবার দেখছে কতোদূর উড়ে গেছে তাদের ছেলে মেয়েরা। কেমন লাগে মা বাবার, সেটা তো বলে না। বলে, ছেলে বড়ো চাকরি করে। অনেক কাজ। ছুটি পায় না যে বাড়ি আসবে। চুরি করে ভাবের ঘরে। মনের ভেতর কিন্তু হাহাকার।

প্রজন্মের সিঁড়ি নেমেছে আরো। এখন আর বাড়ি ছোটো নয়। বাচ্চা কাচ্চাই কম। বেশিরভাগই একটা ছেলে বা মেয়ে। কারো দুটো মেয়ে। কারো দুটো ছেলে। ঢাকার বাসাও ছোটো ওদের জন্য। প্রত্যেকের জন্য আলাদা শোয়ার ঘর, আলাদা পড়ার ঘর চাই।
বাচ্চাদের ভালো শিক্ষা, ভালো খাওয়া-দাওয়া, বড়ো বড়ো স্বপ্ন দেখতে শেখানো, এবং শক্ত পুষ্ট ডানা তৈরি করতে অনেক আয়োজন লাগে। লাগে অনেক টাকা। একসময় ঢাকার চাপা চাপা বাসা থেকে উড়াল দেয় বাচ্চারা। অনুকূলেই তো ছিলো সব। চলে যায় দেশ, গ্রামের মাটি, বাবার সাধের বাড়ি, ঢাকার জৌলুশ পেছনে ফেলে। তা সে যে দেশই হোক। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, কোথাও আপত্তি নেই।

দাদা-দাদি চোখের সামনে নিজের ছেলেদের, মানে তাদের দ্বিতীয় প্রজন্মদের দেখে কাঁদেন। নাতি-নাতনিরা আর কাছে আসে না। একবেলা কাছে বসে মায়ের হাতের রান্না খেতে চায় না। ডাল-ভাত ভালো লাগে না তাদের। দোকানে গিয়ে ফাস্ট ফুড খায়। রাতে খাবারের প্যাকেট কিনে এনে ডিনার খায়। তবে সবাই নয়। উঠতি ধনীদের ছেলেমেয়েদেরই বেশি নাক উঁচু। দ্বিতীয় প্রজন্ম তখন কাঁদে। ছেলে মেয়েদের চোখের সামনে দেখতে পায় না বলে। নাতি নাতনিদের কোলে পিঠে নিয়ে আদর করার সুযোগ পায় না বলে। কিন্তু নিজেদের বাবা মায়ের জন্য কাঁদে না। তাদের দেখাশোনাও করতে চায় না। কেউ কেউ বাবা মাকে রেখে আসে ওল্ড হোমে। কি মর্মান্তিক!

তাতেও শান্তি পায় না। একাকীত্ব গাঢ় হয়ে বসে বুকের ভেতর অল্প বয়সেই।। দাদা দাদি প্রজন্ম তবু নাতি নাতিনদের চোখে দেখেছে। কাছে পেয়েছে। কোলে পিঠে করতে পেরেছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের কয়জনের আর সেই সৌভাগ্য হয়েছে? টেলিফোনে নাতি নাতনিদের কান্না শুনে আনন্দে নিজেরাও কেঁদেছে। ছবি দেখে দেখে বুক খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে বার বার। বলতে গেলে প্রথম প্রজন্মের চেয়ে দ্বিতীয় প্রজন্ম আরো বেশি দেউলিয়া হয়ে যায়। সংসার ছোটো করতে গিয়ে নিজেরাই এতো ছোটো হয়ে যায় যে, হাত বাড়ালেও কাউকে পাওয়া যায় না কাছে।

দুই

মিলির ফোন পাওয়ার পর থেকে মা ভেবেই চলেছেন। কি হলো সমাজের? ছেলে মেয়েরা এমন স্বার্থপর হলো কেন? স্বামী বলে, বিবি, এসব নিয়ে এত বেশি ভেবো না। যুগ বদলে যাচ্ছে, মানুষের মন বদলে যাচ্ছে। নতুন শিক্ষার ফলে মানুষের রুচি শখ আহ্লাদের রীতি নীতি বদলে যাচ্ছে। তুমি আমি ভেবে কি করবো?

-আবার তো ফিরে আসতে হয় আমাদেরই কাছে।

-তা তো বটেই।

-তাহলে সংসারটা ছিঁড়ে লাভ কি হলো, বলো?

-এর মধ্যে আরো অনেক বিষয় আছে বিবি। আমরা বুঝবো না।

-ভাবছি, এই বয়সে নিজের চেনা সংসার ছেড়ে ছেলের সংসারে থাকতে পারবো তো? দু'মাস তো কম সময় নয়। খালাটাও আগের চেয়ে নরম হয়েছে। সে না থাকলে ইমতিয়াজের বাসায় থাকার প্রশ্নই উঠতো না।

তারপরেও অনেক কিন্তু আছে। স্বামী শাবেদ আলি সর্দারের কষ্ট হলেও না বলবে না। সে বলে দিয়েছে, খালা আছে বিবি, আমি চালিয়ে নেবো। মাঝে মাঝে ঢাকায় যাবো। দু'চার দিন থাকবো। কেটে যাবে দুই মাস।

তুর্কি এয়ারলাইন্সের বিমান ঢাকা থেকে একটানে উড়ে এলো ইস্তাম্বুল। মিলি শক্ত সামর্থ হলেও ইমতিয়াজ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। তাতে লাভ এই যে, একা একা ট্রানজিটে কিছু খুঁজে বেড়াতে হবে না। হুইল চেয়ার যে টানবে সেই সব করে দেবে। সে তো মাঝে মাঝে বাইরে কনফারেন্সে যায়, দেখে অনেক মহিলা হুইল চেয়ারের সুবিধে নেয়। সে কি কোল ভরা জিনিস! যা টেনে আনতে কষ্ট হবে, দিব্যি সেগুলো হুইল চেয়ারে বসে বয়ে আনে, টানতে হয় না।

প্লেনে ওঠার আগে ভয়ে দুরু দুরু করে কাঁপছিলো মিলির বুক। ঢাকা থেকে কুমিল্লায় একা যেতে চায় না যে বান্দা, সে একেবারে পৃথিবীর উল্টো প্রান্তে যাচ্ছে একা একা। রাগ হয় নিরার ওপর। বিদেশে পড়ার শখ যে মেয়ের ছিলো, সে এখন স্বামীর সাথেও বিদেশে থাকতে পারছে না। কি! না, ঠাণ্ডায় ভালো লাগে না। লেখাপড়া করতে এলে কি কানাডায় ঠাণ্ডা কম লাগতো? যতো সব আহ্লাদীপনা! আদিখ্যেতা!

মাসুম বলে দিয়েছে কষ্টে মষ্টে চার বছর থাকতে পারলে কানাডার পাসপোর্ট হবে। তখন ইচ্ছে মতো বাংলাদেশে গিয়ে থাকতে পারবে। এখনও আসা যাওয়া করতে পারবে। তবে শুধু ঝামেলাই তো না, অনেক টাকাও লাগে। যদিও টাকা পয়সা কোনো সমস্যা নয় তাদের।

তবে মাসুম ইমিগ্রান্ট হতেই চায়। কতো মানুষ টাকা পয়সা দিয়ে কতো চেষ্টা করে দালাল ধরে কানাডায় ইমিগ্রান্ট হওয়ার জন্য দৌড়ায়। তার ভাগ্য ভালো যে, একটা স্কলারশিপ নিয়ে আসতে পেরেছে। বিদেশে ইমিগ্রান্ট তো নিরাও হতে চেয়েছিলো। তা সে যে কোনো দেশ হোক না কেনো? সব ভুলে গেছে মেয়েটা।

ইমতিয়াজই ভালো কথা বলে। তার কথা হলো, মেয়েরা জন্ম ইমিগ্রান্ট। বিয়ের পর তারা প্রথমে অভিবাসী হয় শ্বশুর বাড়ি। তারপর বয়স কালে যদি ছেলে বা মেয়ের বাসায় থাকতে হয়, তাহলে আবার দ্বিতীয়বার অভিবাসী হয়। কথাই তো আছে, মেয়েদের বাড়ি নেই। প্রথমে বাপের বাড়ি, তারপর স্বামীর বাড়ি, তারপর বেঁচে থাকলে আবার ছেলের বাড়ি। এখন অবশ্য মেয়ের বাড়িও বলা যায়। আধুনিক যুগে তারও পর আছে। তখন ওল্ডহোমে অভিবাসন হয়।

বিশ্রী লাগে কথাটা শুনতে মিলির। বলে, কেনো ছেলেদের কি কখনো ছেলের বাসায় থাকতে হয় না?
-হয়। সেটাও তো অভিবাসী জীবন।
-মানেটা কী? নিজের ছেলে মেয়ের বাসায় থাকলে অভিবাসী বলবো কেনো? আবার তো চলে আসবো, তাই না?
-ধরো আর আসতে পারলে না? অনেকে পারেও না।
-পারবো না কেনো?
-মনে করো, স্বামী মারা গেলে মেয়েরা সংসারের পাট চুকিয়ে দিয়ে ছেলে বা মেয়ের বাসায় থাকে না?
-তুমি কি অনায়াসে অলক্ষুণে কথা যে বলতে পারো? রাগ করে মিলি।
-এটা আমার ক্ষেত্রেও হতে পারে নাকি? তখন হয়তো আমিও চাইবো নিজের লোকের কাছে গিয়ে থাকতে।
-নিজের লোকের কাছে থাকলে সেটা অভিবাসন হয়?
-হয়, হয় মিলি। আজ তুমি কানাডা যাচ্ছো বিশেষ কারনে। এই যাওয়া যদি স্থায়ী হয়, তাহলে বুঝবে অভিবাসী কাকে বলে?
-আবার বাজে কথা, না? ঠিক আছে, আমি যাবো না তুমি যাও মেয়ের কাছে।

সারাটা উড়াল পথে এই সব কথা ভেবেছে মিলি। পাশের বাড়ির ছেলে গেছে অস্ট্রেলিয়া। বেশ কয়েক বছর হলো। তা পাঁচ ছয় বছর তো হবেই। দেশে এলে সেও গল্প করে। বলে, বিদেশ যাওয়া মানে বিদেশি হয়ে যাওয়া। ওদের কালচারের সাথে না মিশে যেতে পারলে ওরা সম্মান করে না আন্টি।
-আমি বুঝি না বাবা তোমার কথা। মিলি অবাক হয়ে বলে, তুমি কি করে ওদের মতো হয়ে যাবে আকাশ?
-দু-একটা উদাহরণ দিই আন্টি। শীতকালে আমাকে ওদের মতো কাপড় চোপড় পরতে হবে। লাঞ্চে ওদের মতো ঠাণ্ডা খাবার খেতে হবে। দুধ চিনি ছাড়া ব্ল্যাক কফি খাওয়ার অভ্যেস করতে হবে।
-কেন? একটা পটে ভাত তরকারি নিয়ে যেতে পারো না? সেটা মাইক্রোওয়েভে গরম করা যায় না?
হা হা করে হাসে আকাশ। বলে, আন্টি, ওরা তাহলে আমাকে ফকির ভাববে। এমনিতেই তো ওরা রেসিস্ট। তখন আমাকে রীতিমতো এড়িয়ে যাবে। এমন কি হাসাহাসি করতেও পারে।
-তার মানে তুমি ঐ সবই খাও এখন?
-সন্ধেবেলায় পার্টিতে গেলে ওদের সাথে আরো কিছু খেতে হয় আন্টি।
-তুমি মদও খেতে শিখেছো?
-মদ না আন্টি, বিয়ার। বিয়ারকে ওরা বলে পানি।

আকাশ সব কথা কি করে বলবে? পার্টিতে বসলে গার্লফ্রেন্ডও হয়ে যায়। ক্রমে ওরা ঘরে আসে। শুরু হয় একসাথে থাকা। অভিবাসী জীবনে এই সব আধুনিকতা না থাকলে প্রবাসে টিকতেই পারা যাবে না। সে তো স্কলারশিপ নিয়ে এসেছে। যারা নিজের টাকা দিয়ে পড়তে এসেছে, পকেটে টান পড়লে তারা রেস্টুরেন্টে কাজ করে। কেউ রাঁধে, কেউ ধোয়া মোছা করে, কেউ মাথায় টুপি পরে সেলস-এ দাঁড়িয়ে খাবার বিক্রি করে। বেশ কষ্টের কাজ। বাড়িতে বলে, ভালো একটা কাজ পেয়েছি। আমার চলে যাচ্ছে ভালোই। কখনও গার্লফ্রেন্ড নিয়ে থাকার কথা বাবা মা জেনে গেলে বলে, আমি ওকে বিয়ে করেছি। নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য ছেলেরা অনেক মিছে কথা বলে। বলা শিখতে হয় অভিবাসী জীবনে। কি অবাক করা কথা সব?

ট্রানজিটের সময় যেনো আর কাটে না। হুইল চেয়ারে নিয়ে এসে একটা জায়গায় অসুস্থ ব্যাথাকাতর যাত্রীদেরকে জমা করছে। দেখতে দেখতে বেশ ক'জন হয়ে গেলো। কারো সাথে কেউ কথা বলতে পারছে না ভাষার কারণে। মিলি ভাবলো, একটু হেঁটে দেখেই আসি না কেনো ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্ট। আস্তে আস্তে সে এগোতে থাকে। মনে যথেষ্ট ভয়। কি জানি আবার তাকে ফেলেই চলে যায় কিনা প্লেন।

এমন সময় একজন যাত্রী এলো হুইল চেয়ারে। পাঁচটা লট বহর কোলে। একটা ছোটো ক্যারিঅন, বাকিগুলো হ্যান্ড ব্যাগ। মোটামুটি বড়োই। ঠাস করে পড়ে গেলো একটা হাতব্যাগ মহিলার কোল থেকে। অমনি চেঁচিয়ে উঠলো মহিলা, থামেন, থামেন, ব্যাগ, ব্যাগ। তার মানে, বাংলাভাষি। কে জানে বাংলাদেশ না কলকাতা থেকে এসেছে!

তুর্কি ভাষায় কি যেনো বললো হুইল চালক। মোটর চালিত চেয়ার, বেশ জোরে চলে। কোনো কথা না বলে চালক মহিলাকে এনে তাদের দলে রেখে ইশারায় কি সব বললো। হাতের ইশারা দেখে বোঝা গেলো, এতো জিনিস কেনো? যথেষ্ট বিরক্ত সে। গজ গজ করতে করতে লোকটা গিয়ে ব্যাগ এনে দিলো। বললো, ওয়েত, আই কাম। হাত দিয়ে দেখালো, এইখানেই বসে থাকতে হবে। যাওয়ার সময় বললো, পেলেন থিরি আওয়ার।

মানে, আরো তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হবে এই জায়গায়। আস্তে আস্তে আলাপ হলো ঐ মহিলার সাথে। বাংলাদেশ থেকেই আসছেন। বাড়ি রাজশাহী শহরের নওহাটায়। তবে এখন শহরেই বাস। কাদিরগঞ্জে নিজেদের চারতলা বাড়ি। স্বামী মাছের ব্যাপারী। আর আমের সময় চাঁপাই নবাবগঞ্জে গিয়ে আমের বাগান কেনেন। তাতে খুব ভালো ব্যবসা হয়। সৎ উপার্জনের টাকায় বাড়ি

করেছেন ব্যাপারী। ছেলে মেয়ে পাঁচজন। সবাইকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। সফল পিতা মাতা তারা।

মেয়ে দুজন বড়ো। বিয়ের পর জামাইয়ের সাথে ইটালিতে থাকে। দুছেলে দেশেই ভালো চাকরি করে। ছোটো ছেলে বউ নিয়ে থাকে ফিনল্যান্ডে।
-খুব ঠাণ্ডা দেশ না? মিলি বলে।
-তাই তো বলে সবাই। তবু যেতে হবে। বউয়ের দ্বিতীয় বাচ্চা হবে। একা পেরে উঠবে কি করে?
মিলি হাসে। বলে, আমিও প্রায় সেই জন্যে কানাডা যাচ্ছি।
-মানে আপনারও নাতি-নাতনি হবে? হাসে মহিলা এবার।
-হবে না, হয়ে গেছে। আমার মেয়ে থাকে কানাডায়। সে ছোটো নাতিটাকে নিয়ে একা থাকতে পারছে না। তাই যাচ্ছি মেয়ের কাছে। থাকবো কয়েক মাস। দিনকাল কেমন পাল্টে গেছে দেখেন।
-ঠিক বলেছেন। আগে আমরা জানতাম, বাচ্চা হওয়ার সময় মেয়েরা আসে মায়ের বাড়ি, আর বউয়েরা যায় তাদের মায়ের বাড়ি। বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করেন মহিলা।
মিলি বলে, চলেন না যাই ওপর তলায়। দোকানপাট দেখি একটু।
-ওপরে না আপা, নিচে যেতে হবে। আমি আরো দুবার এই পথে গিয়েছি। কিন্তু আমার যে মেলা জিনিস। কে দেখবে?
-এখানে রেখে যাওয়া যায় না?
-হয়তো যায়। তবে একটু পরে হুইল চেয়ারের যাত্রীদেরকে নিচে নিয়ে যাবে। আমাদের চেকিং হবে নিচেই।
মিলি ভাবে, মহিলা তো বেশ কট কটে। বেশ চালাকও। তার চেয়ে বয়স কিছু বেশিই হবে। তবে বেশ শক্ত পোক্ত। ধন দৌলতের সাথে মানিয়ে নিয়েছে। এখন হাবা গোবা থাকলে আর মানায় না। ছেলে মেয়েরাই মাকে আধুনিক করেছে। ব্যাপারী কিন্তু বেশি বদলাননি, মহিলাই বললেন!

সত্যি কিছুক্ষণ পরে সবাইকে নিয়ে গেলো নিচ তলার একটা ঘরে। সেখানে সবাই হুইল চেয়ারের যাত্রী। ওখান থেকে চেক ইন-এর গেট কাছে। চেয়ার থেকে নেমে গুছিয়ে বসলো মিলি। সামনেই সারি সারি দোকান। কি নেই সেখানে? নাতিটার জন্য দু'একটা খেলনা নিতে ইচ্ছে হলো। রাজশাহীর মহিলাও খেলনা কিনতে চান।

দু'জনে মিলে বের হলো ঘর থেকে। ডানে বাঁয়ে লম্বা চলে গেছে সারি সারি দোকান। মাঝে মাঝে রেস্টুরেন্ট। লোভনীয় খাবার দাবারে ভেসে যাচ্ছে দোকানের চত্বর। সুখাদ্যর গন্ধে ম' ম' করছে। কিন্তু পেট তো ভরা। তবু ঢুকে

পড়লো তারা একটা খাবারের দোকানে। কিছু চকলেট আর শুকনো ফলের প্যাকেট নিলো মিলি। নিরা খুব পছন্দ করে।
মিলি ডাকে, আপা কি নিলেন?
-এখনো নিইনি। ভাবছি খাবার দাবার তো ওখানেও পাওয়া যায়। আর এবার তো নাতনি আসছে জেনেই গেছি। মনে হচ্ছে, একটা সোনার চেইন নিয়ে নিই। কি বলেন?
-ভালো বলেছেন তো। নাতিপুতির মুখ দেখতে সোনার মোহর দিতো আগেকার দিনে।
-আপনিও নিয়ে নেন একটা চেইন।
-কার জন্য আপা?
-নাতির জন্য।
-না আপা, এখন আর না। জন্মের পরে অনেক সোনা পেয়েছে নাতি।
-তাহলে মেয়ের জন্য। এখানকার সোনা ভালো।
-বিয়ের সময় মেয়েকে প্রায় চল্লিশ ভরি সোনা দিয়েছি আপা। মানে আত্মীয় স্বজনের উপহার আর আমাদের উপহার মিলিয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। কাজেই ও পথে এখন নয়।

হঠাৎ হাত থেকে ব্যাগটা পড়ে গেলো মহিলার। অমনি মুখ খুলে ছিটকে বেরিয়ে গেলো পাসপোর্ট। মিলি কুড়িয়ে এনে দিলো। প্রথম পাতা খুলে গেছিলো। তাতে দেখা গেলো মহিলার নাম, আলতা বিবি। মনে মনে বলে, তাই তো হবে। ব্যাপারীর বউয়ের নাম আর কি হতে পারে?

লক্ষ্য করে দেখলো, ব্যাগ পড়ে যায়নি। ব্যাগের দুটো হাতলেরই একদিক ছিঁড়ে গেছে। ভেতরে ডিভাইডার নেই। অনেক জিনিস ব্যাগে। ঠাসাঠাসি করে টাকাও রাখা। ওরই মধ্যে পাসপোর্টও ছিলো। এমন একটা ব্যাগ নিয়ে বিদেশে যাচ্ছেন? ভারি বিরক্তি ফুটে ওঠে মিলির চেহারায়। এসব কি একপুরুষে হয়? রুচিরও তো একটা ব্যাপার আছে। তাছাড়া বেহুদাও বটে! বার বার জিনিস পড়ে যাবে কেনো?

-কি জ্বালা দেখেন তো আপা? ব্যাগটা ছেঁড়ার আর জায়গা পেলো না? ভাগ্যভালো টাকাগুলো পড়ে যায়নি। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ব্যাগটা গুছিয়ে বগলের নিচে নিল মহিলা।
কে কার দিকে তাকায় এখানে? গিজ গিজ করে মনুষ। এখন তো দূরের রাস্তায় মানুষ দৌড়োয় না ওড়ে। সময় কোথায় তাকাবার?

শেষে মিলি নিজের জন্যই একটা সুন্দর হালকা চেইন কিনে গলায় পরে ফেললো।

ঘুরতে ঘুরতে বেশ কিছু কেনা কাটা হয়েই গেলো। নাতি নাতনি হয়ে গেলে কি হবে? জীবনের সাধ আহ্লাদ এখনো মরে যায়নি। ঘরে স্বামী আছে। স্বামীর সোহাগ আছে। জীবন এখনও ভরা নদী। অনেক সচ্ছ পানি তাতে, বয়ে যায় নিরবধি। হঠাৎ করেই ভালোবাসার মানুষটার জন্য মন খারাপ করে মিলির। কি করছে এখন ইমতিয়াজ? হয়তো চেম্বারে। বাড়ি এসেই খালি খালি লাগবে। ঢাকায় প্লেন ওড়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কথা বলেছে তারা। সে কথার তেমন মাথা মুণ্ডু নেই। শুধু কণ্ঠটা শোনা।

আবার তারা হুইল চেয়ারের যাত্রীর আস্তানায় গিয়ে বসলো। সেখানে নতুন এক দম্পতি এসেছেন। বাংলাতেই তো কথা বলছেন। বেশ বয়স হয়েছে দু'জনেরই। সত্তর তো নিশ্চয় পেছনে ফেলে এসেছেন। মাথায় চুল কম। যেটুকু আছে তা সফেদ সাদা। এমন চেহারারও একটা গ্লেজ আছে। মিলি ভাবে, ওরাই সত্যিকার হুইল চেয়ারের যাত্রী। সে তো নিজের সুবিধের জন্য হুইল চেয়ার নিয়েছে।

ভদ্রলোকের হাতে লাঠি। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে হলে লাঠির সাহায্য লাগে। চেয়ার থেকে নেমে দাঁড়ালেন। মনে হলো বাইরে যাবেন ঘুরতে। কোনো মতে হাঁটা চলা করেন। মহিলাও লাঠির সাহায্যে নেমে দাঁড়ালেন। লাঠিতে এখনো অভ্যস্ত হননি বোঝা গেলো। পায়ের ছন্দের সাথে মেলাতে পারছেন না লাঠি। তবু বের হলেন দুজনে। বুড়ো দম্পতি দেখতে মিলির খুব ভালো লাগে। কতো স্মৃতি, কতো সুখ-দুঃখ, কতো ভালো-মন্দের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে এতোটা পথ আসে মানুষ। মতান্তর যতোই থাকুক, একটা সময়ে আপোস করেই নেয় দু'জন।

তবে তার ধারণাটা নাকি ঠিক নয়। সে এক কাহিনি। দুঃখজনক সে কাহিনি। মহিলা জানতো যে সেই হবে প্রশ্নহীন। তবু মানিয়ে নিতে পারেনি। একাত্তর বছর বয়সে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বৃদ্ধাশ্রমে। স্বামীর সাথে মতান্তর নয়, ছেলের বউদের সাথে। স্বামী পুত্রবধূর পক্ষ নিয়েছিলেন, মারাত্মক অভিমান হয়।

প্রায় আধঘণ্টা ঘুরে ফিরে এলেন ওরা। হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। কি কিনেছেন বোঝা গেলো না। দুজনের কাছে দুটো ক্যারিঅন। মহিলা বললেন, আমার সুটকেসে জিনিসগুলো নিই। কারণ তোমার সুটকেসে তো ঔষুধের বোঝা।

ভদ্রলোক বললেন, দু'জনে ভাগ করে নিই। নইলে তোমার সুটকেস ভারি হয়ে যাবে।
-আর কি ভারি হবে? এবার উঠলে তো আর নামা নামি নেই। এক্কেবারে বোস্টন গিয়ে নামা।
দু'জনেই সুটকেস খুললেন। বোঝাই বটে! অনেক ঔষধ। প্যাকেট খুলে শুধু পাতাগুলো রাবার ব্যান্ড দিয়ে প্যাঁচানো।

মিলি আবার কথা না বলে থাকতে পারে না বেশিক্ষণ। সেধে আলাপ করলো। বাংলাদেশের লোক আত্মীয় সম্বোধনে প্রীত হয়ে যায়। এটাই দেশের সংস্কৃতি।
-কোথা থেকে আসছেন চাচা?
-দিনাজপুরের পাঁচবিবি থেকে।
-কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর দিলেন আন্টি, বললেন, বোস্টন।
-কে থাকে সেখানে আপনাদের?
-ছেলে মেয়ে দুজনেই থাকে মা। চাচা বলেন, ছেলে এম আইটি-র টিচার। মেয়ে জামাই থাকে কানেকটিকাটে।
আন্টি বললেন, ঘুরে ফিরে দুই জায়গাতেই থাকি মা। তা তুমি কোথায় যাচ্ছো? তুমি করেই বললাম, কিছু মনে করো না।
-না না কি যে বলেন আন্টি? আমি যাচ্ছি মেয়ের কাছে কানাডায়। ছোটো বাচ্চা নিয়ে একা থাকতে তার ভালো লাগে না। সারাক্ষণ মন খারাপ করে থাকে। তো ওকে একটু সঙ্গ দেবো। এই মাস দু'য়েক থাকবো ভাবছি।
-কতোদিন থাকবে মা? মহিলা জানতে চান।
-আমি তো দুই মাসের বেশি থাকতে চাই না আন্টি। আপনারা?
-আমরা তো আগামী বছর দেশে যাবো আবার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন মহিলা।
-দেশের বাড়িতে কে আছে আন্টি?
-আমরা অভিবাসী হয়েছি আমেরিকায় মা, বলেন চাচা।
-অভিবাসী বলছেন কেনো চাচা?
-দেশ ভুঁই ছেড়ে অন্য জায়গায় বসত গড়লে তাকে তো অভিবাসীই বলে মা। লোকে সোনার হরিণের আশায় ইমিগ্রান্ট হয়। আমরা হয়েছি বাধ্য হয়ে। মাটির ঋণ আর শোধ দেয়া হলো না। ফিরে আসতে পারবো কিনা মরণের পরে, তাও জানি না। সবই কপাল!
-এই এক রোগ হয়েছে তোমার চাচার আজকাল। সাত বছর হয়ে গেলো তবু বিদেশ তার ভালো লাগছে না। একই কথা, নিজের বাড়ির মতো হয় না অন্যের বাড়ি। নিজের দেশের মতো হয় না অন্য দেশ। জন্মভূমি বলে কথা!

-ছেলের বাড়ি কি অন্যের বাড়ি হলো চাচা? মেয়ের বাড়ি তো আর থাকছেন না? মিলি বোঝাতে চায়।
হাসেন প্রাজ্ঞ মানুষ। বলেন, সব বুঝেও বোকা হয়ে থাকি মা। আসলে লম্বা জীবন বাঁচলে তার দাম চুকাতে হয় নিজের ইচ্ছের রাশ টেনে ধরে। কিনতে হয় অনেক অপছন্দের ইচ্ছে।
-মানে কি চাচা?
-মানে? চাচা হাসেন। বলেন, সামর্থ থাকলে যে ইচ্ছেটা তোমাকে চালায়, সামর্থ চলে গেলে সেই ইচ্ছেটা পর হয়ে যায়। কাছেই আসে না। হেসে বলেন, এটাই ভালো এখন আমাদের।

মিলি অবাক হয় চাচার কথা শুনে। অনেক গল্প হলো ট্রানজিটে বসেই। জেলা জজ হিসেবে অবসর নিয়েছেন। বাপ দাদার জমির ভাগ পেয়েছিলেন পাঁচবিবিতে। চাকরি শেষ হওয়ার পর ওখানেই বাড়ি বানান। ছোটো একটা দোতলা বাড়ি। ছেলে মেয়ে তর তর করে মানুষ হয়ে গেছে। আজকালকার যুগে ইন্টারনেট আছে। নিজেরাই খুঁজে নিয়েছে ভবিষ্যত জীবনের ঠিকানা।

অবসর জীবনে নিজের বাড়িতে খুব ভালো ছিলেন চাচা। নিজের হাতে ফলমুলের গাছ লাগিয়েছেন। কলমের আম গাছ, সাভারের কাঁঠাল গাছ, নার্সারি থেকে কিনেছেন গোলাপজামের গাছ, কাগজি লেবু আর সরবতি লেবুর গাছ, মালয়েশিয়ার একটা কামরাঙা গাছও জোগাড় করেছিলেন। কি যে মিষ্টি খেতে। রস খেলে মনে হয় সরবত খাওয়া হচ্ছে। একটা কাজের ছেলে ছিলো। বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গিয়েছিলো। তারই শখে একটা গরুও কেনা হয়। ইজারা নেয়া হয় পাশের পুকুরটাও। সেও তারই শখে।

ছেলে দেশে এলে খুশিই হতো। কিন্তু জজ সাহেবের বাড়ির শান শওকত আরো বেশি হওয়া দরকার ছিলো বলে সে মনে করতো। মেয়ে সিএসইতে পড়েছে ঢাকায় এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে আন্তর্জাতিক বিনিময় প্রোগ্রাম ছিলো। তাতেই চান্স পেয়ে যায়। বিয়ে করে সহপাঠিকে। এখন চাকরি করে আর সংসার করে। জামাই ভালো একটা আইটি ফার্মে আছে। ভালো আছে ওরা। দুটো ছেলে মেয়ে ওদের। তারাও বড়ো হয়ে গেলো বলতে গেলে। দেশে থাকলে নাতনিটার বিয়ে হয়ে যেতো কবেই।

মনে হয়, ওরা আর দেশে আসবে না। ছেলে তো আরোই না। চাচার নিজের হাতে গড়া বাড়ি, ফলফলারির বাগান, মৌসুমে বেশুমার ফল, গরুর খাঁটি দুধ, আর পুকুরের মাছ কার জন্য করেছেন তিনি? বাড়ি ছোটো হলে কি

হবে? আধুনিক সব ব্যবস্থা আছে। ফ্রিজ, এসি, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, প্রেসার কুকার সব আছে। রীতিমতো ব্যবহার হয় বাসায়।

তারা আগেকার দিনের মানুষ। জজ সাহেব মানে হাকিম। পাকা নিয়তে কাজ করেছেন। টাকা পয়সা লেনদেনের কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। এখন তো নানা কথা শোনা যায়। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। জজ সাহেব কখনও টাকা নিয়ে রায় লিখতে পারেন, এসব যারা বলে তাদের ওপরেই তিনি রাগ করেন।

দিনাজপুর সদরে একবার একটা ঘটনা ঘটে মুচিপাড়ায়। খুব গরিব মানুষের পাড়া। কি যে হতো, রাত দিন ওদের ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকতো। অভাবি মানুষদের মেজাজ এমনিতেই তিরিক্ষি হয়ে থাকে। প্রত্যেক ঘরে ছেলে মেয়েদের তো বটেই বউকে মারাও নিয়মিত ব্যাপার ছিলো। সেখানে হঠাৎ একটা খুন হলো। খুনি ধরা পড়লো। ফাঁসিও হলো। কেসটা অন্য আদালতে হয়েছিলো। তো সেই জজ বদলি হলে চাচা কয়েকমাস দুটো আদালতেই কাজ করেছেন। জজ সাহেবরা তো আর এজলাসে বসলে কথা বলেন না কারো সাথে। যা কথা হয়, তা ঐ পেশকারদের সাথে। তাও এক তরফা। জজ সাহেবরা শোনেন। বলেন না কিছুই রায় পড়া ছাড়া।

একদিন কোনো এক অবসর মুহূর্তে পেশকার ফাঁসি হওয়া মুচির কথা বললো। সে তো আগাগোড়া কেস শোনে। মানে শুনতে হয়। তার ধারণা হয়েছিলো, লোকটা আসল খুনি না। তাকে ফাঁসানো হয়েছে। অনেক টাকার লেনদেনও নাকি হয়েছিলো। যেদিন রায় হয়, সেদিন তার কিশোরি বউটার সে কি কান্না! দু মাসের বাচ্চা নিয়ে বিধবা হবে মেয়েটা। তারপর কি হলো কেউ আর জানে না।

শুনে চাচার বুক ভেঙে গেলো। গোপনে খোঁজ লাগালেন। পেয়েও গেলেন বিধবা কিশোরী মেয়েটাকে। তাকে বাসায় এনে ঘটনা জানতে চাইলেন চাচা। মেয়েটার নাম লখিয়া। সে তো কাঁদতে কাঁদতে নদী হয়ে গেলো। কাঁদতে কাঁদতেই বললো অনেক কথা। সারমর্ম হলো, তার মানুষটা দেবতার মতো ছিলো। সে মানুষ খুন করতেই পারে না। বিল্টু গুণ্ডার এলাকায় তারা বিশ ঘর মুচি বাস করতো। বলতে গেলে তারা ছিলো বিল্টুর ক্রীতদাস। যখন যাকে যে কাজ বলবে, তাকে সেই কাজ করে দিতেই হবে। বাজারে তার চাল-ডালের আড়ত ছিলো। মুচিদেরকে সে বিনে পয়সার শ্রমিক মনে করতো। কথা না শুনলে গুম করেও দিতো মানুষদেরকে। ডাকাতের মতো রাগ ছিলো। সবাই বলতো, পুলিশেরা নাকি ওর বন্ধু। হাসি-তামাশা করে। বোতল খায়।

-আমার বাচ্চা হবে বলে কয়েকমাস থেকে মানুষটা একটু বাড়তি রোজ়গারের ধান্দা করতো। বিল্টুর আড়তে যেতে চাইতো না। এটাই তার দোষ ছিলো মালিক।

লখিয়া বলে যায়, তারপর কি হলো হুজুর সাহেব, আমি জানি না। হঠাৎ একদিন পুলিশ রাতে এসে ওকে ধরে নিয়ে গেলো। বিল্টুর গুদামের এক শিশু শ্রমিককে নাকি ও গলা টিপে মেরে ফেলেছে। কি বলবো হুজুর সাহেব, আর ফিরে এলো না মানুষটা।

কিছুই করার ছিলো না চাচার। মানুষটা মরেই গেছে। কেস ওঠালে কি আর হবে? কেই বা লড়বে ওর হয়ে। মা বাবা মরা এতিম মেয়ে। কোলের একমাত্র মেয়েকে নিয়ে সে এখন এতিমস্য এতিম। তখন চাচা লখিয়াকে পাঁচবিবি পাঠিয়ে দেন। তাঁর মাকে বলেন, ওকে যেনো কাজের বেটি হিসেবে বাসায় রেখে দেয়। কাজটা সহজ না হলেও মা রেখেছিলেন লখিয়া আর তার মেয়ে মহুয়াকে। তারা এখনও আছে চাচার বাড়িতে। বাড়ির পেছনের বাগানে গরুর গোয়ালের লাগা একটা খড়ের ঘরে মা মেয়ে থাকতো।

হুইল চেয়ারের ট্রানজিটে অনবরতো লোক আসা যাওয়া করছে। মিলির থাকতে হবে আরো দুই ঘণ্টা। চাচা চলে যাবেন তার একঘণ্টা আগে। কি সুন্দর করে যে কথা বলেন! সবই তো জীবনে দেখা গল্প। কতো দেওয়ানি ফৌজদারি মামলার রায় লিখেছেন জীবনে। সারা রাত জেগে কেস স্টাডি করেছেন। রায় দেয়া তো সহজ কাজ নয়। এখন হাতে কাজ নেই বলে অসহায় বোধ করেন।

-তারপর কি হলো চাচা? মিলি যেনো গল্প শুনতে বসেছে। বলেই ফেললো, গল্পের মতো চাচা।

-গল্প তো জীবন থেকেই নেয়া মা। বলছিলাম না, দেশ ভুঁই ছেড়ে অন্য জায়গায় গেলে তাকেই অভিবাসী বলে। এক জীবনে মানুষ কতবার যে অভিবাসী হয় মা। বয়স অনেক হলো। দেখলামও অনেক।

-আপনার মতো করে কেউ অভিবাসীর এমন মানে শোনায়নি আমাকে কোনোদিন। আমার স্বামীও এই রকম করেই প্রায় বলতো। আমি শুনতে চাইতাম না।

-লখিয়ার কথাই ধরো না। দিনাজপুর সদরের মুচি পাড়া থেকে লখিয়া আর মহুয়া পাঁচবিবি চলে এলো আমাদের একান্নবর্তি পরিবারে। যদিও বেশি দূর নয়, তবু ও কি অভিবাসী হলো না ওরা? কুঁড়ে ঘরটাও ছেড়ে আসতে হলো।

-আপনার কথাই ঠিক চাচা।

-এই তো জীবন মা। আমি তুমি চাইলেই তো কিছু হবে না, ঐ সাত আসমানের ওপর বসে যিনি কোটি কোটি লোকের জীবনের ছক কাটেন দিনরাত, তিনি যেভাবে ঘর সাজাবেন, সেটাই হবে।
মিলি নিজেও তো এই রকম বলে।
-এই যে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে পাঠাই, তাকেও কি একরকমের অভিবাসন বলা যায়, বলেন আমার স্বামী।
-বটেই তো মা। আগেকার দিনে শ্বশুর বাড়ি থেকে মেয়েকে আসতেই দিতো না নাইওরে। তখন বাল্যবিবাহ ছিলো। কতোই মনে কষ্ট পেতো মেয়েরা। অভিবাসন টার্মটা ছিলো না বটে, কিন্তু বিষয়টা একই। এই টার্মের এখন প্রসারিত হয়েছে। আমিও তাই মনে করি।
-কিন্তু চাচা, এখন তো মানুষ সাধ করে অভিবাসী হয়। উন্নত জীবনের আশায়।
-তাদেরও কষ্ট আছে মা। একবার ভিন দেশে গিয়ে পড়লে আর সহজে আসা যায় না।
-কেনো যায় না?
-কত টাকা পয়সা খরচ করে ভিন দেশে যায়। হয়ত ঘটি-বাটি বেঁচে টাকা জোগাড় করে। ফিরে এলে কি উপায় হবে? থাকবে কোথায়? খাবে কি? তাই আসতেও পারে না। সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে লোহার শেকলে বাঁধা পড়ে যায়।

এমন সময় হুড়মুড় করে দুই জন আজদাহা লোক এলো। হুইল চেয়ারের চালক। মোটরে চলে চেয়ার। বোস্টনের যাত্রী আপা গেছেন বাথরুমে। হই চই লাগালো মানুষ দুটো। বোর্ডিংয়ের কল দিচ্ছে। যা হোক ঐ মহিলা এসে গেলেন। তাড়াতাড়ি করে ক্যারিঅনসহ চার পাঁচটা ব্যাগ গুছিয়ে তুলতে গিয়ে এটা পড়ে ওটা পড়ে, সে এক ধুন্দুমার অবস্থা লাগিয়ে দিলেন মহিলা। সাহায্য করলো ঐ মানুষেরাই জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে।

মনে হয় এর পরে চাচা আর আন্টিদের ডাক আসবে। বেশ ভালোই সময় কাটছিলো চাচার সাথে গল্প করে। আন্টি চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে গেছেন। চাচার চেয়ে চাচি অনেক নরম হয়েছেন। চাচা বললেন, ওর ডায়াবেটিস বেড়েছে মনে হয়।

-ছেলের বাসায় অনেক সময় পান, আপনি বই লেখেন চাচা।
হাসেন চাচা। বলেন, লেখতে শুরু করেছি একটা।
-উপন্যাস লেখবেন চাচা? মিলি আবার প্রশ্ন করে।

-না মা। আমি তো সাহিত্যিক নই। কয়েকটা দেওয়ানি কেস নিয়ে আমি খুব পেরেশান হয়েছি জীবনে। দু-একটা ফৌজদারি কেস নিয়েও আহার নিদ্রা ঘুঁচে গিয়েছিলো কয়েক মাস। একেবারে যাবজ্জীবন হয়ে যায় যায়, এমন লোকেরও শাস্তি কমে গেছে আমার রায়ে। অনেক লেখতে হতো ঐ রকম রায় লেখার সময়। ঐ সব কিছু নিয়েই লেখতে চেষ্টা করছি।
-আপনি ফেসবুকে আছেন চাচা?
-হ্যাঁ মা, এইবার ছেলের বউ করে দিয়েছে। স্কাইপে-ও শিখিয়ে দিয়েছে।
-বাহ, খুব ভালো চাচা।
-প্রথমে আপত্তি করলেও এখন ভালো লাগে। ঘরে বসে অনেকের সাথে যোগাযোগ হয়। কথা হয়। দেখাও যায়। বেশ লাগে। চাচা হাসেন।
-সত্যি কথা কি চাচা, ফেসবুক না থাকলে অনেক মানুষ বোবা হয়ে যেতো। কিছু মনে করবেন কি, যদি আমি আপনার আইডি চাই?
-সে কি কথা মা? তুমি ফেসবুকে কথা বললে ভালোই লাগবে আমাদের।

হাতব্যাগ খুলে একটা ডায়েরি বের করে মিলি। সেখানে অনেক মানুষের ফোন নম্বর, ফেসবুক আইডি এবং ই-মেইল আইডি লেখা আছে। আলাদা একটা পাতায় চাচার ফোন এবং ই-মেইল আইডি লিখে নিলো। মানুষটাকে বেশ পছন্দ হয়েছে তার।

চাচি জেগে গেলেন। বললেন, আর কতো দেরি গো?
-মনে হয় আধ ঘণ্টা। চা খাবে কি? চাচা জানতে চান।
-আনার ঝামেলা হবে। থাক দরকার নেই। চাচি আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।
-আন্টি আমি এনে দিচ্ছি চা। চাচা, আপনার জন্যও আনবো তো?
-তুমি কষ্ট করবে মা?
-কোনো কষ্ট না চাচা।
-এই নাও টাকা। চাচা বললেন।
-কি বলেন চাচা? এখনও মেয়ে মনে করতে পারলেন না?
-আচ্ছা ঠিক আছে। তুমিই চা খাওয়াও আমাদের।
-আর কিছু আনবো? বার্গার বা চিকেন রোল?
-না মা। কিচ্ছু লাগবে না।

পথের আলাপ। হয়তো জীবনে আর কোনোদিন দেখাও হবে না। কিন্তু মনে হচ্ছে, যেনো কতোদিনের পরিচয়! আরো কিছুটা সময় আছে হাতে। চাচা বোস্টনের গল্প করলেন। তাঁর খুব পছন্দের শহর। লেখাপড়ার শহর।

আমেরিকান চাইনিজগুলো কি স্মার্ট! শুধু লেখাপড়া না, ইনডোর গেমস, পারফর্মিং আর্ট, কো-কারিকুলার একটিভিটিজ, সবটাতেই ওরা নাম করছে। বিশেষ করে এমআইটি ভবনগুলোর প্রশংসা করলেন খুবই।

আন্টি বসে বসে রাতের ঔষধের প্যাকেট করছেন। চাচার একটা, তার একটা। দুটো ছোট ছোট প্লাস্টিকের কৌটোতে সেগুলো রেখে ক্যারিঅনটার চেইন টেনে দিলেন। প্লেনের মধ্যে মাথার ওপর থেকে ক্যারিঅন নামিয়ে ঔষধ বের করা খুব ঝামেলার ব্যাপার। কৌটো দুটো রাখলেন হাত ব্যাগে। যেন রাতের খাবারের পর কাজটা সহজ হয়।

মিলির খুব ভালো লাগছে দেখতে। এক জীবনে কতো অজস্র অভ্যেস রপ্ত করতে হয় মানুষকে। কাজটা চাচাও করতে পারেন। কিন্তু আন্টি অভ্যেস করে ফেলেছেন। তরকারি রান্না করতে গিয়ে লবণ দেয়ার মতো কাজ। যৌথ জীবন তো অভ্যেসের মতোই।

মিলিরও আছে কিছু অভ্যেস। যেমন, ইমতিয়াজ বাইরে যাওয়ার সময় টিফিন বক্স, ঘড়ি, টিস্যু পেপারের প্যাকেট এগিয়ে দেয়া, কোট পরতে সাহায্য করা। ইমতিয়াজ নিজেই পারে করতে। কিন্তু তাতে নারাজ মিলি। ওগুলো তারই কাজ। অভ্যেসের মতো হয়ে গেছে। না করলে ভালো লাগে না। আন্টিরও নিশ্চয় তাই।

আসলে ছোটো ছোটো অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা জীবনাচারের সম্পর্ক। টান না পড়লে বোঝাই যায় না যে বাঁধা আছে দুটো মানুষ। এটা অবশ্য একদিনে হয় না। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে বোনা আরাম আর সুখ। আবার মনে পড়ে ইমতিয়াজের কথা। মানুষটা কখনও অসম্মান করেনি তাকে। কাজ তার কাছে ইবাদতের মতো। একটু বেশি কাজ পাগল এই যা!

চাচাদের নিতে লোক এলো। এবার মিলি একা। তবে আরো লোক এসেছে। কি যে বিশাল পান্থশালা! প্রতি ঘণ্টায় শত শত লোক আসে যায় এই বিমান বন্দর ছুঁয়ে। একসময় মানুষ কল্পনায় পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সাতদিনের পথ একদিনে যেতো। এখন সেটা বাস্তব। হাজার হাজার মানুষ তো আকাশেই থাকে গড়ে বড়ে। ভাবতেই অবাক লাগে মিলির।

দুর্ঘটনা যে হয় না, তা নয়। কিন্তু একটা দুর্ঘটনার জন্য মানুষ তো আকাশে ওড়া ছেড়ে দিতে পারে না। কিছুদিন আগেই তো মালয়েশিয়ার একটা বিমান উধাও হয়ে গেলো আকাশে। বড়োই অদ্ভুত ব্যাপার। কোথায় দুর্ঘটনা ঘটলো, কোথায় পড়লো, তার কিছুই জানা গেলো না। যেনো মিলিয়ে গেলো হাওয়ায়। ইমতিয়াজ দুষ্টুমি করে বলেছিল, এলিয়েনরা নিয়ে গেছে।

যাক এতক্ষণে তার জন্য লোক এসেছে। কল দিচ্ছে বোর্ডিংয়ের জন্য। একজিট গেট হলো ১০৬। এবার সত্যি ভয় ভয় লাগছে তার। একটানা ১৩/১৪ ঘণ্টা উড়াল। চেয়ার টানার লোককে লাইন টাইন মেনে চলতে হয় না। মানে কিউয়ে না দাঁড়িয়ে সে আস্তে করে সবার আগে গিয়ে দাঁড়ালো। মিলির হাত থেকে পাসপোর্ট বোর্ডিং কার্ড নিয়ে সিল ছাপ করিয়ে আনলো।

তারপর যাচ্ছে তো যাচ্ছে। মিলি আরাম করে দেখতে দেখতে যাচ্ছে। কি সুন্দর সুগন্ধ চারপাশে। এক একটা দোকানে কি পরিমান পারফিউম সাজানো আছে? নিশ্চয় বিক্রি হয়ে যায় সব। এতো যে খাবারে ঠাসা দোকানগুলো, তাই কি আর পড়ে থাকে? আর সৌখিন জিনিসের তো লেখা জোকা নেই। সেখানেও কেনা কাটা চলছে ধুমসে।

এতক্ষণ ঘরে ছিলো বলে অনেক কিছুই দেখেনি। এখন যেতে যেতে দেখছে। অবাক হচ্ছে। এই প্রথম তার দেশের বাইরে আসা। ইস্তাম্বুল বিমান বন্দরের গল্প শুনেছে। কিন্তু সে যে এতো বড়ো, তা ধারণা করতে পারেনি। এতো বিরাট স্থাপনা, এতো বিমানের আনাগোনা, এতো ট্রানজিট যাত্রী, এতো একজিট যাত্রী, এতো গেইট, এতো সিকিউরিটি চেকআপ, এতো মানুষের মালপত্রের ওঠা নামার হিসেব, কি করে যে করে মানুষ?

গেইটের কাছে গিয়ে মিলিকে রাখলো। বললো, এখানে থাকো, আমি আরো দুজন যাত্রীকে আনতে যাবো। চওড়া লাল ফিতে দিয়ে টানেলের পথ আটকানো। আস্তে আস্তে যাত্রীরা এসে লাইন ধরছে। ঠেলাঠেলি নেই। ধাক্কাধাক্কি নেই। বাচ্চারা একটু ছুটোছুটি করছে। প্রত্যেকটা বাচ্চার হাতেই কিছু না কিছু খাবার। আসলে মানুষই তো রাক্ষস। প্রকৃতির অকৃপণ উপাদন এবং কল-কব্জায় তৈরি রকমারি খাবার সব খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় মানুষ যে অনেক বেশি খায়, তাতে সন্দেহ নেই মিলির।

লাল ফিতে খুলে দিলো একজন। অমনি পিল পিল করে সবাই টানেলের দিকে যেতে শুরু করলো। মানুষটা সেই যে গেলো আরো দুজন যাত্রীকে আনতে, এখনো পাত্তা নেই। একবার ভাবলো, হুইল চেয়ার থেকে উঠে হেঁটে চলে যাবে। কিন্তু সাহসে কুলোলো না। দুরু দুরু বুকে বসে আছে মানুষটার আসার পথ চেয়ে।

যদি কোনো কারণে তাকে ফেলে চলে যায় প্লেনটা? কথাটা মনে হতেই ঘেমে উঠলো মিলি। খবর পাবে কী ভাবে নিরা? কিংবা ইমতিয়াজ? সে থাকবে কোথায়? ইমতিয়াজের কথা শুনে এতো সাহস দেখানো তার ঠিক হয়নি।

ইমতিয়াজ ইস্তাম্বুল পর্যন্ত এসে তাকে একেবারে প্লেনে তুলে দিয়ে যেতে পারতো নাকি? নিরাও তো সাহস দিলো খুব। রাগ হচ্ছে সবার ওপর।

অনিরাপত্তা আর অস্থিরতায় ভয় বেড়েই যাচ্ছে মিলির। লোকজনের লাইন ছোটো হয়ে এসেছে। এখনো মানুষটার আসার পাত্তা নেই। কান্না পেয়ে যাচ্ছে মিলির। এমন সময় হুড়মুড় করে দুজন লোক দুটো হুইল চেয়ার নিয়ে এসে পড়লো। গায়ের রঙ আর চুল দেখে বোঝা গেলো, যাত্রী দুজন আফ্রিকার। নিজেদের ভাষায় ওরা কি বলছে কিছুই বোঝা যায় না। দুজনের হাতেই বার্গার আর কোক। এই তো শরীরের হাল! চেয়ার ফাট ফাট অবস্থা! তার ওপর মুখে খাবার লাগিয়েই রেখেছে চুষনির মতো।

টানেলের দিক থেকে একজন লোক এসে বললো, হাতে খাবার নিয়ে ভেতরে যাওয়া যাবে না। এখন মুশকিল হলো, খাবারগুলো ফেলবে কোথায়? বিন ছাড়া যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না। হুইল চেয়ারের চালককেই খাবারগুলো নিয়ে বিনে ফেলতে হলো। এবার তাদের টানেলের দিকে যাত্রা। বাঁচা গেলো। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে মিলি।

নিরাপদ বোধ করতেই মনে হলো নিরার কথা? নিশ্চয় খুব খুশি মনে আছে। কালকেই তো মার সাথে দেখা হবে। কথা বাবু এখন নিশ্চয় ওল্টাতে পারে। তার মানে কিছুদিন পর বুক দিয়ে এগোতে শিখে যাবে। একা একাই হাসে মিলি। তার প্রজন্মের তৃতীয় সিঁড়ি এই কথা। ছবি দেখলে মনে হয় ছয় মাসের বাচ্চা। গ্রোথ ভালো হয়েছে।

কি জ্বালা, সিট পড়বি তো পড় ঐ আফ্রিকান খেকোদের পাশেই পড়েছে। কি আর করা? প্লেনে আর কতোই খাবে? কপাল ভালো কর্ণারে সিট পেয়েছে সে। অনেক কষ্টে ওরা চেয়ারের মধ্যে নিজেদের গুঁজে দিলো। মিলির চিন্তা হলো, যতোবার বাইরে যাবে ততোবার তো এই যুদ্ধ করতে হবে তাদের।

আরাম করে বসে ইমতিয়াজের কথা ভাবতে শুরু করলো। শাশুড়ি আছেন বাসায়। অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। বাবার কথা মনে হলো। খালা সব ঠিক-ঠাক মতো করতে পারছে তো? মাকড়সার জালের এক কোনা ধরে টান দিলে যেমন সমস্ত জাল নড়ে ওঠে, তেমনি হয়েছে মিলিদের সংসারের অবস্থা।

একদিকে তার স্বামী সংসার। অন্য দিকে মা বাবার সংসার। পৃথিবীর উল্টো প্রান্তে মেয়ের স্বামী সংসার। সবচেয়ে আরামে আছে কথা। ঘুড়ির নাটাই হাতে নিয়ে বসে আছে দিব্যি। এখন যতোই একান্নবর্তী সংসারের কথা বলা হোক, বাস্তব কথা হলো, সেটা আর সম্ভব না। সেই সুখ, সেই আরাম, সেই সহমর্মিতা কোনোটাই আর ফিরে আসতে পারে না। তা সে যতোই নাটক

সিনেমা আর সিরিয়ালে দেখাক। মানুষের জীবনই যে হাত পা মেলে দিয়েছে দশ দিকে। ছোটো গণ্ডিতে সে আর থাকতে পারছে না। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির হাতছানিতে তারা যাবেই ছুটে দূরে মাধ্যাকর্ষণের নিচু টান ছিঁড়ে। বুদ্ধি যুক্তি আর টাকার কাছে মানুষের সুকুমার বোধ বৃত্তি আর মায়া মমতা হেরে যাচ্ছে। কেমন কষ্টকর এক প্রতিযোগিতা যেনো। আপোসও আছে, সংঘর্ষও আছে।

নিরা আর মাসুমকে দেখে মিলি অবাক হয়। দুজন দুজনকে পছন্দ করে। কিন্তু কোথায় যেনো একটা ফাঁক আছে। হরিহর আত্মা ভাবটা নেই। হয়তো হবে পরে। ভালবাসাও তো অনেক আচরণের অভ্যেসের ব্যাপার। কাছাকাছি থাকতে থাকতে গ্রো করবে হয়তো। অথবা করবে না। কে জানে? ওদের দেখে ভয় লাগে মিলির। ওদের দর্শনে ইগোই বড়ো। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বোঝা যায় না সহজে।

যাক, এখন নিরার কাছে কিছুদিন থেকে ওকে যদি একটু শান্ত করে আসা যায়। মা বাবার এক সন্তান হওয়াও বিপদ। পর্যাপ্ত মায়া মমতা ভালবাসা আহ্লাদ আবদারের মধ্যে মানুষ হয়। বিয়ে হলেই যে সব কমে যাবে তা তো নয়। স্বামী-সংসার-সন্তান হলেই যে জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে তাও নয়। সময় লাগে। নিরা তো প্রেম করেও বিয়ে করেনি। আর করলেই বা কি? প্রেম তো হরমোনের ব্যাপার। একটা বয়সে মেয়ে এবং ছেলে পরস্পরের সঙ্গ পছন্দ করে। এখনকার ছেলে মেয়েরা তাই বলে, আমি তো ভালোবাসি না। বাসে আমার শরীরের হরমোন। কি মারাত্মক কথা! মানেটাই তো বুঝতে পারে না মিলি!

আসলে মানুষ কতোটুকু জানে এই পৃথিবীর? সেদিন টিভি প্রোগ্রামে সমুদ্রের বিচিত্র মাছ জাতীয় প্রাণি দেখাচ্ছিলো। কোনো কোনো মাছ এতো বর্ণালি যে মনে হয়, শিল্পী এঁকেছে পানির নিচে বসে। সাগরের তলদেশ আরেক অবাক করা পাটাতন। বালি নুড়ির সমতলে কতো প্রজাতির জলজ প্রাণি আছে এবং তারা কীভাবে বেঁচে আছে সেটাও বিস্ময়কর। রিপোর্টে বললো, মাত্র ৩৫% ভাগ জলজ প্রাণি মাছ ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষ এযাবৎ জানতে পেরেছে। একবিংশ শতকে এসে মানুষ এখনও কতো অজানার মধ্যে আছে?

ও বাব্বা! এরি মধ্যে খাবার দেয়ার সময় হয়ে গেলো? মিলির এক পাড়াতুতো মামা ছিলেন। তিনি বলতেন, জানো মামনি, যারা কাজের জন্য বেশি বেশি আকাশে ওড়ে, তারা খেতে খেতে মোটা হয়ে যায়।
-না খেলেই হয়। মিলি হাসে।

-কী যে বলো না মা মনি, যা মজার মজার খাবার দেয়, না খেলে থাকা যায় না। তুমি হলেও না খেয়ে থাকতে পারতে না।
-যদি সুযোগ হয় জীবনে, তাহলে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করবো আপনার কথা মামা।
সেই মামাটা মাসে কমপক্ষে তিন বার বিদেশে যেতেন। এই কাছে কুলের দেশেই। যেমন, নেপাল, ভুটান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মায়ানমার, খুনমিং, আর ভারত তো ডালভাত। কয়েকমাস আগে নেপালে প্লেনক্র্যাশ করে মারা গেলো মামাটা। দুঃখজনক। মানুষটা দিলখোলা ছিলেন। কথা বলতো কেমন হাউমাউ করে। ঐ এক তার স্টাইল ছিলো।
আরে ছি ছি। প্লেনে বসে এইসব কি কথা তার মনে আসছে? একটু দোয়া দরুদ পড়ে নেয়। বোবা হয়ে বসে থাকার এই ফল। কথাবার্তা বললে এই সব উল্টো পাল্টা ভাবনা মাথায় আসে না।

পাশের দু'জন খেতে শুরু করেছে। মিলি এলুফোলিওর বক্সটা খুললো। বেশ গরম আছে এখনও খাবার। এমন আঁটসাট জায়গায় তার খাওয়ার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কষ্ট করেই ম্যানেজ করতে হচ্ছে। এমন সময় এলো চা দিতে। খাওয়া শুরুই করতে পারলো না তার মধ্যে চা নেবে কীভাবে? পাশের ওরা কফি নিলো। খাওয়া শেষ করে ফেলেছে দু'জনেই। বাহবা দিতে হয় ওদের।

খাবারটা ভালো ছিলো। মুরগীর মাংস, বেগুন ভাজি, সালাদ, ডেসার্ট আর চা বা কফি যে যেটা চায়। তার খাওয়া শেষ হতে না হতেই পাশের দুজনের বের হওয়ার তাড়া দেখা গেলো। চেয়ার থেকে উঠে মিলি বাইরে দাঁড়ালো। যথেষ্ট কষ্ট করে ওরা বের হলো। মা বলতেন, বেশি মোটা হওয়া একটা আজাব। আজ চাক্ষুষ প্রমান পেলো তার।

একসময়ে দীর্ঘ বিরক্তিকর যাত্রা শেষ হলো। রীতিমতো পা ফুলে গেছে মিলির। জুতো পরতে বেশ কসরত করতে হলো। প্লেনটা দৌড়াচ্ছে এখন টরেন্টো পিয়ার্সন এয়ারপোর্টের রানওয়েতে। মাটি ছোঁয়ার আগেই দেখেছে মিলি, চারদিকে শুধু ন্যাড়া গাছ। খয়েরি রঙের মরা ডাল পালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো বসন্তের প্রতীক্ষায়।

তিন

খুশির হাওয়ায় বাড়িটা যেন দোলনার মতো দুলছে দু'দিন ধরেই। কিছু না বুঝেই হাসছে কথাও। কথাকে দেখে মিলি আনন্দে উতল হয়ে যাচ্ছে। একেবারে রসগোল্লা হয়েছে বাচ্চাটা। কোলে নিলে জান ভরে যায়। মাসুম হঠাৎ বলে, আচ্ছা মা, কথা কার মতো হয়েছে?

-এখন কি বোঝা যায় বাবা? এই চেহারা কতবার বদলাবে। মিলি হাসে।

-আমার মনে হয়, কথা আমার মতো হয়েছে। নিরা বলে।

-কপালটা আমার মতো হয়েছে কিনা বলেন তো মা? মাসুম দাবি করে।

-পাগল, তোরা বুঝি সারাদিন এই হিসেব করিস? মিলি মেয়ে জামাই দু'জনের মুখের দিকে তাকায়। ওরাও হাসে, মিলিও হাসে।

-এখনই কি বুদ্ধি হয়েছে মা জানো? নিরা বলে।

-যেমন? আমি তো দেখছি শুধু খেলতে চায়।

-সেটা ঠিক। তবে সময় বুঝে ওর ভালোবাসা বদলে যায়।

-কি বলছিস, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মাসুম বলে, মা, শুধু শুধু আমার ছেলেটাকে মন্দ বলে নিরা।

-মন্দ না মা। আমি ওর বুদ্ধির কথা বলছি। মাসুম সারাদিন বাসায় থাকে না, অথচ বাসায় এলেই কথা আর আমাকে চেনে না। ঝাঁপিয়ে যাবে ওর কোলে।

-তো আমার ছেলে আমার কাছে আসবে না? গর্বে জ্বলজ্বল করে মাসুমের চোখ।

মিলি হাসে। বলে, মাসুম তো বেশ কোলেও রাখতে পারে দেখছি।

খুশির খুনসুটি দুজনের মধ্যে চলে কিছুক্ষণ। খুব ভালো লাগে মিলির।

এখনও কোল বাছাবাছি নেই। হাত বাড়ালেই কোলে চলে আসে। মাথাভরা কালো চুল। কালো টানা চোখ। নিরার মতো বাঁকা ভ্রু। নাক হয়েছে মাসুমের মতো। খাড়া নাক। এক কথায় সুদর্শন বাচ্চা। নিরা বললো, যে দেখে সেই ওকে আদর করে। আর উনি তো সবার বন্ধু। সবার কোলেই হাসতে হাসতে চলে যান।

বেশ সুন্দর ম্যানেজ করছে নিরা। একটা বাচ্চার কাজ মানে ফুল টাইম জব। সারাদিন করেও যাচ্ছে। তারপরেও কেন বলছে, ভালো লাগে না?

সুন্দর অ্যাপার্টমেন্ট। দুটো বেডরুম। রান্নাঘর, খাবার স্পেস আর একটা বেলকনি। ঘরে হিটার অন করাই থাকে। তবু মনে হয় বাংলাদেশের শীতকাল ঘরের মধ্যেও। মার্চ মাস যাই যাই করছে। এখনো কি ঠাণ্ডা!

যে ভয়টা করেছিলো মিলি, তার ছায়াও দেখলো না এই ক'দিনে। বরং ওরা আরো কাছাকাছি হয়েছে বলেই মনে হয়। যাক, সুখি হোক ওরা। দীর্ঘজীবি হোক। ইমতিয়াজেরও একটু ভয় ছিলো মেয়েকে নিয়ে। মিলির কাছে সব শুনে হালকা হয়ে গেছে মন। আসলে বিয়ে-শাদির ব্যাপার, কখন যে কীভাবে ঘটে যায়!

মাসুমের বাবার সাথে পরিচয় হয়েছিলো তারই ক্লিনিকে। মেডিসিন বিভাগে। ক্লিনিকে এখন শিশু বিভাগ খোলার কথাও চলছে। প্রচণ্ড পেটে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ভদ্রলোক। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা গেলো, খাদ্যনালিতে ফুটো আছে। সেখান থেকে খাবারের রস বের হয়ে পেটে এলেই ব্যথা বাড়ে। অপারেশন করার পরে সপ্তাহখানেক থাকতে হয়েছিলো ক্লিনিকে। তখন দেখেছিলেন মাসুমকে। বাবার পাশে ঠায় বসে থাকতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেজান, ইমানও আসতো। সেজান ডাক্তারি পড়ছে বলে বাবার চিকিৎসা নিয়ে সেই কথা বলতো ডাক্তারের সাথে। ক্লিনিকের পরিচালক হিসেবে রাউন্ড দেয়ার সময় রোগীর খোঁজ-খবর নিতেন ইমতিয়াজ।

খুব ভালো লেগেছিল পরিবারটাকে ইমতিয়াজের। ওপরওয়ালার কী খেলা! কোথায় যে নাটাইয়ের সুতো বেঁধে দিয়েছিলেন, কেউ জানেনি। ঠিক সময় মতো সেই নাটাইয়ে টান পড়লো। অমনি ঘুড়ি এসে হাজির। তাছাড়া আজকাল ছেলে মেয়ের পছন্দ ছাড়া বিয়েই তো হয় না। তবু হয়েছে। কথায় আছে না, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, এই তিন বিধির বিধান নিয়ে।

মার্চ মাসেও বাইরে তুষার পড়ছে। তবে পড়ছে না বলে ঝরছে বলাই ভালো। সকাল থেকেই ফুলের পাতলা পাঁপড়ির মতো ফ্লেক্স ভেসে ভেসে নামছে আকাশ থেকে। দেখতে বেশ ভালো লাগে। এরই মধ্যে মানুষ কাজে দৌড়োচ্ছে। কাপড়-চোপড়ের চোটে মানুষকে মনে হয় একটা কাপড়ের রোল হেঁটে যাচ্ছে। পায়ে উইন্টার সু। বাচ্চাগুলোকে দেখতে আরো মজা লাগে। নাক ঠোঁট আর চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। হাতে গ্লাভস তো থাকেই, কারো কারো নোজ মাফও থাকে।

নিরা এসে বললো, আজ মাইনাস ৬ ডিগ্রি ঠাণ্ডা। বরফগুলো জমে কাঁচের মতো হয়ে গেছে। তার ওপর আজ আবার ঝরতে শুরু করেছে। এর মধ্যে বাইরে যেতে ইচ্ছে করে মা? তুমি বলো?

-বাইরে যেতে হবে কেন?
-কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে। আর আমার বাইরে যাওয়া মানে, তোমার নাতিকে তৈরি করতেই লাগবে আধাঘণ্টা।
-মাসুম বাজার সদাই করে আনে না?
-ওই তো করে সব। সপ্তায় একদিনে সাত দিনের জিনিস কিনে আনে। আগামি মাসে গাড়ি কিনলে ওর জানে একটু আরাম হবে মা। বেচারার বেশ কষ্ট হয়।
-কথা ঠিক। এমন ঠাণ্ডার দেশে গাড়ি ছাড়া চলা খুব মুশকিল। বিশেষ করে ছোটো বাচ্চা থাকলে। মিলি সমর্থন করে নিরাকে।
-আমাদের প্রতিবেশী খুব ভালো বলে আমরা আরামে আছি মা। সপ্তাহের বাজারে এডাম লিফট দেয় মাসুমকে। নাহলে খুবই কষ্ট হতো মাসুমের।
-কোন দেশের মানুষ ওরা?
-এডাম আমেরিকান, ওর গার্লফ্রেন্ড মাদাগাস্কারের।
সংস্কারে একটু ঘা লাগে মিলির। স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকে, তো বিয়ে করলে কি হয়? মেয়েকে বলে, তারপরেও তোকে কেনাকাটা করতে হয় কেন?
-মাঝে মাঝে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যেতেই হয় মা। এই ধরো প্যাম্পার শেষ হয়ে গেলো, ডিমের কথা মনে ছিল না এই সব। ডিম তো সকাল হলেই লাগবে। মাসুমের লাগবে, কথার লাগবে, আমার লাগবে। তোমার লাগবে।
-আমি রোজ ডিম খাই না বাবা।
-ঠাণ্ডার দেশে খেতে হয় মা।
-এখানকার বাংলাদেশি লোকজনের সাথে আলাপ হয়নি তোর এখনও?
-হয়েছে। কিন্তু গাড়ি না হলে এই ঠাণ্ডার মধ্যে বাচ্চা নিয়ে বেড়ানো খুব ঝামেলার কাজ মা। যাদের গাড়ি আছে তারা বেড়াতে আসে মাঝে মাঝে। তাছাড়া এলামই বা আর কতো দিন?
-তুই যখন বাইরে টাইরে যেতে পারবি, তখন এই দেশটা তোর ভালো লাগবে দেখিস।
-আসলে এই উদ্ভট ঠাণ্ডাই আমার ভালো লাগে না।
-ঘরে তো ঠাণ্ডা নেই রে বাবা। এখানে সামার হয় না?
-শুনেছি হয়। কেবল তো এলাম। তবে এখানকার সামার খুব কম দিনের জন্য। বলতে পার দশ মাসই ঠাণ্ডা।
-ঠিক হয়ে যাবে মা। মানুষ এই দেশেই কতো উন্নতি করছে। এরই মধ্যে কাজও করছে।

এই রকম কথাবার্তা মাঝে মাঝেই হয় মা আর মেয়ের মধ্যে। দুই বাড়ি থেকেই ফোন আসে রোজ। স্কাইপে কথা হয়। দেখা হয়। কথাকে দেখার জন্যই সবার বেশি আগ্রহ। তার হাত পা নাড়া, আ উ করা, ফোকলা মুখের হাসি, এই সব

দেখে দেশের সবাই মজা পায় খুব। প্রতিবেশিরাও খুব মিশুক। কথা তো সবার বন্ধু। তার খুব আদর এখানেও।

গত উইকেন্ডে মাসুম দাওয়াত করেছিলো কয়েকজনকে। তার মধ্যে দুজন বাংলাদেশিও ছিলো। সিনিয়র জনের নাম মশিউর। তাকে নাকি আড়ালে সবাই কুতুব বলে। সে জানে না, এমন কোনো কাজ নেই। সবার বিপদে পাশে থাকে সে। দেশ ছেড়েছে প্রায় তিরিশ বছর। বহু দেশ ঘুরে অবশেষে কানাডায় থিতু হয়েছে। সবারই সে বড়ো ভাই। মিলির বেশ ভালো লাগলো মানুষটাকে।

দাওয়াতে সবই বাংলাদেশি রান্না হয়েছিলো। তার ওপর এখন মিলি আছে। মাসুম পাঙাশ মাছ এনেছিলো। বেগুন আর বড়ি দিয়ে রান্না করলো মিলি। আরো ছিলো মুরগির রোস্ট, কোপ্তা, নিরামিষ তরকারি আর ঘন মুগের ডাল। ডেজার্ট হিসেবে রসমালাই করেছিলো মিলি। খুব জমিয়ে খেলো সবাই। মশিউর বলে, নিতাই থাকলে পাগল হয়ে যেত খাওয়ার আইটেম দেখলে।

অন্য বন্ধু জামান বললো, ও শুধু খেতেই জানে। কখনো খাওয়ায় না। খাঁটি মালু স্বভাব। থুক্কু, তবে মানুষটা ভালো। টরেন্টোর এনসাইক্লোপিডিয়াও। এক সময় বেশ প্রাণবন্ত ছিলো। বউটা চলে যাওয়ার পর থেকে কেমন ঝিমিয়ে গেছে।

মাসুম বলে, আমি তো চিনি না। মশিউর ভাই নিয়ে এলেই ভালো করতেন। পরিচয়টাও হয়ে যেত।
-আনতে তো পারতাম। কিন্তু ভাবলাম, নতুন পরিচয়, তুমি যদি কিছু মনে করো? এমনি তো বন্ধুবাজ বলে আমার সুনাম আছে। কোনো দাওয়াতে গেলে দু-চারজন বগলদাবা করে নিয়ে যাই।

সবাই শব্দ করে হেসে উঠলো। এডাম বাংলা কথার কিছু না বুঝেই হাসলো। হাসি আসলে সংক্রামক।

এডাম বললো, বাংলাদেশি রান্না আমি আগে খাইনি। আমার খুব ভালো লেগেছে সব রান্না। ওর গার্লফ্রেন্ডও একই কথা বললো। রসমালাই শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে মিলি লজ্জাই পেলো। কারণ সে তো জানে না যে এরা এত পছন্দ করবে! তাহলে কিছু বেশি করতো। এখানকার দুধ ভালো। ছানা হয় ভালো। মিষ্টি তৈরি করে আরাম পাওয়া যায়।

লম্বা পাঁচটা দিন পরে আসে উইকেন্ড। কিন্তু উড়ে যায় ফুড়ুৎ করে। কাল থেকে আবার শুরু হবে কাজ। তিন সপ্তাহের মধ্যে নিরা অনেক স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। আগামী সপ্তায় গাড়ি এসে গেলে মনে হয় খুশি হবে নিশ্চয় আরো। সেদিন গল্প করছিলো, মাসুম বলেছে, গাড়ি এলেই কয়েকটা শহর

ঘুরবে। অটোয়া, মন্ট্রিয়ল, কুইবেক বলতে গেলে লাইন করে সাজানো মানচিত্রে। আর সবখানে ওর বন্ধু-বান্ধব আছে।
-তাহলে তো ভালোই।
-মা তুমি কোথায় যেতে চাও?
মিলি তো ঢাকায় যেতে চায়। ইমতিয়াজ কাল কি সব বলছিলো। নিজের নারী ছাড়া নাকি বিছানা শব্দের শেষ 'না' অক্ষর উড়ে যায়। বিছানা তখন হয় 'বিছা'। বিছানা নাকি তাকে কামড়াচ্ছে।
-তুমি এমন করে কথা বললে আমি এখানে থাকি কেমন করে বলো তো?
-আরে ভাই, ঠাট্টা করলাম। হাসে দু'জনেই।
-মা কেমন আছেন?
-আম্মা তো বাবার জন্য কাতর।
-যাহ! অসভ্য! মা বাবাকে নিয়ে এসব কেউ বলে?
-খারাপ কি বললাম রানি? রোজ রাতে বাবার সাথে একবার কথা না বলতে পারলে মায়ের ঘুম হয় না।
-সে তো হবেই। বেচারা খালা কী করছে না করছে, সেটা নিয়ে মায়ের চিন্তা থাকাই স্বাভাবিক। বুড়ো মানুষের যত্ন দরকার বেশি।
-আমিও পাবো তো?
-দেখা যাবে।
-ও হ্যাঁ, মা যে খালাকে রেখে এসেছেন তার কাছে নাকি বিদেশি এক মেয়ে এসে দাবি করেছে যে, সে তার পৌত্রি।
-তারপর? সে কী খালাকে নিয়ে যেতে চায়?
-তাই তো বললেন মা।
-সে কী কথা? তাহলে বাবার কী হবে?
-মাকে দিয়ে আসতে হবে বাবার কাছে।
-তোমার দেখাশোনা কে করবে? মিলির নিঃশ্বাস পড়ে ঘনঘন।
-দেখাই যাক না কী হয়। তুমি এত ভেবো না। ওরা কেমন আছে সেই সব বলো।
-ওরা ভালো। তা বেয়াই বেয়ান আসেন বেড়াতে?
কী হলো মা? কোথায় বেড়াতে যাবে বললে না যে? কী ভাবছো এত? বাবার কথা না? নিরা হাসে।
কান গরম হয়ে ওঠে মিলির। বলে, না না কিছু ভাবি নি। তাছাড়া আমি কী কিছু চিনি যে বলবো?
-নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার কথাটা বলতে পারতে।

-নায়াগ্রা কাছে কি? খুশিতে চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে মিলির।
-গাড়ি থাকলে অসুবিধে নেই মা। মাসুম বলেছিলো, খুব দূরেও নয়। এখানে রাস্তা ভালো। গাড়িতে স্পিড দেয়া যায়।

মশিউর ফোন করলো, নিরা এই উইকেন্ডে আমার বাসায় দাওয়াত। খালাম্মাকে নিয়ে আসবে।
-মাসুমকে বলেছেন?
-তুমি আর ও কি আলাদা? শুধু বলে দেবে, মশিউর ভাই দাওয়াত দিয়েছে। হ্যাঁ, একটাই রিকোয়েস্ট, খালাম্মা এখানে রসমালাই তৈরি করবেন। আমি সব জোগাড় করে রাখবো।
-তো কথাটা আপনি মাকে বললে ভালো হয় না?
-সাহস পাচ্ছি না বোন। গলার স্বর একেবারে নিচে নেমে গেলো।
-না না কোনো অসুবিধে নেই, আপনি মাকে বলেন। ধরেন, এই যে মা, কথা বলেন। ফোনটা মিলির হাতে দেয় নিরা।
-হ্যালো, মিলি বলে।
-হ্যালো খালাম্মা, স্লামালেকুম। আমি মশিউর। কেমন আছেন?
-ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছি। আপনি ভালো তো?
-ইস খালাম্মা, আমাকে আপনি করে বললে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করে। আমাকে 'তুমি' করে বলবেন প্লিজ।
-আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে।
-আমার একটা আবদার আছে খালাম্মা।
-বলো।
-আগামী শনিবারে আমার বাসায় দাওয়াত। আপনি আসবেন এবং আমাদের জন্য রসমালাই বানিয়ে দেবেন। আমি সব এনে রাখবো।
-সে কি? আমিই বানিয়ে নিয়ে যাবো। তোমাকে কিচ্ছু জোগাড় করতে হবে না।
-আপনি কি খেতে পছন্দ করেন খালাম্মা?
মিলি তো অবাক। যেন কত কালের পরিচয়। হয়তো ও এরকমই। বলে, তোমরা যা খাবে, আমিও তাই খাবো।
-না না না' তা হবে না খালাম্মা। আপনার অনারে দাওয়াত। আপনি যা বলবেন তাই রান্না হবে।
-খুব বিপদে ফেললে বাবা।
-আমি কিন্তু খুব ভালো চিকেন বিরিয়ানি রান্না করতে পারি।
-তাহলে সেটাই হোক।
-আর কিছু? রেজালা, কোপ্তা, ডিমের কালিয়া?

খুব হড়বড়ে মানুষটা। ছেলেমানুষের মতো হাউ মাউ করে কথা বলে। ফরমালিটির বালাই নেই। পরিচয় হওয়া মাত্রই সবাই তার আপন হয়ে যায়। তার ওপর বড়ো ভাই হিসেবে তার একটা স্টেটাস আছে এখানে।

মশিউরের বাসায় যেতেও হলো, খেতেও হলো। চিকেন বিরিয়ানির সাথে ডিমের কালিয়া মানায় মন্দ না, তবে রান্নাটা ভালো হতে হবে তো?
রসমালাই বানিয়ে নিয়ে গেছিলো মিলি। রফা হয়েছিলো আগেই।
অনেকক্ষণ ধরে মিলি একটা কথা জানতে চাচ্ছিলো, মশিউরের বউ কই? শেষে বলেই ফেললো, বউকে দেখলাম না মশিউর। ডাকো তাকে।
-বউ থাকলে তো ডাকবো খালাম্মা? তবে আমার অবস্থা কিন্তু নিতাইয়ের মতো না, সে কারো সাথে চলে যায়নি, গাড়ি এক্সিডেন্ট করে চলে গেছে এলিয়েনদের দেশে দু'বছর আগে। আমার কথা ভাবেনি। স্বার্থপর মেয়ে।

থমকে যায় মিলি। তবু কিছু বলতে হয়। বলে, কি কথা শোনালে বাবা? এতো সব রান্না করলো কে তাহলে?
-আমিই করেছি। সাহায্য করেছে আন্না। এই দেশের মেয়ে। আমার বান্ধবি। আমার সাথে থাকে। ঘরনিও বলতে পারেন।
-আন্না মানে ঐ যে বার বার খাবার সার্ভ করছে?
-ঠিক বলেছেন। মা বাবা নেই। এতিম। খুব ভালো মেয়ে খালাম্মা। বয়স কম। কিন্তু বুদ্ধি ভালো। আমরা বেশ ভালো আছি। দোয়া করবেন। হড়বড় করে বলে গেলো মশিউর।

কেমন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে মিলির। মশিউরের আত্মীয় স্বজন আছে কিনা দেশে, কেউ জানে না। দেশেও যায় না সে। মিলির মনে হলো, সেও একটা খাঁটি এতিম। এখন তো যথার্থ অর্থেই দুই এতিমের সংসার। খেতে খেতে আরো গল্প হলো মশিউরের সাথে। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। বউ চায়নি তাই নেয়নি। কিন্তু আন্না চায় বাচ্চা। মা হওয়ার খুব শখ ওর। বলে, পৃথিবীতে যে এলাম, তার কোনো চিহ্ন রেখে যাবোনা? তা কেন হবে?

আগে আমি ভাবিনি এসব কথা খালাম্মা। এখন আন্নার কথায় আমারও মনে হচ্ছে, এই পৃথিবীতে যে এসেছিলাম, তার একটা নমুনা তো রেখে যেতে হবে। যদিও একান্ন বছর পার হলো। আন্নার বয়স ছাব্বিশ বছর। আমি হয়তো বাচ্চা মানুষ করে যেতে পারবো না। আন্না করবে। শক্ত মেয়ে। ও পারবে। মরেও শান্তি পাবো। আমাদের বাচ্চা এই পৃথিবীতে থাকবে আমাদের রক্ত মাংসের চিহ্ন শরীরে নিয়ে। হয়তো সে অনেক ভালো জীবন গড়ে নিতে পারবে। তার একটা পরিচয় থাকবে। যার সাথে জড়িয়ে থাকবো আমরা।

চোখ ভিজে গেছে মিলির। বুকের ভেতর এত শূন্যতা নিয়ে এরা বেঁচে থাকে উন্নত জীবনের জন্য? আহারে জীবন! একটা মানবজনম কি সোজা কথা? জন্ম নিলাম, বড়ো হলাম, হৈ হৈ করে জীবন কাটিয়ে দিলাম, একদিন মরে গেলাম। হয় কবর দিলো, নাহয় পোড়ালো। ব্যাস! মানুষটা যে এসেছিলো মাটির পৃথিবীতে, সেটা যেনো মাটিতেই মিশে গেলো, নয় বাতাসে মিলিয়ে গেলো। এটা তো কোনো মানবিক দর্শন হতে পারে না। বিদেশে সারাদিন কাজ করে, ভালো খায় দায়, হৈ চৈ আনন্দ ফূর্তি করে, কিন্তু বুকের মধ্যে সাত আসমান জোড়া হাহাকার। অতীত বা ভবিষ্যৎ নেই। আছে শুধু বর্তমান। হয়তো এটাই আধুনিক জীবন। এরা পেছনে তাকাতে চায় না গায়ের জোরে।

এরা অভিবাসী হয়েছে ইচ্ছে করে। উন্নত দেশে উন্নত জীবনের আশায়। মশিউর তো পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে এসেছে। সেটাও মস্ত বড়ো অভিজ্ঞতা। মাঝখানে একবার মিলি জানতে চায়, দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়নি কখনও?
-একেবারেই না।
মিলি চুপ করে থাকে। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় না।
-ভাবছেন, কেনো দেশে যেতে চাইনি? মশিউর বলে।
-সত্যি তাই ভাবছিলাম বাবা, মিলি বলে।
-বাবা মায়ের অশান্তির সংসারে থাকতে পারিনি বলেই তো চলে এসেছিলাম দেশ ছেড়ে। আবার সেই দোজখে যাবো, ভাবতেই পারি নি। জানতেও চাইনি ওঁরা কেমন আছেন?

মশিউর আরো বললো, অনেকেই বিদেশে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়। ওদের সবাই কিন্তু রাজনৈতিক ভিক্টিম নয় খালাম্মা। অনেকেই পারিবারিক অশান্তির কারনে দেশ ছেড়েছে। কেউ কেউ উন্নত জীবনের আশায় মিথ্যে রাজনৈতিক ভিক্টিম সেজেছে। এখন তো টাকা পয়সা দিয়ে দালাল ধরে লোকে ইমিগ্রান্ট হয়ে বিদেশে চলে আসে। অভিবাসী হয়। বাকিরাও কি অভিবাসী নয়? সবাই উন্নত জীবন চায়। এই চাওয়ার দাম কে যে কীভাবে মেটায় সেটার তথ্য জানে ক'জন খালাম্মা?

আর সহ্য হয় না মিলির। সামলাতেও পারে না। টপ টপ করে দুচোখ দিয়ে ঝরে পড়ে নোনা পানির নিটোল মুক্তো। মুখ ঘুরিয়ে টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে ফেলে। দ্রুত চলে যায় খাবার টেবিলের দিকে। মন ভরে গেছে বিষাদে। পেট ভরে গেছে খাবারে। তবু টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো। আন্না এলো কাছে, কিছু দেবো খালাম্মা?
হাসে মিলি। বলে, তুমিও শিখে গেছো ডাকতে?
-মশি আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে।

-দেশ কোথায় তোমার?
-এতো বড়ো পৃথিবীর কোথাও হবে। আন্না হাসে।
-কে কে আছে তোমার?
-জানি না।
-মানেটা কি আন্না?
-শুনিনি কোনোদিন যে, আমার কোনো আত্মীয় আছে?
-বড়ো হলে কার কাছে?
-পথে পথে ঘাটে ঘাটে।
-মা তো নিশ্চয় আছেন?
-শুনেছি জন্ম দিয়েই হাসতে হাসতে আকাশের তারা হয়ে গেছেন তিনি। আমার জন্য কোনো দায় নিয়ে জন্মাননি আমার মা।
-তারপর?
-এক গরিব কৃষক কুড়িয়ে নিয়ে যায় আমাকে। সেখান থেকে হোমে। যাক, আমার কথা থাক খালাম্মা, আমি এভোকাডো দিয়ে একটা ডেজার্ট বানিয়েছি, একটু খাবেন তো?

ভাবের ঘরে চুরি আর কতক্ষণ করা যায়? অবাধ্য চোখের আচরণ তাকে বিপদে ফেললো।
-কাঁদছেন কেনো খালাম্মা?
-না গো মেয়ে, ঝাল তরকারিটার ঝোল গেছে চোখে।
দৌড়ে গিয়ে আন্না টিস্যু পেপার আনলো এক মুঠো।
-ওয়াসরুম থেকে আসি আন্না। তারপর তোমার রান্না ডেসার্ট খাবো। এভোকাডো একটা ফল হলো? বিশ্রী লাগে মিলির কাছে। তবু খেলো দু'চামচ। মনে হলো দুধ দিয়ে মাখানো সাদা নরম কাদা। অনেকেই পছন্দ করে। মিলি একেবারেই না। এখানে এসেই খেয়েছে প্রথম ফলটা।

খুব ভালো হলো পার্টি। এবার আর রসমালাই শেষ হলো না। সেটা দেখে মশিউর খুব খুশি। এখানকার পার্টি শেষ হলে সবাই ধোয়া মোছায় সাহায্য করে। কিন্তু কাউকে কিছু করতে দিলো না মশিউর। রাগ হলে সবাইকে সে তুই তুই করে বলে। বললো, খাওয়া দাওয়া শেষ, এবার তোরা বাড়ি যা। আমার কাজ আমাকে করতে দে।

বাড়ি আসার পর মাসুমের বাবা ফোন করে বললেন, স্কাইপ ওপেন কর নিরা, তোদের দেখি। সেই কখন থেকে বসে আছি। উইকেন্ডে রাত দশটা মানে কিছু না। প্রায় এগারোটা পর্যন্ত চললো গল্প-গুজব। কথাটাও পেকে গেছে বড়োদের সাথে থাকতে থাকতে। এও আও করে নানা রকম শব্দ শোনালো

কথা। সেটা শুনে নানা তো আত্মহারা। দাদাও পছন্দ করেন কথার এই দুর্বোধ্য ভাষার ধ্বনিমালা। দাদির রসজ্ঞান একটু ধার, মানে শক্ত। বলেন, তোর ভাষা আমি বুঝি না দাদু।

নতুন সপ্তাহ শুরু হলো। উইকেন্ডে নিরা সময় পায় না। মাসুমকে সময় দিতে হয়। কথা তো আছেই। মনে হয় নিরার দুইটা বেবি। দেখে ভালো লাগে মিলির। ওরা কাছাকাছি হচ্ছে। খুনসুটি আছে। ঝগড়া নেই। মতান্তর আছে, জেদাজেদি নেই। দু'জন দু'জনকে সুখি রাখতে চায়। যৌথ জীবনে আরামের সমীরন সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। প্রাণটা জুড়িয়ে থাকে।
মিলিই একদিন কথা পাড়ে নিরার কাছে। সত্যি করে বলতো, এখানে কেমন লাগছে?
-তুমি আছো তাই ভালো লাগছে। হাসে নিরা।
-হাসির কথা না রে মা, এখানে সবাই কেমন একা একা, ওপরে হাসি খুশি, কিন্তু মনের ভেতর শূন্য।
-তুমি বুঝলে কি করে মা?
-মশিউরকে দেখে অনেক কিছু বুঝতে পারলাম।
-তাই দেখলাম। খুব গল্প করছে তোমার সাথে। নিরা আবার বলে,
-ও তো রাজনৈতিক আশ্রয়ে বিদেশে ঢুকেছে।
-না রে, ও এসেছে মা বাবার অশান্তির সংসারে থাকতে না পেরে। বাবা আর একটা বিয়ে করার পরে মায়ের নিগ্রহ বাড়ে। অনেক কষ্টে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে প্রথমে যায় ব্রুনাই। পালিয়ে পালিয়েই দেশ থেকে দেশান্তরে বেড়িয়েছে। অনেক পরে একটু থিতুর জন্য রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে।
-তোমাকে এতো কথা বলেছে?
-বললো তো। শিক্ষা ছিলো না বলে কোথাও ভালো কাজ পায়নি। বারে বারে কাজ বদল করতে হয়েছে।
-এখন তো ভালো আছে মা। ভালো কাজ করছে।
-কি করে জানিস?
-তা জানি না মা। এখানে কেউ কাজের কথা জানতে চায় না।
ব্যক্তিগত জীবনের জানালায় উঁকি দেয়াও অভদ্রতা।
-একটা থাই রেস্টুরেন্টে শেফ কুক। ভালো বেতন পায়। কিন্তু রক্ত নিংড়ে নেয়। সারাটা উইকেন্ড তাই হৈ চৈ করে কাটায়।
-খুব ফূর্তিবাজ মানুষ। সবাই পছন্দ করে মশি ভাইকে।
-বললো, এখানে বাপ দাদার পরিচয় জানতে চাইলে কেউ সত্যি কথা বলে না খালাম্মা।
-এটা আবার কেমন কথা মা? নিরা হাসে।

-মশির এক বন্ধুর কথা বললো, সে বলে তার বাবার তিন চারটা লঞ্চ ছিলো। কিন্তু বাবার ব্যবসা ভালো লাগলো না তার। তাই চোরা পথে প্রথমে ইতালি আসে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে কানাডায়।
-হতেই পারে। মুশকিল কি জানো মা? জীবনে এরা বড়ো হতে চায়, উন্নত জীবন চায়। কিন্তু দেশে লেখা পড়া করতে চায় না। ভাবে, বিদেশে গাছে গাছে বাঁধা থাকে সোনার হরিণ। সেগুলো সোনার বাচ্চা দেয় প্রতি রাতে। ফুল কুড়োনোর মতো তুলে আনা মাত্রই কাজ। তারপর টাকা আর টাকা।
-আমারও তাই মনে হয়। তো সেই ছেলের লঞ্চের মালিক বাবার কথা জানালো মশি। বললো, ওর বাবা লঞ্চঘাটের কুলি থেকে পরে কুলির সর্দার হয়। তখন তার দাপট বাড়ে। টাকা পয়সা হাতে আসে নানা ভাবে। তখন ভেবেছে ছেলেকে পাঠাই বিদেশে। ছেলেও রাজি। তারপর যা হবার তাই হয়েছে। গর্বে বুক উঁচু করে ছেলেকে পাঠিয়েছে বিদেশে।
-ওরা দেশে ফিরতে চায় না কেনো মা?
-কি করে যাবে? দেশে বাবা প্রচার দিয়েছে, ছেলে খুব ভালো চাকরি করে। মেম বিয়ে করে খুব ভালো আছে।
-এই সব ছেলেদের বিয়ে তো বেশির ভাগই টেকে না মা।
-তোদের নিতাই তো সেই গোত্রের। বিদেশে দুই বার বিয়ে করেছে। একটাও থাকে নি।
-নিতাইয়ের কপাল খারাপ। সেদিন মাসুম বলছিলো, এই রকম এক এইট পাস ছেলে দেশে গিয়ে এমএপাশ মেয়ে বিয়ে করে এনেছে। বউ জানে তার বর গ্রাজুয়েট। বিদেশে খুব ভালো চাকরি করে। ওরা নাকি দিব্যি আছে।
-এটাও কপাল রে মা। গ্রাম সমাজে বিদেশে চাকরি করা বর পাওয়া মহা সম্মানের ব্যাপার। ওরা ছেলের ডিগ্রি দেখতে চায় না। সমর্থ রোজগেরে ছেলে হলেই খুশি।
-নিতাইয়ের উচিত এবার দেশে গিয়ে বিয়ে করে আনা। হিন্দুদের তো আবার ঘর বর, মানে বর্ণ না মিললে বিয়ে হয় না। নিতাই নাকি ব্রাহ্মণ। ভালো মেয়েই পাবে।
-এখানে এসব ব্রাহ্মণত্ব মানে নাকি হিন্দু ছেলেরা?
-বলতে পারি না মা, নিরা বলে, খাওয়া দাওয়ার বেলায় দেখা যায় সবই খায়। ছোঁয়া ছুঁতও তো দেখি না।
-একদিন মশি আর আন্নাকে দাওয়াত দিস। ওর পেট ভরা কথা গিজ গিজ করে। কিছু শুনতে চাই। ও বলেও ভালো করে।
-তোমার যে কথা না মা? ওসব গল্প শুনে কি হবে?

-পৃথিবীর কিছুই তো দেখলাম না, শুনলাম না। জীবন যে কতো রকম হতে পারে, তার কিছু এই প্রথম জানলাম।
-ওহো মা, তোমাকে বলতে ভুলেই গেছি। আন্না ক্যারিং। সেটা বুঝতে পারেনি। রাস্তায় পড়ে গিয়ে ব্যথা পায়। পায়ের এংকেল ফেটে গেছে। ব্যথায় ঠিক মতো হাঁটতে পারছিলো না। মশি ভাই হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর জানা গেলো, সে ক্যারিং।
-মশি তো মুসলমান। বিয়ে করে নেয়নি কেন মেয়েটাকে?
-ফ্রি সোসাইটি এই রকমই মা। বন্ধন এদের ভালো লাগে না।
-তা আন্না এখন কোথায়?
-এখনও হাসপাতালে। পায়ে প্লাস্টার করা হয়েছে। বাচ্চার কোনো ক্ষতি হয়নি। মাসুমকে ফোন করেছিলো মশি ভাই। খুব খুশি তারা।
-তোরা যা না একদিন দেখতে। এখন গাড়ি আছে। অসুবিধে নেই তো। ওকে বলিস, বিয়েটা করে নিতে। সন্তানের জন্যই বিয়েটা প্রয়োজন। নইলে এই প্রথা থাকতো না।
-তোমার দেখি খুব মায়া মশি ভাইয়ের জন্য? নিরা হাসে।

দিন কেটে যাচ্ছে তর তর করে। ভালোই হচ্ছে। আর ভালো লাগে না এখানে মিলির। বেয়ানের সাথে কথা হয়। হঠাৎ একদিন বললেন, আমার ছেলেটাকে পর করে দেবেন না ভাই।
-তার মানে? মিলি বুঝতেই পারে না কথাটার মানে।
-ঠাট্টা করলাম বেয়ান। মাসুম খুব আদর কাঙাল ছেলে। বড়ো ছেলে তো! পিঠেপিঠি ভাই বোন থাকলে প্রথমটার আদর বেশিদিন থাকে না। এতো দূরে গেছে! এখন ওর কথা প্রায় ভাবি।
-আপনি যদি আসতেন, তাহলেই বেশি ভালো হতো বেয়ান। ছেলের কাছাকাছি থাকতে পারতেন।
-হবে হবে। এবার আপনি গেছেন, পরে আমিও যাবো। যেটা বলছিলাম, আপনার তো একটাই মেয়ে। সব আদর ওই পেয়েছে। নাজিফা বলেন।
-আমরা পাঁচ ভাইবোন ছিলাম বেয়ান। কিন্তু মা বাবা কাউকে বেশি ভালোবেসেছেন মনে হয়নি তো। মা বাবা সবাইকে সমান ভালোবাসেন বলেই মনে হয়।
-না বেয়ান, তা হয় না অনেক পরিবারে। এই যেমন; আমি কিন্তু টের পেতাম। মা আমাদের মেজো বোনকে অন্যদের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।
-কি যে বলেন বেয়ান?
-যাক, মাসুম কেমন আছে? আমি যখনই ফোন করি তখনই ওর আর একটা কল আসে।

-রাতে স্কাইপে আসবেন। কথা হবে, দেখাও হবে।
-মাসুম তো কোনোদিন বলেও না কখন ও ফ্রি থাকে! খুব ব্যস্ত থাকে বুঝি ছেলেটা? মা বলতেন, ছেলেরা বিয়ের পর বদলে যায়। হয়তো কথাটা ঠিক।
-কি হলো আপনার আজকে বেয়ান? মিলি হাসে।
-আমার মনে হয়, মাসুম আমার চেয়ে আপনাকে বেশি ভালোবাসে। বেশি পছন্দ করে।
মিলির শুনতে খারাপ লাগে। কেমন নিচু ঘরের মানুষের মতো কথাগুলো। বেয়ান কি হিংসে করছেন? কিন্তু কেনো? বলে, নিশ্চয় আপনার মন আজ খারাপ ছেলের জন্য।
-ও কি বোঝে যে আমার মন খারাপ হয় ওর জন্য? অভিমানে গাঢ় হয় বেয়ানের গলার সর।
-ঘনো ঘনো স্কাইপে আসবেন, তাহলে ছেলে এবং নাতির দেখা পাবেন। বেয়াই তো ঘনো ঘনো স্কাইপে কথা বলেন।
-ওঁর কথা? আমি থাকলে তার সময় হয় না।
-আপনি নিজেই করবেন। কথাকে দেখতে ইচ্ছে করে না? খুব গুড়ু গাড়ু হয়েছে মাশাআল্লাহ।
-নজর দেবেন না বেয়ান। আমার ভয় করে।
-কি যে সব বলেন না? মাশাআল্লাহ বলেছি। কিছুই হবে না। তাছাড়া কথা আমার নাতি না?

বিরক্তিতে ভরে যায় মন। একটা শিক্ষিত মহিলা এতো বাজে ভাবে কথা বলতে যে পারেন, সেটাই জানা ছিলো না মিলির। এতো কুটিল কেনো হবে মানুষের মন? তো কানাডায় উনি আসলেই পারতেন! তখন তো কতো বাহানা দেখালেন। এখন ছেলেকে পর করে দেয়া, নাতিকে নজর দেয়া, কি সব অদ্ভুত কথা বলেন!

নিরা এলো মায়ের ঘরে বুটের হালুয়া করার তাগাদা দিতে। সে কি? মা মন ভার করে চেয়ারে বসে আছেন কেনো? নিশ্চয় বাবার কথা মনে পড়েছে। বাবাও খুব ভালোবাসে বুটের হালুয়া খেতে।
-কি হলো মা? চলো রান্নাঘরে।
-আসছি রে মা।
-কার সাথে কথা বলছিলে?
-তোর শাশুড়ির সাথে।
-বুঝেছি। নিরা হাসে।
-কি বুঝেছিস? মিলিও হাসে।

-তো দুই বেয়ানে কি গল্প করলে?
-সেটা তোকে বলা যাবে না।
-নিশ্চয় নিজেদের ঘর সংসারের কথা?
-আরে বাবা না। বলছি তো না।
-বলোই না একটু শুনি। দেখবে মন ভালো হয়ে যাবে। হাসে মা মেয়ে দু'জনেই।
-বললাম বুটের হালুয়া করছি আজ। আপনার কথা খুব মনে পড়ছে। এই সব আর কি।
-মা কিন্তু সত্যি বুটের হালুয়া খুব পছন্দ করেন। তুমি করে পাঠালে বেশির ভাগই খেয়ে ফেলেতেন মা একাই।
-নিজে করলেই তো হয়। ঘনঘন খাওয়া যাবে।
-ভালোই বলেছো মা। হালুয়া করতে হলে মায়ের হাতে ব্যথা হয়ে যায়। উনি তো বলেনই রান্না করতে হয় বলে করেন। ভালোবেসে করেন না। আজকাল কাজটা আর তার পছন্দের না।
-কাজের লোককে দিয়ে করাবে।
-আচ্ছা মা, কাজের লোক দিয়ে কি বুটের হালুয়া হয়! তুমি করিয়েছো কখনও?
-করাতে জানলেই হবে।
-তারপর তোমার একটা সিক্রেট আছে না?
মা আর মেয়ে খুব হাসে। নিরা বলে, কেমন করে তুমি এইসব রান্না শিখেছো মা?
-হালুয়া শিখেছি মায়ের কাছে। আর সিক্রেট হলো আমার নিজের রেসিপি।
-আর কি কি সিক্রেট আছে তোমার রান্নার মা?
-দুষ্টুমি করিস না তো। চল যাই। বিকেল হয়ে এলো।
-কথা উঠে গেলে তো তুমি দখল হয়ে যাও।
-সেই তো ভাবি, আমি চলে গেলে ওকে সামলাবি কেমন করে?
-আমি তো ভাবতেই পারি না মা।
-তুই বিদেশে আছিস, এই কথা বলতেই পারিস। দেশেও আজকাল ছোটো সংসার। নানি দাদি এসে নাতি নাতনির দেখভাল করতে পারে না। নিজের সংসার সবার কাছেই প্রিয়।
-সত্যি মা, কেন যে একান্নবর্তী সংসার ভেঙে গেলো?
-ঐ তো অনেক লোক, অনেক মতো, অনেক পথ, কারো সাথে কারো মেলে না। মন কষাকষি এমন কি দুকথা হয়েও যায়। সেটা মানিয়ে নিতে পারে না। ভাবে একা সংসার করলে এসব থাকবে না। এর যে আবার উল্টো দিক আছে

সেটা তো ভাবেনি। এখন ভেবেও লাভ নেই। যেদিন যায় সেদিন যায়। আর ফেরে না।
-আমাদের কেনো একান্নবর্তী সংসার ছিলো না মা?
-ডাক্তারি পাশ করেই তোর বাবা চলে গেলো ম্যানচেস্টারে। আমি থাকলাম তোর দাদুর বাড়ি।
-খুব কষ্ট হয়েছে না মা তোমার?
-তা তো হয়েছেই। কিন্তু লোকজন ছিলো অনেক। ছিলো হাঁস মুরগির খামার। একটা গরুও ছিলো। সকাল হলে গোয়ালা আসতো দুধ দোয়াতে। সেই দুধ দিয়ে শাশুড়ি সুজির পায়েস রাঁধতেন কড়াই ভরে। রুটি বানানো হতো অনেক। কাজের লোকজন তো খেতোই, গোয়ালাকেও দিতেন তোর দাদি।
-ও খেতো?
-কেনো খাবে না?
-মানে হিন্দুরা তো---
-ফেলু ঘোষের ও সব কিছু ছিলো না।
-তখন ফোন ছিলো তোমাদের?
-না না, চিঠি পেলেই বর্তে যেতাম। হাসে মা আর মেয়ে। নিরা বলে, বাবা তোমাকে খুব ভালোবাসতো, তাই না?
-দ্যাখো মেয়ের কথা শোনো।
-বলোনা মা।
-ডিগ্রি করে ফিরে এসে তোর বাবা নিজের শহরে থাকতে চায়নি।
-কেনো? বাবা না খুব দেশ দেশ করেন?
-সে তো এখনও করে। কিন্তু ওখানকার ডিগ্রি শেষ করে আসার পর ঢাকাতেই চাকরি হলো। তারপর ঢাকাতেই থিতু হতে চাইলো সে। বাবা, মানে তোমার দাদুও চাইলেন ছেলে ঢাকায় প্র্যাক্টিস করুক।
-তার মানে আমাকে তুমি একাই মানুষ করেছো?
-না না, তোর দাদি এসে থাকতেন প্রায়। আর দুটো কাজের মেয়ে ছিলো। আমার তেমন কষ্ট হয়নি।
-আমার আর ভাই বোন নাওনি কেনো মা?
-কি সব যে বলিস নিরা? মিলি লজ্জা পায়।
-বলোনা, তুমি চাওনি, না বাবা চাননি?
-বাদ দেতো ওসব কথা। চল রান্নাঘরে যাই। বুড়ো খুকি একটা। মনে মনে ভাবে, আজকালকার ছেলেমেয়ে বেহায়াও বটে!
-আমার যদি একটা বড়ো ভাই থাকতো, তাহলে কি মজাটাই না হতো আমার।

ধক করে একটা ঘা লাগে মিলির বুকের ভেতর রাখা সিক্রেটে। বলে, এখন হঠাৎ ভাই বোনের সখ হলো কেনো তোর বলতো?
-ছোটো বেলায় বুঝিনি মা। এখন বুঝি, বাচ্চার জন্য সঙ্গী দরকার।
-তোরা বুঝি এসব কথা ভাবিস? মাসুম কিছু বলে?
-আমরা দুজনেই চাই, আর একটা বাচ্চা নেবো।
-এবার তোর শাশুড়িকে আনিস বাপু।
-সে দেখা যাবে। তুমি আমার কথার উত্তর কিন্তু দাওনি। বলো কে চাও নি বাবু নিতে?
-ধরে নে আমি কাকবন্ধ্যা।
-সেটা আবার কি গো মা?
-যে মেয়েদের জীবনে একটাই বাচ্চা হয়, তাদের কাকবন্ধ্যা বলে।

এক মুহূর্তে মিলি বিশ বছর পেছনে চলে যায়। ইমতিয়াজ তখন জীবন সংগ্রামে ডুবে থাকে। নিরা একটা মাত্র মেয়ে। তার কাজ সেরেও মিলির একা একা লাগে বাসায়। ভাবে আর একটা বাচ্চা হলে ভালো হতো। কিন্তু হয়নি। প্রত্যেক সংসারেই কিছু না কিছু সিক্রেট থাকে। সেটা সিক্রেটই থেকে যায়। তার প্রথম সন্তান যদি পৃথিবীর আলো দেখতে পেতো, তাহলে তার বয়স হতো পঁচিশ বছর।

ইমতিয়াজ তখন দৌড়াদৌড়ি করছে বাইরে যাওয়ার কাগজপত্র ঠিক ঠাক করার জন্য। মিলি বললো একদিন, তুমি চলে গেলে আমার কি হবে রাজা? এটাও সিক্রেট নাম ইমতিয়াজের। মিলিরও একটা সিক্রেট নাম আছে, রানি। একান্ত সময়ে দুজন দুজনকে ডাকে।
-তুমি চাও না তোমার স্বামী অনেক বড়ো ডাক্তার হোক?
-কিন্তু আমি যে ---
- কি? বলে ফেলো।
-তোমাকে ছাড়া প্রথম সন্তান---
চমকে ওঠে ইমতিয়াজ। একদিন দুদিন নয়, চার চারটা বছর সে থাকবে বাইরে। নিজের টাকায় পড়তে যাওয়া। মিলিকে সঙ্গে নিতেও পারবে না বিদেশে। দুজনে মিলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। নতুন ডাক্তার প্রথম ডাক্তারি করেছিলো নিজের প্রিয় মানুষটার ওপর। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান খুব সহজেই মুক্ত করে দিয়েছিলো মিলিকে। এই সিক্রেট কেউ জানে না। আজো না। এমন কি স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও কখনও এই কথা আলোচনা হয় না। বিগ ব্যাঙের মতো বিশাল কালো দহে কেউ হাত দেয় না।

দেশে ফেরার দু'বছর পরে নিরার জন্ম হয়। আর বাবা হতে চায়নি ইমতিয়াজ। একটা সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মিলি তো মরেই যাচ্ছিলো প্রায়। সেই ঝুঁকি আর নেয়া যায় না। তাছাড়া ইমতিয়াজ সন্তানের মায়ের চেয়ে নিজের নারীকে বউ হিসেবেই বেশি পেতে চেয়েছে সব সময়। থাকে কিছু কিছু মানুষ এমন।

অনেকেই জানতে চায় মিলির কাছে, ইমতিয়াজের লেট ম্যারেজ নাকি? সিক্রেট ভেঙে জবাব দেয়া যায় না। সে বলে, ভাই, সবই ওপরওয়ালার ইচ্ছে। কথাটা বলতে বুকের পাঁজর ভেঙে যেতো। একই জবাব ছিলো মিলির। মহাবিশ্বের বিগ ব্যাঙ এখনও রহস্যের আকর। মানুষের ছোট্ট বুকের ভেতর কি অনায়াসে সেই অতলান্ত রহস্যের বিগ ব্যাঙ বাস করে। বুকের খাঁচা ভেঙে মানুষ নিজেই নিজের সেই গোপন আঁধার দহ দেখতে চায় না। গবেষণা করা তো বহু দুরের কথা।

চার

-কি হলো মা, হালুয়া লেগে গেলো মনে হয়। নিরা মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়।
-খুব গিন্নি হয়েছিস দেখি। মা হেসে বলে, সব ঠিক আছে।
-তাই তো বলি, আমার মায়ের হালুয়া লেগে যেতে পারে?
-তুই বড়ো প্লেটে বাটার অয়েল মাখিয়ে রাখ তো বাবা।
-ঠিক আছে, আমি সব গুছিয়ে রাখছি। বাটার অয়েলে ভাজা এলমন্ড ফ্লেক্স টেবিলেই আছে। উমহ--, কি খোশবু বের হয়েছে!

কথা নেই বার্তা নেই মশিউর আর নিমাইকে নিয়ে হাজির হলো মাসুম। নিরা বেশ বিরক্ত হয়। মিলি বলে, থাক না নিরা। রান্না তো সব আছেই। শুধু ভাতই একটু বেশি রাঁধতে হবে। সেও তো রাঁধবে রাইস কুকার। আর চাস তো শুকনো মরিচ আর পেয়াজ ভেজে সর্ষের তেল দিয়ে আলু ভর্তা করে দিই। শুনেই নিরার লালা ঝরার মতো অবস্থা। সামান্য জিনিস কিন্তু করা হয় না। মিলি আসার পর থেকে দু'চারদিন পর পর আলু ভর্তা হচ্ছে। কি মজা করে যে মাসুম খায়! ওরও ভারি পছন্দের আইটেম আলু ভর্তা।

মশিউরকে খুব খুশি মনে হলো। বাবা হবে, এই আনন্দে সে ফুরফুরে হয়ে আছে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে মাসুমের সাথে দেখা হয় দুজনের। বাড়িতে কি রান্না হচ্ছে, সে খবর তো জানেই মাসুম। তাছাড়া শাশুড়ি আছেন। নিরার ওপর ঝামেলা পড়বে না। বুটের হালুয়া হয়েছে। হয়তো কোনোদিন খায়ইনি।

তাই নিয়ে এলো দু'জনকেই। ছেলেটা হয়েছে বাবার মতো বন্ধুপ্রিয়। বেয়ানের এই সব আদিখ্যেতা নেই। তবু জীবন কেটেই গেল তো বলতে গেলে। বেয়াই অবশ্য সে কথা মানেন না। বলেই বসেন, চুল তো এখনো সবগুলো পাকেনি বেয়ান।

যা ভেবেছিল মাসুম। ঠিক তাই। আলুভর্তা পেয়ে কেউ আর কোনো তরকারি নেবে না। মশিউর বললো, আট দশটা শুকনো মরিচ ভেজে দেন খালাম্মা। নিতাই বললো, আমাকেও আট দশটা দেবেন খালাম্মা।
মিলির তো মাথা খারাপ। দুই চোখে তার বিস্ময় ফুটে ওঠে। বলে কি ওরা?

-খালাম্মা, শুধু মরিচ দিয়ে ভাত খেয়েছি কতদিন, তার হিসেব নেই, মশিউর বলে। মাথা নেড়ে সমর্থন দেয় নিতাই। মরিচের মতো স্বাদ আর কিছুতে নেই খালাম্মা।

যেমন অর্ডার তেমন কাজ। প্রায় বিশটা শুকনো মরিচ অল্প তেলে ভাজা হলো ফ্রাই প্যানে। হাই স্পিডে ছেড়ে দেয়া হলো একজস্টার। তারপরেও সে কি ঝাঁঝ! কথার ঘর টাইট বন্ধ করা হয়েছে আগেই। মরিচের অর্ডারের কথা শুনেই মিলি বেশি করে আলুভর্তা করেছিলো।

অন্য সময় হলে, মুরগির তরকারি শেষ হয়ে যেতো। আজ সেদিকে কেউ তাকাচ্ছেও না। হুশ হাশ করে মরিচ ডলে ডলে কখনো মরিচে কামড় দিয়ে আলুভর্তা মাখানো ভাত খাচ্ছে সবাই। মিলি জোর করে একটু মুরগির তরকারি দিলো সবাইকে। সে কি আফসোস মশি আর নিতাইয়ের। সব স্বাদ চলে গেলো। ঘন মসুরের ডাল আর আলুভর্তার কাছে কিছুরই তুলনা হয় না খালাম্মা। মশি আর নিতাই দুজনেই বললো বার বার।

নিরা আর মিলি বেশি ঝাল খেতে পারে না। মাসুম একটা মরিচ নিয়েই পেরেশান। পাঁচফোড়ন দেয়া নিরামিষ তরকারিটা কেউ পাতেই নিলো না মিলি আর নিরা ছাড়া।

বুটের হালুয়া দেখেই তো ওদের ভিরমি যাওয়ার অবস্থা। বলে, খালাম্মা আমরা না এলে এই সব খেতাম কীভাবে? এক চামচ খেয়ে মশিউর বলে, আহ! জীবন সার্থক হয়ে গেলো। কি স্বাদ খালাম্মা! মশিউরের অত ফর্মালিটি নেই। বললো, আমাকে একটুখানি দেবেন খালাম্মা, আম্মার জন্য?
ওর বলার ভঙ্গি দেখে সবাই হেসে ফেলে।
-আমি কি বেশি বেহায়াপনা করে ফেললাম? এদিক ওদিক তাকায় মশি।
-ছি ছি মশি, তোমরা হলে বাড়ির মানুষের মতো। আমি চলে গেলে তোমরাই তো এদের আপনজনের মতো কাছে কাছে থাকবে। ব্যস সব ঠিক হয়ে গেল।

-আপনি থেকে যান খালাম্মা। মশি বলে।
-তাহলে আমরাও খুশি হই, মাসুম বলে।
-সে কি আর হয় বাবারা? যাক, এবার আন্নার কথা বলো। ও কেমন আছে?
-ভালো খালাম্মা। তবে সারাদিন খেতে চায়। খুব নাকি খিদে লাগে ওর।
আবার সবাই হাসলো। মিলি বলে, হাসির কিছু নেই বাবা। ওর এখন দুজনের খাবার দরকার হবে।
-কিন্তু আমি তো বাইরে থাকি কাজে। ঐ ফলমূল কিনে রাখি। সারাদিন খায় টুকটাক করে। আজই আল্ট্রাসনো হয়েছে, আমাদের মেয়ে হবে। আমি খুব খুশি খালাম্মা। আন্নাও মেয়ে চেয়েছিলো। খুশি সে ও।

মিলির চোখে পানি চলে আসে। বলে, খুব খুশি হলাম আমিও। মেয়ে হলো মায়ের জাত। তোমার মা আসছে তোমার কাছে মশি।
-সবই তো ভালো ছিলো খালাম্মা। কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে যায়, মানুষ একটু আগেও তা আঁচ করতে পারে না। আন্না আজ সারাদিন মন খারাপ করে বসে আছে।
-কেনো মশি ভাই? মাসুম জানতে চায়। আন্না ভাবির তো এখন খুশি থাকার কথা, তাই না?
-তাই তো কথা ছিলো। কিন্তু খুশির পাশাপাশি দুঃখ এমন করে লুকিয়ে থাকে কেউ কি জানতে পারে ভাই?
-কি হিয়েছে মশি ভাই বলেন তো, নিরা বলে।
-তোমরা জানতে না, ওর এক ভাই সিরিয়াতে চাকরি করতো। তার কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।
-সে কি? মাসুম বলে, ওখানে তো ভয়ানক অবস্থা এখন।
-চিন্তা তো সেখানেই। ও যে হাসপাতালে নার্স ছিলো সেই হাসপাতালের ওপর বম্বিং হয়েছে। কেউ নাকি বেঁচে নেই।

সমস্ত পরিবেশটা খুব ভারি হয়ে উঠলো। হাসি-তামাশা খাওয়া দাওয়ার হালকা আমেজের ওপর কালো চাদর বিছিয়ে দিলো যেন কেউ। কি যে হচ্ছে সারা দুনিয়া জুড়ে? মিলি লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে

পরদিনের খবরে আরো মন খারাপ হলো সবার। তিন কি চার বছরের একটা সিরিয় শিশু কাঁদালো সারা পৃথিবীর বিবেকবান মানুষকে। অভিবাসী হয়ে বেঁচে থাকার জন্য মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথে সিরিয়া থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলো। ছোটো একটা রাবারের নৌকোতে পাড়ি দিচ্ছিলো উত্তাল সাগর। গন্তব্য কোথায় তা সে জানতো না। মা-বাবা সাথে আছে এইটুকুই ভরসা।

ভয়ে বড়োদের প্রাণ শুকিয়ে আছে। মা বলেছে, সাঁতার জানে না। ভীষন ভয় করছে তার। পানি তার চিরশত্রু। দেশে আগুন জলছে। গুলি বোমা আর আগুনে প্রতিদিন মরছে নিরীহ মানুষ। শিশু বৃদ্ধ যুবা, রেহাই নেই কারো। বাবা বলেছে, বাঁচার জন্য ঝুঁকি নিতেই হবে। বহু মানুষ পালাচ্ছে দেশ ছেড়ে। তারাও পালাবে। সহায় সম্পদ কিছু না, শুধু প্রাণগুলো নিয়ে তারা উঠে বসে ছোটো একটা রাবারের নৌকোয়। কূলহারা-দিকহারা সাগরে ভেসে কোথায় যাচ্ছে তারা, কিছুই জানে না।

না, গন্তব্যে যেতে পারেনি কেউ। রাতের আঁধারে সাগর হয়ে উঠেছিল উত্তাল। ঢেউয়ের মাথায় দুলতে দুলতে রাবারের নৌকো যখন আছাড়ি পিছাড়ি করছিলো, তখন সেই গোলেমালে আজরাইল তার দায়িত্ব সারলো। কেউ বুঝতেই পারেনি। হঠাৎ সব তলিয়ে গেলো কোথায় যেন। নির্লজ্জ সূর্যটা সকালে হাসতে হাসতে উঠে এলো আকাশে। যেন কোথাও কিছুই হয়নি।

অনেক মৃতদেহের মধ্যে পাওয়া গেলো ফুটফুটে শিশু আয়লানের ভেজা নিথর দেহ। গায়ে শীতের কোট, পায়ে শীতের জুতো মোজা। উপুড় হয়ে দুই হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে সাগরের পানিতে মাথা ঠেকিয়ে। নাকে মুখে কানে বালি। পা দু'টো শুকনো বালির ওপর। যেন কোনো দেবশিশু আকাশ থেকে এসে পড়েছে ঐখানে। যেন সে বলতে চায়, আমার অভিবাসনের জায়গা আমি নিজেই করে নিয়েছি।

সমস্ত তথ্য মাধ্যমে শিশু আয়লানের ছবি ছাপা হলো। বেঁচে থাকার জায়গা এই পৃথিবীতে যে পেল না, তথ্যপ্রযুক্তির পুরো আকাশ তাকে এখন জায়গা দিয়েছে। বুক ভেঙে যাচ্ছে মানুষের। এক দিনের মধ্যে পৃথিবীর বিবেকে এমন ঘা লাগলো যে, অভিবাসীদের জন্য দুয়ার খুলে দিলো অনেক দেশ। লাখ লাখ অভিবাসী হুড়মুড় করে এসে পড়লো অনেক দেশে। ভূগোল, ইতিহাস, দেশ, সীমানা মনে রইলো না কারো। এমন মর্মান্তিক ঘটনা আর কখনও পৃথিবীতে ঘটেছে কি না কেউ মনে করতে পারে না।

দেশ থেকে ইমতিয়াজ ফোন করলো। মিলি তো ফোন ধরেই কান্না।
-তুমি কাঁদছো কেন?
-তুমি কাঁদোনি?
-মনে মনে।
-এত ফুটফুটে বাচ্চাটা না জানি কোন মায়ের বুকের ধন? ফুঁপিয়ে ওঠে মিলি আবার।

-মা বেচারা ভাগ্যবান, দুঃখ পেতে হয়নি। নাহলে এটা সইতো কেমন করে বলো?
-আমি দুরাত ঘুমাতে পারিনি। শুধু আয়লানের ফুটফুটে সুন্দর মুখটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে।
-ঐটুকু শিশুর কতো শক্তি দেখো, লাখ লাখ মানুষের বিবেকের সুবৃত্তিকে জাগিয়ে দিয়েছে। জার্মানিতেই দেখো এঞ্জেলা মার্কেল দু-হাত বাড়িয়ে আহ্বান করছে অভিবাসীদেরকে মায়ের মতো।

আয়লানের মর্মান্তিক মৃত্যু বিশ্ববিবেক জাগাতে কাজ করেছে ম্যাজিকের মতো। বিশ্ববিবেক ঋনী হয়ে থাকবে আয়লানের কাছে। তার টুলটুলে মুখটার কাছে। গাড়ুগুড়ু হাত পায়ের গড়নের কাছে। কোন প্রাণে বালি মাটি উঠতে পারলো ওর সারা গায়ে? মা বাবার সহস্র চুম্বনে যে তুলতুলে গা পুষ্ট হয়েছে, একটু ধুলো পড়লে মা নিশ্চয় আঁচল দিয়ে সেই গা মুছিয়ে দিয়েছে, সেই সোনার পুতুলের আজ কি অবস্থা! খোলা আকাশের নিচে ঠাণ্ডা সাগরের পানিতে ভিজে পড়ে আছে তার লাশ! চারপাশে নেই কোনো প্রিয়জন। কাছে বসে কেউ কাঁদছে না। আহাজারি করছে না কোনো আপন জন। কেউ জানে না কে করবে তার সৎকার? হায়রে অভিবাসী আয়লান! চিরদিনের মতো অভিবাসী হয়ে গেলো সে আসমানের অগনিত তারার দেশে। কেউ তাকে আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না ওখান থেকে।

-কি হলো? কথা বলছো না কেনো রানি?
-কিছু শুনতে পাচ্ছি না রাজা। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। জীবন এমন কেন? এতো নিষ্ঠুর কেন? জানি, কারো কাছেই এর কোন উত্তর নেই।
-শোনো রানি, ভালো খবর দিই একটা। আমার এক লেখক বন্ধু, সায়হামের কথা মনে আছে? সে এবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে?
-মনে আছে। সায়হাম সাহেবের লেখা আমার একটুও ভালো লাগেনি কোনো দিন।
-তুমি এত বেরসিক কেনো বলতো? হাসে ইমতিয়াজ।
-দেশে কি লেখকের আকাল পড়ে গেছে? তা কোন বইয়ের জন্য?
-আজকাল সেটা বলা হয় না। বলা হয় সাহিত্যে তার অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেয়া হলো।
-তা ভালোই হয়েছে। কোন মহিলা পুরস্কার পায়নি?
-এই তো আমার ফেমিনিস্ট বউ। হা হা হা, এবার আসল কথাটা বেরিয়ে পড়লো। জানতাম এই প্রশ্নটা করবে তুমি।

-বারে, মেয়েরা আজকাল বেশ ভালো লেখছে। সেটা কারো চোখে পড়বে না? তা কেমন কথা?
-চোখে হয়তো পড়ে, কিন্তু তাদের বই পড়ে না যে কেউ। পড়লেও স্বীকৃতি দিতে চায় না।
-তুমিও সেই দলে, আমি জানি।
-আহা, আমি তো সময়ই পাই না বই পড়ার। তাছাড়া এখনো তো আসল কথাটা শোনোই নি।
-তো এত রসিয়ে রসিয়ে বলছো কেন? বলেই ফেলো।
-মোট বাইশ জন পেয়েছে পুরস্কার। তা নিয়ে বেয়াই সাহেবেরও রসিকতার অন্ত নেই।
-কেন?
-উনি বলেন, এই সব পুরস্কারের বেশিরভাগই নাকি ম্যানেজ করা। হা হা করে আবার হাসে ইমতিয়াজ। বলেন, এগুলো নাকি ওপেন সিক্রেট এখন। সবাই জানে।
-জনমে শুনিনি বাবা এমন কথা। অবাক হয় মিলি।
-বেয়াই সাহেব এসেছিলেন বেড়াতে। অনেক গল্প হলো। বললেন, জানুয়ারি মাস এলে শুরু হয় পুরস্কারের ধুম। কিছু কিছু লেখক চাতকের মতো তাকিয়ে থাকে এই মাসের দিকে। যদি একফোঁটা পানি পড়ে মুখে। তার ওপর জাতীয় পুরস্কার বলে কথা!
-তুমি খুব বাজে কথা বলতে শিখেছো আজকাল। মনে করো ডাক্তারেরাই শিক্ষিত শুধু। অন্যেরা কিছুই জানে না।
-অবিচার করো না রানি। এমন কথা আমি কক্ষনো ভাবি না।
-বেয়াই যা বলেছেন আমি তাই বলছি তোমাকে। উনি আরো বলেছেন, শুধু জানুয়ারি মাস নয়, ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ মাস পর্যন্ত চলে পুরস্কারের মৌসুম। এবার একটু দেরি হয়ে গেছে।
-সত্যি বলছো?
-অনেস্ট।
-আগে তো কখনও এসব গল্প করোনি?
-জানতামই না। এবার জ্ঞান দিলেন বেয়াই সাহেব।
-যাক বাদ দাও।
-আরো আছে। কোনো কোনো বিশেষ ব্যক্তির নামে একাধিক সংগঠন আছে, তারাও পুরস্কার বাণিজ্য চালাচ্ছে।
-পুরস্কারের আবার বাণিজ্য? মানেটা কি? মিলি বিরক্ত হয়।
-ওখানে টাকা দিলেই পুরস্কার পাওয়া যায়।

-আমাদের বেয়াই সাহেবেরও পুরস্কার পাওয়া উচিত। কত বই অনুবাদ করেছেন। বিশেষ করে বিশ্বসাহিত্যের বইগুলোর কথা আমাদের মতো অপাঠকও জানে।
-ওর পুকুরে তো ইলিশ মাছ হয় না, শীতকালে গাছে আম পাকে না, ঘরে প্রাণহরা মিষ্টি বানানো হয় না!
-কি বলছ এসব? নিশ্চয়ই বেয়াই বলেছেন?
-না হলে আমি পাবো কোথায়?
-কিন্তু কথাগুলোর মানে কি?
-ওসব উৎকোচের ব্র্যান্ড নাম। জনে জনে সরবরাহ করতে হয়।
-বেয়াই সাহেব নামিদামি মানুষ। সেটা অনেকেই জানেন।
-পুরস্কার দাতারা জানে না। উৎকোচ না পেলে পুরস্কার দাতাদের চোখ কান কিছু খোলে না। বেয়াই সাহেবকে একটু আপসেট মনে হলো এই প্রথম।
-থাক আর শুনতে চাই না। কোনো কথাতেই মন ভালো হচ্ছে না আজ। মনে হচ্ছে লেখাপড়া যা শিখেছি তা সব ভুল ছিলো।

ফোন এলো মাসুমদের বাড়ি থেকে। খায়ের সাহেব লেখাপড়া নিয়ে থাকেন। কিন্তু দেবশিশু আয়লান তার মনোযোগ ভেঙে দিয়েছে। পুরস্কার টুরস্কারের তামাশা চাপা পড়ে গেছে। মানুষ কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? শান্তি ভালো লাগে না কারো? বাপ-দাদার ভিটেতেও মানুষ থাকতে পারবে না নিরাপদে? এ কি বিপর্যয়? এই পরিমান শরনার্থীর ছোটাছুটির কথা তিনি শোনেনও নি কোনোদিন। সারা পৃথিবীতে এতো মানুষ একসাথে শরণার্থী হয়নি কখনও আগে। ছেলের সাথে এই সব নিয়ে কথা বললেন।

প্রফেসর কথা বললেন মাসুম, নিরা আর মিলির সাথে। বেয়ানও কথা বললেন। তিনি আয়লানের কথা জানেন। কিন্তু ওর ছবি দেখেন নি জানালেন। মানে পৃথিবীর তথ্য প্রবাহের সাথে তার কোনো সখ্যতা নেই মনে হয়। মিলি অবাক হলেও কিছু বলে না। যাক। যে যেভাবে ভালো থাকে।
হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন বেয়ান, কবে আসবেন বেয়ান?
-এই তো সময় হয়ে এলো।
-মাঈমা তো চলে গেছেন কাল, জানেন কি?
মাঈমা মানে মিলির শাশুড়ি মা। বলে, না তো! আজই তো কথা হলো আপনার বেয়াইয়ের সাথে। কিছু তো বললো না? কোনো সমস্যা?
-দেশের বাড়িতে কি যেন সমস্যা হয়েছে। তবে তেমন সিরিয়াস না।

পেছন থেকে খায়ের সাহেব বলেন, কথাটা না বললে কি হত? মিলি স্পষ্ট শুনতে পায়।

-আমি তো আর প্রফেসর নই, তোমাদের মতো মেপে মেপে কথা বলতে জানি না। ফোন হাতে নিয়েই বেয়ান কথা বলছেন।

মিলি জানে, তার বেয়ান এই রকমই। ঠিক জায়গায় ঠিক কথা বলবেন না। বেঠিক জায়গায় বেমক্কা কথা বলবেন। দূর থেকে ফোনে কথা বলার খরচ আছে। স্কাইপে হলেও হতো। ফোনটা রেখে দেয় মিলি।

চিন্তায় পড়ে যায় মিলি। দেশের খালার কথা তো জানাই ছিলো। তার যে নাতনিকে লেখাপড়া করে বিক্রি করে দিয়েছিল বিদেশি পরিবারের কাছে, তার দেশে আসার কথা ছিলো দাদির খোঁজে। সাথে ওর বিদেশি স্বামী আর একটা মেয়েও আসবে।
তারাই কি এলো? আর আসেই যদি, তাহলে বাবার বাসায় থাকবে ক'দিন। দাদিকে দেখে আবার চলে যাবে। সেজন্য মাকে দেশে যেতে হবে কেন? আর তো ক'টা দিন। মিলি তো ঢাকায় ফিরবে দশ বারোদিন পরই।

রাতে খাবার টেবিলে একটু আনমনা দেখালো মিলিকে। মাসুম বুঝতে না পারলেও নিরা ঠিকই বুঝলো। পরে মায়ের কাছে জানতে চাইলো, শরীর খারাপ নাকি? নাকি বাবার সাথে কথা বলার পর দেশে যেতে মন চাইছে?
-বাড়ির জন্য চিন্তা হচ্ছে রে।
-কেনো মা? দাদি তো আছেই। বাবার যত্ন-আত্তি হচ্ছে ঠিকই।
-মা নাকি কাল দেশের বাড়ি চলে গেছেন।
-বাবা বলেছেন?
-তাহলে তো চিন্তা ছিলো না।
-মানে?
-তোর বাবা বেমালুম চেপে গেছে কথাটা।
-কে বললো তাহলে?
-বেয়ান সাহেব।
-তোমার বুকিং তো ঠিক আছে। আর দশ দিন পরেই যাবে ঢাকায়।
-সেটাই তো বুঝতে পারছি না। গেরোটা লাগলো কোথায়?

একটা গ্রহের এপিঠ আর ওপিঠে একই সঙ্গে কতো কিছু যে ঘটে যায়! মিলির শ্বশুর বাড়িতেও ঠিক ছিলো সব। সেই খালার নাতনি খবর দিয়েই এসেছে। তার স্বামী আর একমাত্র মেয়ে নাবিলাকে নিয়ে নিরার দাদার বাড়িতে উঠেছে তারা। মুশকিল হলো, কেউ কারো সাথে কথা বলতে পারছে না। সবটাই সামলাতে হচ্ছে নিরার দাদুকে। সেইজন্য ইমতিয়াজই পাঠিয়ে দিয়েছে শাশুড়িকে দেশে।

কিন্তু কথাটা এতো গুরুত্বের নয় বলে মিলিকে বলে নি সে। বেচারা তো আসছেই ক'দিন পর। আর মা এমন ভাবে রান্না বান্না করে সব থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন যে, একটা বাচ্চাও ক'দিন খেয়ে দেয়ে দিব্যি বেঁচে থাকতে পারবে। এই কথাটা গল্পে গল্পে বলেছিলো বেয়াই কে। ঐ যেদিন পুরস্কারের কথা নিয়ে অনেক হাসি তামাশা হলো, সেদিনই বলেছিলো। তিনি আবার সে কথা বলেছেন বেয়ানকে। বেয়ান বলেছেন মিলিকে। কি জিলেপির প্যাঁচ লেগে গেল!

শুধু এইটুকু হলে কথা ছিলো। শাশুড়িকে পাঠিয়ে দিয়েও হলো না। ইমতিয়াজকেও যেতে হলো। কারণ খালার নাতনি, মানে নাবিলার হলো হাই ফিভার আর সর্দি কাশি। বাইরে মানুষ হয়েছে। এখানে ধুলোবালিতে জীবানু উড়ে বেড়ায়। ধরবেই তো ওকে। এই কথাটাও মিলিকে বলা হয়নি। অযথা টেনশন দিয়ে লাভ নেই।

কিন্তু বাংলাদেশের বিবিসি, মানে মিলির বেয়ান ফোন করে জানিয়ে দিলন সেই খবরটাও। আর বললেন, আপনি চলে আসেন তাড়াতাড়ি। মনে হচ্ছে, দেশে সিরিয়াস একটা কিছু হয়েছে। মিলি বেচারা করেটা কি? এ কি আর ঢাকা কুমিল্লা? বাস ধরে চলে গেলেই হলো। তাকে থাকতেই হবে আরো কয়েকটা দিন।

অবশেষে ফোন করে মিলি। ইমতিয়াজ আবার ঢাকায় এসে গেছে। নাবিলাকে সাথে করে নিয়ে এসে ভর্তি করে দিয়েছে নিজেদের ক্লিনিকে। ফোন ধরলো ইমতিয়াজ। বললো, জানতাম তুমি খবর পেয়ে যাবে আমাদের বিবিসি বেয়ানের বরাতে।

-সে যাক, কিন্তু ব্যাপার কি বলো তো?

-খালার নাতনি নাবিলার সর্দি এবং হাই ফিভার। দু'দিন ধরে একই অবস্থা। শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিলো। মার সাথে কথা বললাম। তিনি বললেন, জ্বরের তাপে মেয়ে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। কি যে করি?

-বলো কি?

-তখনই আমি গাড়ি নিয়ে চলে যাই এবং সেইদিনই নিয়ে এসে ক্লিনিকে ভর্তি করে দিই।

-এখন কেমন?

-চিকিৎসা চলছে। জ্বর কমেছে তবে বুকের কনজেশন খুব বেশি। নিউমোনিয়া হয়ে গেছে। অক্সিজেন দিতে হচ্ছে। আজ নাবিলার মা বাবা খালা আর মা সবাই ঢাকায় চলে এসেছেন।

-মা আবার এসেছেন?

-বললেন যে, এতগুলো মানুষ খাবে-দাবে, তাদের একটু দেখাশোনা করতে হবে। বিপদ হলো, খালা শুধুই কাঁদছে। বলছে, আমাকে দেখতে এসে নাতনিটির যদি কিছু হয়েই যায়, তাহলে কি হবে?
-কেমন মনে হচ্ছে নাবিলার অবস্থা? মিলি অস্থির হয়ে জানতে চায়।
-একই রকম। খারাপের দিকে যাচ্ছে না, এটাই পজিটিভ বলতে পারো।
-যাক ভরসা পাচ্ছি। আমার চিন্তা তোমাকে নিয়ে।
-আমার আবার কি হলো?
-বেশি ছোটাছুটি পড়ে গেছে। তোমাকে নিজের যত্ন নেয়ার কথা বলা আর না বলা সমান।
-রানি কাছে না থাকলে রাজা ভালো থাকে? সেটাই আমার রোগ এখন। আর থাকা যায় না তোমার সেবা যত্ন ছাড়া। সত্যি কষ্ট হচ্ছে। তোমার কাছে মিছে বললে ধরা পড়ে যাবো।
-আমাকে না কাঁদালে তোমার ভালো লাগে না, তাই না?
-সরি ডিয়ার। সত্যি তোমাকে মিস করছি এখন। দোয়া করো মেয়েটা যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে।

চোখ মুছে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে নিরা আসছে কথাকে কোলে নিয়ে। সে কি তার ফোকলা মুখের হাসি! সাতটা বেহেশত এক করলেও এতো সুখ জমা হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মিলির ভুবনের রঙ পালটে যায়। দুহাত বাড়িয়ে দিতেই ঝাঁপিয়ে চলে আসে নানুর কোলে। এবার আনন্দের কান্না আসে। সুখ দুঃখের কান্না এমনি ভাবেই মিলে মিশে থাকে মানুষের জীবনে। একটু আগেই কান্না এসেছিলো ইমতিয়াজের জন্য। এখন সুখের কান্না এসেছে কথার জন্য। এই পুতুলটাকে ছেড়ে থাকবে কেমন করে মিলি? তবু যেতে হবে তাকে। আসলে এই সব টানাপোড়েনই জীবনকে সচল রেখেছে।

সব তো আর বলা যায় না নিরাকে। ছোটো বাচ্চা নিয়ে ও নিজেই হয়রান। মাসুমকেও তেমন একটা বিস্তারিত বলেনি মিলি। ঢাকায় যে ছোটোখাটো ধুন্ধুমার লেগে গেছে নাবিলাকে নিয়ে, সেটা জেনে ওদের কি হবে? নিরা হয়তো নাবিলার সাথে সম্পর্কটা মিলিয়ে নিতে পারবে। মাসুম দেশের খালার কথা জানেও না ভালো করে। মনটা তো উড়ে চলেই গেছে ঢাকায়। তবু প্রকাশ করতে চায় না কিছু। নিরা ভাবছে, কথাকে রেখে যাওয়ার চিন্তায় মায়ের মন খারাপ। সেটাও একশো ভাগ সত্যি। মানুষের তৈরি ইকুয়েশনগুলোও খুব মজার। যে যার মতো করে নিজের হিসেব মিলিয়ে নেয়।

শাশুড়ির বিদায়ের আগে একটা ভোজের আয়োজন করেছে মাসুম। এসব দেশে বাসায় বড়ো পার্টি করা সম্ভব হয় না। তবু বেশ বড়োই হবে দলটা মনে

হয়। কমপক্ষে বারো জন। এরা বেশ গুছিয়ে করতেও পারে। এডামের বাসাতেও গত সপ্তাহে চৌদ্দজন লোক হলো। বসার ঘর, খাওয়ার টেবিল আর রান্নাঘরের পাশের জায়গায় ঘুরে ঘুরে খেলো সবাই।

প্রতিবেশী এডামের বউ ফ্রুটস কেক আর আন্না তিরামিসু করে আনবে বলেছে। ভালোই হলো। দেশের মিষ্টি বানাতে অনেক সময় আর পরিশ্রম লাগে। তবু মিলি চাইলো, নারকেলের বরফি করতে। এখানে টিনজাত কোরা নারকেল পাওয়া যায়। অর্ধেক শ্রম তো ওখানেই কমে গেলো।

নিরা বললো, মা একজন মানুষ বেড়ে গেছে, তুমি রাগ করো না। আগে বলতে পারিনি কারণ, জানতামই না।

-রাগ করবো কেন রে? বাড়ির কথা মনে নেই তোর? এক সময় এমন দিন কমই গেছে, যেদিন বাসায় অতিথি খায়নি। কাল তো আয়োজন করাই হবে। দলের মধ্যে একজনকে আর বাড়তি মনে হয় না।

-ও একজন আফগানি মেয়ে মা।

-এখানে আফগানিস্তানের মানুষও থাকে?

-হাসালে মা। পৃথিবী এখন কসমোপলিটান নগর। মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। দেশপ্রেম, শেকড়, জন্মভূমির মাটি এসব কথা ভাবার সময় নেই। যেখানে ভাত পাবে, মানে পয়সা কামানোর সুযোগ পাবে, সেখানেই আস্তানা গাড়বে। মানুষেরা সবাই কাক হয়ে গেছে মনে হয়।

মনে মনে বলে, ফার্টিলাইজেশন বিষয়ক গল্প শুনলে মা মাটিতে পড়ে যাবে মাথা ঘুরে। ব্যাংকে রাখা অচিন মানুষের প্রাণ পরমানু অবাধে চলে যায় কোন মায়ের পেটের নোঙরে, সত্যি কি তার আর হিসেব থাকে? নারী একটা সন্তানের জন্য জেনে-শুনে বিষ পান করে। থাক বলে কাজ নেই।

-দুর্ভাগা জাতি, মিলি বলে।

-কার কথা বলছো মা?

-আফগান জাতির কথা বলছি বাবা।

-ওর সাথে আমার আলাপ হয়েছিলো এক পার্টিতে। আগুনের মতো রুপ মা। সবাই ওর সাথে ঘনিষ্ট হতে চেয়েছিলো। কি চোখে যে আমাকে দেখলো, সেদিন থেকেই ও আমাদের বন্ধু হয়ে গেলো। মাসুমকেও খুব পছন্দ করেছে সোরায়া। ওর কাছে যা সব গল্প শুনেছি না, মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়।

-কাল শুনবো। আমার মা, মানে তোর নানু বলতো, মায়েরা হলো মাটি। সর্বংসহা। সব মা-ই কম বেশি তাই।

রাত থেকেই শুরু হলো তুষার পড়া। এই সময়ে স্বাভাবিক না হলেও কেউ মাথা ঘামায় না। নারকেলের বরফি না করে মিলি ছাঁচে দিয়ে সুন্দর করে

সন্দেশ করলো। কানাডায় আসার সময় নিরাকে বেশ কয়েকটা পোড়া মাটির ছাঁচ দিয়েছিলো মিলি। আগে তো আহামরি জিনিস ছিলো এমন ছাঁচ। তারপরে পয়লা বৈশাখে দেদার বিক্রি শুরু হলো। এখন সারাবছর পাওয়া যায় নিউ মার্কেটে।

দেখতে দেখতে তুষারের পরিমান বাড়লো। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, পথের ধারে ধারে তুষার জমে গেছে। খাওয়ার টেবিলে মিলি সন্দেশ বানাচ্ছে। বড়ো প্লেট প্রায় ভরে গেলো। কি সুন্দর যে লাগছে দেখতে!
নিরা এসে বললো, এখনও হয়নি মা তোমার?
-ছাঁচের সন্দেশ তো, একটু সময় লাগে। দুবার গরম করেছি, আর একবার করতে হবে। তাহলেই কাজ শেষ।
-মানে? নারকেল গরম করতে হচ্ছে কেনো?
-একটু কড়া পাকের সন্দেশ যে! ঠাণ্ডা হলে ছাঁচে বসবে না। ঝুর ঝুর করে ভেঙে যায়। তখন গরম করে নিতে হয়।
-কড়া পাকের সন্দেশ না করলে কি হতো? বাড়তি খাটনির ফর্মুলাটা বেশ ভালো জানো তুমি। কোথায় একটু গল্প করবো, তা না। কাজই করে যাচ্ছো।
-সৌখিন রান্নার শর্টকাট নেই রে। কড়া পাকের সন্দেশ অনেক দিন রেখে খেতে পারবি বাবা। সে জন্যই করলাম। এই তো হয়ে গেলো।

রাতে অনেক গল্প হলো সবাই মিলে। তখন অসময়ের তুষার পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। পরদিন রোদ উঠলেই সব গলে যাবে। ঠাণ্ডা কতোটা লাগছে সেটা মিলি আন্দাজ করতে পারলো না। ঘরে হিটার অন করাই আছে। এরা বলে, তুষার পড়ার সময়ে ঠাণ্ডা কমে যায়। তুষার গলে গিয়ে যখন বাতাস বইতে শুরু করে। ঠাণ্ডা লাগে তখন। মাইনাস ডিগ্রির বাতাস তো বাতাস না, বরফের ছুরি। মনে হয় গা কেটে কেটে যায়।

সকালে উঠে জানালার কাছে দাড়াতেই দেখে রাস্তা ঘাট সব শুভ্র সমুদ্র হয়ে গেছে। তার মানে রাতে মনের ইচ্ছে মতো আবার তুষার পড়েছে। সত্যি বিরক্তিকর! নিরার মন খারাপ হওয়ার কারণ আছে। এই ক'দিন তো মোটামুটি হৈ চৈ করে কেটে গেছে। একা একা এই তুষার পড়া দেখতে কতক্ষণ ভালো লাগে? কবে যে বাচ্চাটা বড়ো হবে? আর কবে যে নিরা পড়া শুরু করতে পারবে? ইউনিভার্সিটির কাছে একটা ডে-কেয়ার সেন্টার আছে বলছিলো নিরা। মানে এই বাবুটাকে ওখানে রেখে পড়তে যাবে? সেটা ভাবতেই পারে না মিলি। মাসুম বলে, এখানকার জীবনে এটাই স্বাভাবিক মা।

জীবন এতো তাড়াতাড়ি গড়িয়েছে সেটাই বুঝতে পারেনি মিলি। দেখতে দেখতে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হলো। এর মধ্যে ডায়াবেটিস এসেছে শরীরের সাথি হয়ে। এখনও ঔষধে কাজ হচ্ছে। একদিন ইনসুলীন নিতে হবে। আয়ু যদি দীর্ঘ হয়, তাহলে ডায়ালিসিসও লাগতে পারে। মা বাবার বয়স হয়েছে। তারাই বা আর ক'দিন? একমাত্র মেয়ে নিরা, সে যে একাই অভিবাসী তা নয়, কথাও অভিবাসী হবে। দেশের কথা, মা বাবার কথা মনে পড়লেও কাছে এসে থাকতে পারবে না। খুব ভাগ্য ভালো হলে মেয়ে জামাই নাতি পরিযায়ী পাখির মতো উড়ে এসে দেখে যাবে। তারপর আবার একা জীবন।

জীবনের আর একটা দিকও তো আছে। ইমতিয়াজ যদি সেদিন কাছে না থাকে? কার ডাক আগে আসবে সেটা কেউ জানে না। যদি তার রাজার ডাক আগে এসে যায়? কথাটা মনে হতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মিলি। জানালার সামনে দৃশ্যমান পড়ে থাকা তুষারের কিছুই আর দেখা যায় না। চোখের বাষ্প ঝাপসা করে দিয়েছে সব।

ঘুম ভেঙেছে নিরা আর মাসুমেরও। শাশুড়ি আসার পর থেকে বেবিকট নিরাদের ঘরে আছে। মাস্টার বেডটা বেশ বড়ো। তাই অসুবিধে হচ্ছে না। মিলি অবশ্য বলেছিলো, কথা তার ঘরেই থাকুক। কিন্তু নিরা মাকে কষ্ট দিতে চায়নি। মাঝে মাঝে রাতে বাসা পাহারা দেয় কথা। অকারণে জেগে যাবে এবং আর ঘুমাবে না। তখন নিরাকে খেলতে হবে ওর সাথে।

এখন ঘুম ভেঙে গেলে উঠে বসতে চেষ্টা করে বিছানায়। কখনও একা একা খেলে ওর ভালুক ছানা নিয়ে, কখনও নানা রকম শব্দ করে মায়ের ঘুম ভাঙায়। আসলে পাশের ঘরে কথাকে শোয়ালেও প্রায়ই সে মিলিদের ঘরে ঘুমায়। এখন নিজের নাম বুঝতে শিখেছে। কথা বলে ডাকলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। ভারি মজা পায় মা বাবা।

জানালার পর্দা টানা তাই নিরা দেখেইনি রাতে কত তুষার পড়েছে। মাসুম উঠে জানালার পর্দা টেনে দিয়েই আবার ঢেকে দিলো কাঁচের জানালা।
-কি হলো?
-এখন ওঠা যাবে না।
-মানে?
-মানে ভোর হয়নি।
-কে বলেছে? সাড়ে আটটা বেজে গেছে। নিশ্চয়ই উঠে গেছেন মা।
-ঠাণ্ডার দেশে অবশ্য ঘড়ি দেখেই ভোর হয়। কিন্তু আজ ভোর হয়নি। আমি পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি ভোরকে।

জানালার কাছ থেকে এসেই বিছানায় লেপের মধ্যে গা ডুবিয়ে দিলো মাসুম। তারপর হালুম হুলুম।
-হচ্ছেটা কি ভাই?
-বৃন্দাবনে যাবো এখন।
-এসব কথা শেখালো কে?
-তুমি। আমার প্রিয়তমা গোপিনী।
শৈত্য গলে যায় সূর্যের তাপে, আর গোপিনী গলবে না কানাইয়ের তাপে, তা কি হয়?

মাসুমটা আসলেও পাগল। আর পাগল বলেই এতো ভালো। কিন্তু সবসময় এই পাগলামি ভালো লাগতে হবে এমন তো কথা নেই। একটা বস্ত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। ছুঁড়ে ফেলেছে কোন দিকে সে নিজেও জানে না। আর ও যে এতো স্ল্যাং জানে, সেটা দিনে দিনে আবিষ্কার করেছে নিরা। ওর মতে, কোনো কোনো সময় স্ল্যাং ছাড়া ভদ্র ভাষা মুখে আসতে চায় না। নিরা তখন দ্রবীভূত হয়ে যায় স্ল্যাং শব্দের অসভ্যতায়। খুঁজে পায় না নিজের অস্তিত্ব।

একেবারে গোসল সেরে নিরা বের হয়েছে ঘর থেকে। রান্নাঘরে মা কি সব কাটাকুটি করছেন।
-লেগে গেছ কাজে মা?
-অনেক কাজ রে বাবা আজ।
-তুমি যাওয়ার পরে নো দাওয়াত। আমি এতো রান্না করতে পারবো না।
ঘুরে তাকায় মিলি। বলে, ও মা এতো সকালে গোসল করেছিস যে? পারিসও বাপু।
লাল হয়ে যায় নিরার মুখ। মনে মনে ভাবে, মায়েরা মাঝে মাঝে এতো ইনোসেন্ট কথা বলে না? বলে, কথা ভোররাতে গা ভিজিয়ে দিয়েছিলো মা। তো চেঞ্জ না করে একটা কাজ সেরেই নিলাম।
-ড্রায়ারে চুলটা শুকিয়ে আয়। আমি তোর জন্য কাজ রেখেছি। আর কথা সোনার জন্য আজ সুজির পায়েস করেছি হালকা করে।
-খুব ভালো করেছো মা। আজকাল সুজির পায়েস ও বেশ পছন্দ করে খাচ্ছে।
-তিনি কোথায়?
-বাপ-ছেলে ঘুমাচ্ছে।
-থাক, আজ ছুটির দিন। আমরা বরং কাজ এগিয়ে নিই।
-আমার কাজ বলে দাও।
-কালকের মেরিনেট করা মাংস শিকে গেথে রাখ।

-মা তুমি কি বলোতো? অভেনে গ্রিল করে নিলেই হতো। তা না করে কাল কতক্ষণ ধরে পাতলা করে শিক কাবাবের মাংস কাটলে। দেখে আমারই কষ্ট লেগেছে।
-আমি না থাকলে তো গ্রিলই খাবি। আমার অভ্যেস আছে, তাই কষ্ট হয়নি রে। মাংস কাটার ওপরও শিক কাবাবের স্বাদ নির্ভর করে।
-তাই বুঝি?
-খেলেই বুঝবি।
-জানো মা, সোরেয়া, মানে আমাদের আফগানি বন্ধু কাবাবকে বলে 'কাবোব'।
-ইস্তাম্বুলে শুনলাম ওরা বলে 'কেবাব'। মিলি বলে।
-আমরা তো বলি 'কাবাব'।
-আমার দাদি বলতেন 'কোবাব'। একই খাবারের কতো নাম!
-দাদি কেমন মানুষ ছিলেন মা?
-আমার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। তাছাড়া গ্রামের মানুষ, যতই স্বাচ্ছন্দ থাকুক, তাতে গ্রামীন ভাব থেকে যায়। নিজ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলতেন। তবে ঢাকায় এলে চেষ্টা করতেন একটু ভালো করে কথা বলতে। আমার বুঝতে কিছু সমস্যা হতো প্রথম প্রথম।
-তুমি সত্যি খুব ভালো মানুষ মা।
-শোন, আসল হলো মন। দাদির মনটা খুব ভালো ছিলো।
মিলি তাড়া দেয়, হলো তোর গাঁথা?
-এতো তাড়াতাড়ি?
-মাত্র তো দশটা শিক বাবা। তোকে আরো একটা কাজ করতে হবে যে।
-সে করে দেবো। কিন্তু আমি যে তুমি নই, সে কথাটা মনে রেখো আমার এক্সপার্ট মা।
-হবে হবে। আমার বয়সে আমার চেয়ে বেশিই হবে।
-কোনো আশা নেই। আমরা অত কষ্ট করতে চাই না। গ্রিল করলেই ঝামেলা শেষ।
-শিক কাবাব খেতে চাইলে শিকে তো গাঁথতেই হবে। তারপর অভেনে দে বা আগুনে পোড়াস, সেটা অন্য কথা।
-এইবার হলো মা। এই মশলার ঝোল কি করবো?
-ছোটো একটা বাটিতে রেখে দে। মাঝে মাঝে শিকের মাংসের ওপর দিতে হবে। ব্রাশ আছে তো?
-হ্যাঁ, তা আছে। গ্রিল করতেও লাগে যে। ও হো তোমাকে তো বলাই হয়নি, মাসুম খুব ভালো গ্রিল করতে শিখেছে।

-তাই বুঝি? মিলি হাসে।
-বেলকনিতে দেখোনি দু দুটো গ্রিলের সরঞ্জাম?
-খেয়াল করি নি তো!
-খুলে গুছিয়ে রাখা আছে, তাই বুঝতে পারো নি।
-শুনেই ভালো লাগছে রে। এই সব সখের স্বাধীনতা একার সংসার না হলে হয় না। টোনাটুনির সংসারের এই স্বাধীনতাই তো মেয়েরা চায় এখন।
-তা ঠিক। তবে এর অন্য দিকও আছে মা। কেউ থাকে না কাছে যে একটু সাহায্য করবে। এই যেমন এখন তুমি আছো, কি ভালো লাগছে!
মিলি হাসে। বলে, মা নেই তো কি হলো? বন্ধু বান্ধব আছে। আর আছে পার্টনার। আমি তো দেখলাম, হাসব্যান্ডরা অনেক কাজ করতে পারে। এই শেয়ারিংটা খুব ভালো লাগে আমার।
-কেনো মা? বাবাও খুব ভালো মানুষ।
-অবশ্যই। কিন্তু ভালো মানুষ আর হাতে পাতে শেয়ার করা এক জিনিস না বাবা। ওদের প্রজন্ম ধারণাই করতে পারতো না যে, মেয়েদের কাজে শেয়ার করতে হবে।
-সত্যি?
-আর আমরাও ভাবতে পারতাম না যে, হাসব্যান্ড রান্নার কাজে আমাকে শেয়ার করবে। এমন কি বাচ্চার বিছানা চেঞ্জ করতেও দিইনি আমি।
-কেনো দাওনি? বেশি আহ্লাদ দিয়েছো, হা হা হা।
-নারে আহ্লাদ নয়। তখনকার লাইফ কনসেপ্ট সে রকমই ছিলো। এখনো তেমনই আছি আমরা। মনে মনে যে হাসব্যান্ডের শেয়ারিং চেয়েছি, সেটা বুঝতে পারছি বিদেশের পরিবার দেখে। কেমন আরামের সম্পর্ক। দুজন দুজনের হয়ে থাকে।
-তোমার মনে এতো কথা ছিলো, বুঝিনি তো আগে? মন কি খারাপ করে এখন?
-না না, আমাদের কালে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা ছিলো দিঘির পানির মতো। স্বচ্ছ পানি। অঢেল পানি। আছেই তো অধিকারের মধ্যে। মনে মনে বলে, সেখানে ঝাঁপ দিয়ে অবগাহন করা বা সাঁতার কেটে ঢেউ তুলে মজা করার কি আছে? সবই ত আমাদের।
-মা মা, আমার মা। তুমি এতো সুন্দর করে জীবনকে বিশ্লেষণ করতে পারো? আমার তো এতো বুদ্ধি নেই গো মা মনি?
-দূর পাগল। আমার কথার আবার কোনো দাম আছে বুঝি?
-এ তোমার অভিমান মা। কিন্তু কার ওপর?

-সময় এবং স্থানের ওপর। সেদিন একটা পেপারে পড়লাম, টাইম এবং স্পেসের মধ্যেই মানুষকে বিচার করতে হয়।
-মাই গুডনেস! তুমি এসব পড়ো?
-বিএ-তে আমার ফিলসফি ছিলো। তখন তো পড়েছি পাশ করার জন্য। তোর বাবা বিদেশে গেলে অনেক পড়েছি একা একা। তখনও বুঝিনি টাইম এন্ড স্পেসের বিষয়টা। এখন বুঝি একটু একটু।
-তুমি আর পড়ালেখা করলে না কেন মা?
-তোর বাবা ফিরে এলো। তুই এলি কোলে। তখনো তোর বাবা ঢাকা আর কুমিল্লা করে। শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে সংসার। আত্মীয়-স্বজন ছিলো। তারা আসতো। সে অনেক কাজ। বেড়াতে আসা আত্মীয়-স্বজনরা তো আর কোনো কাজে হাত লাগাবে না। রীতি নয় দেশের।
-তোমার আসলে দেশের বড়ো মান্য গন্য কেউ একটা হওয়া উচিত ছিলো। তাতে লাভ হত দেশেরই।
-কি সব বলিস না? তোরা ভালো থাক, এটা দেখেই যেন যেতে পারি। নতুন করে কোনো স্বপ্ন দেখতে চাই না।
-কেন মা? কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কাজ করতে পারো না?
-প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে-তে আমাদের সাবজেক্টই নেই।
-কেনো?
-এখন বিবিএ আর আইটির যুগ। ফিলসফি কে পড়বে পাগল?
নিরার হাত থেকে ঠাস করে পড়ে গেল একটা কাপ। ফিলসফি উড়ে পালিয়ে গেলো মিলির। সেই প্রাচীন কুসংস্কারে বুক কেঁপে ওঠে মিলির।
-কি হলো নিরা?
-তিনটে কাপ একবারে নামাতে গিয়ে পড়ে গেল একটা। ভাঙেনি মা। শক্ত প্লাস্টিকের কাপ।

পেছন থেকে এসে দাঁড়ালো মাসুম আর কথা সোনা। বাবার ঘাড়ে চড়ে সে খুব খুশি। মাসুম রাতের ড্রেস চেঞ্জ করে দিয়েছে। প্যাম্পার বদলে দিয়েছে। মুখ মুছে ক্রিমও দিয়েছে মনে হয়। সে হাত দিয়ে দেখালো তার মাথার চুল টেনেছে বাবা। মানে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে দিয়েছে। তারপর বাবার টিসার্টের বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখাচ্ছে, কিছু নেই। মানে ফোন নেই। আজকাল ফোন পেলে তার ভাষায় সে যে কতো কথা বলে! দেখে না হেসে উপায় থাকে না।
-খুব তত্ত্ব কথা হচ্ছিলো মনে হয়? মাসুম বলে।
-না না বাবা, ও কিছু নয়। একটু লজ্জা পায় মিলি।

মনে মনে ভাবে, তাদের সাথে মায়েদের কথা ছিলো, কি করবে আর কি করবে না। আর স্কুল জীবনে পরীক্ষায় পাশ করেছে কি না? শৈশবটা কেমন একা একা ছিলো। ভাইদের জন্য ব্যাট বল বা ফুটবল কেনা হতো, তাদের জন্য মাটির হাঁড়ি পাতিল কড়াই পিঁড়ে বেলুন এই সব। তখন খুব আনন্দ হতো। এখন বোঝে বৈষম্য কতটা ছিলো। তাও যে মফস্বল শহরে থেকেই সে বিএ পর্যন্ত পড়তে পেরেছে, সে শুধু বাবার জন্য। পরে প্রাইভেটে এম এ পাশ করেছে সেটা ইমতিয়াজের জন্য।

পাঁচ

দুইমাস এগারো দিন পর আজ মিলি ফিরে এসেছে নিজের সংসারে। শহরে হরতাল। তাই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসেছিলো ইমতিয়াজ। প্লেন ল্যান্ড করেছিলো একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। কিন্তু বের হতে লেগে গেলো পৌনে দুই ঘণ্টা। কনভেয়ার বেল্টের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় মনে হলো পৃথিবী হঠাৎ বন্ধ করে দিয়েছে ঘোরা। পারমিশন নিয়ে ভেতরে এসেছে ইমতিয়াজ। দেখা হতেই জড়িয়ে ধরে মিলি। যেন কেউ আর কোথাও নেই এই চত্বরে। কনভেয়ার বেল্টের দুই ধারে দাঁড়িয়ে থাকা চঞ্চল মানুষগুলো যেন তৃণলতা। প্রিয় মানুষের স্পর্শ পেতেই উথলে উঠল মিলির কান্না।

-কাঁদছো কেন রানি? এই তো আমি তোমার কাছে।

-কেমন আছো? সরে দাঁড়িয়ে মিলি প্রশ্ন করে।

-যেমন দেখছো। প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয় ইমতিয়াজ।

প্রাণ ভরে যায় মিলির। তার সেই চিরচেনা মানুষ। প্লেন ল্যান্ড করা মাত্রই মিলি ফোন করেছে ইমতিয়াজকে।

-আমি আছি ভেতরেই। টিভি স্ক্রিনে দেখেছি যে প্লেন ল্যান্ড করেছে।

-মা কেমন আছেন?

-ভালো। সকাল থেকে কি সব রাঁধছেন লাঞ্চের জন্য। কাল করেছেন ক্ষীরের মালপোয়া।

-মায়ের এইই এক সখ। নানা রকম রান্না করা।

-আমার তো অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে মায়ের হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে। লালশাক ভাজি করলেও অমৃত।

-তাহলে বোঝো, বাবা কেমন করে আছেন?

ইমতিয়াজ হাসে ঠোঁট চেপে।

-কি হলো? আমার কথা শুনে হাসছো যে বড়ো?
-নাবিলার সাথে বাবাকেও নিয়ে এসেছিলাম।
-তাই? বলোনি তো? তুমি না? কৃত্রিম কোপ দৃষ্টিতে তাকায় মিলি ইমতিয়াজের দিকে।
-মা নেই, খালা নেই, অতিথিরা নেই, বাবা বাসায় থাকবেন একা? তাও আবার এই বয়সে? তাই ভাবলাম, ঝামেলার ঝুঁকি কে নেয়?
-খুব ভালো করেছ রাজা। আচ্ছা এবার বলো, নাবিলা কেমন আছে?
-খুব ভালো রিকভারি হলো ওর। কাল রাতের প্লেনে চলেও গেছে ওরা।
-আহারে, আমি দেখতে পেলাম না ওদেরকে।
-খালার নাতনিকে দেখলে বোঝা যাবে না যে, এদেশের মেয়ে সে। বেশ স্মার্ট। আর তার মেয়ে নাবিলা তো একেবারেই বিদেশি মেয়ে। নোয়াম খুবই ভালো মানুষ। পরিচয় গোত্রহীন দরিদ্র স্ত্রীকে সে খুব ভালোবাসে। সম্মান করে। অতীত নিয়ে কোনো দুঃখ বা লজ্জা নেই ওর খালাকে দেখার পরও। কথা তো বলতে পারতো না, খালার কাছে গিয়ে বসে থাকতো। তার বউ ঝিনুকের একমাত্র রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়। মূল্য দিতো তার।
-ঝিনুকই আসল অভিবাসী, তাই না? পরিস্থিতির কারনেই সে তাই হয়েছিলো।
-ঠিক বলেছো।
-কথা বলতো কেমন করে ওরা?
-দু'পক্ষ দুরকম ভাষায় কথা বলতো। ইশারাই হতো বেশি। আমি থাকলে কিছু অনুবাদ করে দিতাম। আসলে ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য কোনো ভাষা লাগে না মিলি।
-খালা খুশি হয়েছিলো ঝিনুককে দেখে?
-খালার তো একটাই ভাষা দেখলাম আমি।
-তার মানে?
-সেটা হলো কান্না। খালা সুখেও কাঁদে, দুখেও কাঁদে।
হাসে মিলি। তুমি সবটাতেই তামাশা করতে পারো বটে।
-খালাকে ওরা কিছুদিনের জন্য নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু রাজি হলো না কিছুতেই। খালা তো এখানেও থাকতে চায় না। তার ধারণা, কুমিল্লার চেয়ে ভালো দেশ আর নেই পৃথিবীতে।
হঠাৎ মিলি দ্রুত চলে যায় কনভেয়ার বেল্টের কাছে, যেখানে সে ট্রলি রেখে এসেছে। বড়ো সুটকেসটা এসেছে এতক্ষণে। ক্যারিঅনটা তার হাতেই আছে। যাক, বাঁচা গেলো।

ট্রলির ওপর দুটো লাগেজ গুছিয়ে নিয়ে গ্রিন চ্যানেলের দিকে রওনা দেয় তারা। হঠাৎ কাস্টমসের লোক পেছন থেকে ডাকে, স্যার, এখানে একটু চেক করতে হবে।
মিলি আর ইমতিয়াজ ঘুরে ওদের টেবিলের কাছে গেলো।
-স্যার, সুটকেসটা একবার খুলতে হবে। তরুণ এক অফিসার বলে।
-গ্রিন চ্যানেল রেখেছেন কেন তাহলে? হাসে ইমতিয়াজ।
-কাল থেকে বেশ কড়াকড়ি চলছে স্যার। সবার লাগেজ চেক করার অর্ডার এসেছে।
-তাই নাকি? ইমতিয়াজ সুটকেস টেবিলের ওপরে তোলে।
-কাল তিন তিনবার সোনার বার জব্দ করা হয়েছে সার।
তরুণ আর একজন বললো, তার চেয়ে বড়ো ঘটনা ঘটেছে গত সপ্তায় স্যার। কিছু মনে করবেন না স্যার, আমরা হুকুম তামিল করি মাত্র।

অফিসারটা কেবল সুটকেসের ঢাকনা খুলে কাপড় চোপড় ওঠাতে গেছে, এমন সময় আর এক অফিসার হা হা করে এসে বললো, করছো কি তোমরা? উনি খান স্যার। ঢাকার বিখ্যাত আই স্পেশালিস্ট। উনাকে আমি চিনি। লোক চেনোনা তোমরা? উনার লাগেজ চেক করবে?
পাশ ফিরে ইমতিয়াজ দেখে, অপরিচিত এক অফিসার।
-স্যার, স্লামালেকুম। আমি বিলাওল। আপনাদের ডায়াগনস্টিক সেন্টারের প্যাথলজিতে কাজ করতাম। আপনার পরামর্শে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে কাস্টমসে চাকরি পাই। আমার জীবন বদলে দিয়েছেন স্যার আপনি।

তরুণ অফিসারকে বললো, স্যারের সুটকেস বন্ধ করো। উনার সুটকেসে আজেবাজে জিনিস থাকে না।
-আসেন স্যার, আসেন ম্যাডাম আপনাদের এগিয়ে দিই, বিলাওল বলে।
মিলি আর ইমতিয়াজ খুব অবাক হলো। কে এই বিলাওল? কিচ্ছু মনে পড়ে না ইমতিয়াজের। মিলি তো এর নামই শোনেনি কখনও।

গোছগাছ করে মিলি, ইমতিয়াজ আর বিলাওল গ্রিন চ্যানেলের দিকে যেতে শুরু করে। কারো মুখে কোনো কথা নেই।
-আমাকে এখনও চেনেননি স্যার? সেবার তো আমার জেল হয়ে যেতো। একজনের রিপোর্ট আর একজনকে দিয়ে দিয়েছিলাম। মানে, লিপিড প্রোফাইলের রিপোর্ট দিয়েছিলাম ক্যান্সারের রোগীর হাতে। আর ক্যান্সারের রোগীর রিপোর্ট দিয়েছিলাম লিপিড প্রোফাইলের লোকের হাতে। পরদিন সেই রিপোর্ট নিয়ে এসে সে কি হৈ চৈ রোগীর!
এতক্ষণে মনে পড়ে ইমতিয়াজের। বলে, ও আপনি সেই কর্মা? বিলাওল?

হ্যাঁ, ধুন্ধুমার একটা লাগিয়েছিলেন বটে। দু'জনেই হাসে। মিলি এখনও আঁধারে। তবু হাসে।
টার্মিনাল দুইয়ে তাদের গাড়ি আসার জন্য ফোন করে দিলো ইমতিয়াজ। বিলাওল চলে যাওয়ার আগে বলে গেল, এই দেশে থাকবো না স্যার। মনটা ভেঙে গেছে। আসলে ওদের কাজ যেমন কঠিন, তেমন ফাঁকির। এই চাকরির যে আবার চড়া বিপদ আছে সেটা হয়তো অনেকেই জানে না। বিলাওলের এক বন্ধু জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করে গেছে। সে কথাই হয়তো মনে করিয়ে দিয়ে গেলো।

হঠাৎ স্মৃতির ছোট্ট বাতায়ন খুলে গেলো ইমতিয়াজের। উদ্ভাসিত হলো স্মৃতির কিছু ঘটনা। গরিবের মেধাবী ছেলে ছিল ওসমান। বিসিএস পরীক্ষায় ভালো ফল করেছিলো। অপশন ছিলো তার দু-তিনটে। সে পছন্দ করেছিলো, কাস্টমসের চাকরি। খুব একটা অসাধু না হলেও পায়ের কাছে এসে পড়তো কড়ি। অভাবের সংসার। মা বাবা ভাই বোন, বোনের বিয়ে এসব কথা বিবেচনা করে মাটিতে পড়ে থাকা কড়িগুলো সে তুলতে শিখলো। সরাসরি অন্যায় আর অসৎ ধান্দাবাজি তখনও আসেনি ধাতে।

একদিন ধরে বসলো এক ভারি সুটকেস। ভেতরে সাড়ে সাত হাজার মোবাইল আর ঘড়ি। গ্রিন চ্যানেল দিয়ে তো পার হবেই না, ট্যাক্স লাগবে রীতিমতো। লাগেজটা নাকি কোনো এক হর্তাকর্তা ব্যক্তির। খবর গেল সেই তার কাছে। সে আরও অনেক বড়ো বড়ো হর্তাকর্তাদের নিয়ে এয়ারপোর্টে এলো। ব্রিলিয়ান্ট ইয়ং অফিসারের প্রশংসা করে তাকে ফ্ল্যাগওয়ালা গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হলো জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। বন্ধুরা বললো, এবার ওর কপাল খুলে যাবে। হঠাৎ চুপ হয়ে যায় ইমতিয়াজ।
-কি হলো রাজা? একেবারে চুপ করে গেলে যে?
-বিলাওল মনে করিয়ে দিয়ে গেল কিছু কথা।
-লোকটা অল্প বয়সেই কেমন মোটাসোটা হয়ে গেছে। ভালোই তো আছে মনে হয় তোমার বিলাওল।
-তবু বললো, এই দেশে থাকবে না। কোথায় যাবে তাও জানে না, শুধু জানে অভিবাসী হবে।
অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়ালো টার্মিনাল দুইয়ের সামনে। ড্রাইভার এসে লাগেজ তুলে নিলো গাড়ির ভেতর।
বাইরে গাড়ি ঘোড়া নেই বললেই চলে। বিআরটিসির কিছু লাল বাস রাজপথে চলছে। আর চলছে হাজার হাজার রিক্সা। প্রয়োজন তো আর বসে থাকে না।

জন্ম মৃত্যু বিয়ে কিছুই বসে নেই। বন্ধ নেই রোগ-শোক-তাপ। বিলাওল এলেবেলে করে দিয়ে গেলো মনটা।
-এই, বলো তারপর? জিজ্ঞাসাবাদের পর কি হলো? সত্যি কি প্রমোশন হলো ছেলেটার?
-তোমার কি মনে হয়?
-আমি কি করে বলবো?
-অনুমান করে বলো। তুমি তো সবসময় পজিটিভ ভাবো।
-মনে হয় হয়েছিলো।
-হয়তো হতো। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় সেখানেই নাকি তার হার্ট এটাক হয় এবং মারা যায় ছেলেটা।
আতঙ্কে চমকে ওঠে মিলি, কি বলো?
-পরের সপ্তায় তার বোনের বিয়ে ছিলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ইমতিয়াজ। বলে, শোনা যায়, দুর্নীতির কথা চাপা রাখার জন্য তাকে ইলেক্ট্রিক চেয়ারে বসতেই হয়েছিলো।
-ইস! মানুষ তাহলে আর ভালো কাজ করবে কেন?
-তা কি আর হয় মিলি? তবু মানুষ ভালো কাজ করে যাচ্ছে। দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছে সততার। অভাবি বাবা মা ছেলেকে শিখিয়েছিলো যত কেতাবি ভালো ভালো কথা। নতুন চাকরি। মনে বল কতো আদর্শ ধরে রাখবে। কি হলো?
-এবার বাদ দাও ওসব কথা। তোমার মনটা বিচলিত হয়েছে বুঝতে পারছি। নিরা-কথা এদের কথা শুনবে না?
-তাই তো, ওদের কথা কিছুই তো শোনালে না। বিলাওল এসে পড়লো মাঝখানে। আমিও কেমন হয়ে গেলাম।
-কথাটা না একটা রসগোল্লা হয়েছে। দেশে আসার জন্য উতলা হয়েছিলাম ঠিকই। এখন মনে হচ্ছে, আর ক'টা দিন থেকে এলে ভালো হতো।
হা হা করে হাসে ইমতিয়াজ। বলে, পুরুষদেরও সতীন হয় তাহলে?
-এই ছি! কি যে বলো?
-দুই নৌকায় পা রেখেছো রানি। তুমিও কষ্ট পাবে, আমিও পাবো।
-আগামি বছর আমরা দু'জনে যাবো। ততদিনে ও কথা শিখে যাবে। এখনই ফোন হাতে পেলে বড়োদের মতো ভাবভঙ্গি করে নানা রকম আওয়াজ করে। যেন কথা বলছে কারো সাথে। না হেসে থাকতে পারবে না। ভিডিও আছে, বাড়ি গিয়ে দেখাবো।
-আমাদের ফোনের খরচ বাড়বে বুঝতে পারছি।
-এসব খরচে আনন্দ আছে। ঠিক কি না বলো?
-এক্কেবারে ঠিক।

-ওর ছবি পাঠাতাম, দেখতে না?
-নিশ্চয়। আজকাল তো আর ক্যামেরার বালাই নেই। স্মার্টফোন থাকলেই হলো। ফোন থেকে ফোনে ছবি উড়ে আসে এক মিনিটের মধ্যে। কি দিনকাল হলো, না?
-শেষের ছবিটাতে কথা যার কোলে আছে, সেই মেয়েটা আফগানিস্তানের।ওর নাম সোরায়া।আমরা উচ্চারন করি সুরাইয়া।
ওর গল্প বলবো তোমাকে।
-বিশেষ গল্প নিশ্চয়?
-সত্যি তাই। বাহ! ঐ তো দেখা যায় আমাদের বাড়ির মাথা। এতো তাড়াতাড়ি এসে গেলাম?
-আজ হরতাল, না? জ্যাম নেই যে!
একটা ফোন এলো। নিরা করেছে, হ্যালো---
-হ্যালো মা, কেমন আছিস? ইমতিয়াজ কথা বলে।
-বাবা? কতদিন তোমার গলা শুনি নি বলো তো?
-পাগলি, গতো সপ্তাহেই তো কথা বললাম।
-সব ঠিকঠাক তো? মা খুব কাহিল হয়ে গেছে, না?
-ধর, তোর মার সাথে কথা বল। ফোনটা মিলিকে দেয় বাবা।
-হ্যালো মা, বাড়িটা ফাঁকা করে দিয়ে গেছ একেবারে।
-অমন করে বলিস না বাবা। কষ্ট লাগে।
-কথা তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পর্দা তুলে তুলে দেখছে, তুমি সেখানে আছো কি না?
-আহারে সোনা আমার, জাদু আমার। আমারই কি কম খারাপ লাগছে?
-মাসুম বললো, আজ দেশে হরতাল। তোমরা বাড়িতে যাচ্ছো কেমন করে?
-তোর বাবা এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসেছে। তাতেই যাচ্ছি।
-এদেশের লোক শুনলে বিশ্বাস করতেই চাইবে না। হাসে নিরা।
-কি আর করা বলো?
-গিয়েই তো বাড়ি ভরা অতিথি পাবে।
-কাদের কথা বলছিস?
-খালার বিদেশি আত্মীয় স্বজনদের কথা মা।
-ওরা সবাই চলে গেছে কাল রাতের প্লেনে। তবে বাড়ি ভরা লোক আছে ঠিকই। মিলি হাসে।
-তার মানে?
-তোর বাবা, তোর নানা আর খালাকে নিয়ে এসেছে ঢাকায়।
-খুব ভালো তো! আহারে! আমিই শুধু দূরে থাকি।

-ও কি কথা রে? আমি থেকে এলাম না তোর কাছে?
-জানো মা সোরায়া আজ সকালেই হাজির আমাদের বাসায়। বললো, জানি তোমার একা একা লাগবে। তাই একটু সঙ্গ দিতে এলাম।
-সত্যি খুব ভালো রে মেয়েটা। আচ্ছা এখন রাখি বাবা, বাসায় এসে গেছি। পরে আবার কথা হবে। সোরায়াকে শুভেচ্ছা বলিস।

গাড়ি এসে থামলো বাসার সামনে। কিন্তু গেটের ভেতরে এতো লোক কেন? ইমতিয়াজই প্রথম লক্ষ করে। তারপর মিলিও। গাড়ি থেকে নেমে জানতে চাইলো ইমতিয়াজ, কি ব্যাপার? কি হয়েছে এখানে?

কোনো ভান ভনিতা না করে অজানা এক লোক বললো, আমার বাসার কাজের মেয়েটা আপনাদের বাসায় পালিয়ে এসেছে। তাকে নিতে এসেছি। কিন্তু সে আসবে না, আর আপনাদের বাসার লোকজনও সাহায্য করছে না। এটা কি ঠিক হলো?
-কখন ঘটেছে ঘটনাটা?
-এক ঘণ্টা আগে।
-আমি তো কেবল বাইরে থেকে এলাম। দেখি কি করা যায়?
-কি করা যায় মানে? আমার কাজের লোক আপনারা আটকে রাখবেন নাকি? ওকে এখনি নিয়ে যাবো আমি। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে লোকটা।
-আমাকে বাসায় ঢুকতে দেবেন তো ভাই?
-আপনি বাইরে থেকেই কাজের মেয়েটাকে বের করে দিতে বলেন।
-না, আমি আগে বাড়ির ভেতরে যাবো, শুনবো ঘটনা, তারপর অন্য কথা। ইমতিয়াজের পাশে মিলিও এসে দাঁড়ায়। বলে, আপনি আসেন না আমাদের বাসার ভেতরে। বাইরে কথা বললে খামোখা লোক জমা হবে।
-লোক জমা তো করছেন আপনারাই।
-দুঃখিত, হয়তো আপনি পড়শি। কিন্তু পরিচয় নেই। আসেন না বাসার ভেতরে, মিলি বলে।
-না। আপনাদের বাসার ভেতরে আমি যাবো না।

ইমতিয়াজ ভালো করে লোকটাকে দেখে। ভদ্রলোক বলেই মনে হয় পোশাক আশাকে। কিন্তু কথাবার্তা অশিক্ষিত লোকের মতো। বয়সে তরুণই বলতে হবে। তবে তারুণ্য নেই চেহারায়। অনেক জোরে জোরে কথা বলছে। কণ্ঠস্বরে উচ্চতা আছে, লালিত্য নেই। ব্যাক ব্রাশ করা চুল। কিন্তু পরিশীলন নেই সেখানেও। সব মিলিয়ে কেমন যেনো।

পেছন থেকে লোকজন বলছে, মেয়েটা মারের চোটে পালিয়ে এসেছে। ওর হাতে-পায়ে ছ্যাঁকার দাগ। গায়ে একটা ছেঁড়া ময়লা জামা। মাথার চুল গোছা

গোছা করে কাটা। বাড়ির লনের সামনে গেটের বাইরে বসে বসে কাঁদছিলো। এই লোকেরা সব গায়ে গায়ে লাগা বাড়ির প্রতিবেশী। নাম না জানলেও মুখ চেনা।

খালা খুলে দিয়েছিলো গেট। অমনি ছুট্টে মেয়েটা বাড়ির ভেতর গিয়ে বাথরুমে আশ্রয় নেয়। কিছুক্ষণ কোনো খোঁজ হয়নি। তারপর ঐ ভদ্রলোক এসে জানতে চায়, একটা মেয়ে এই বাড়িতে এসেছে কি না?
খালা বলেছে, এসেছে।
তারপর থেকে তো চলছে এই সব।

ফোন এলো প্রফেসর বেয়াই সাহেবের কাছ থেকে। খোঁজ নেয়ার জন্য যে, হরতালের মধ্যে বেয়ানকে নিয়ে ঠিক মতো বাড়ি পৌঁছেছেন কি না?
-হ্যালো, বেয়াই সায়েব, সব ঠিক আছে তো? এতো লোকের কথা শোনা যায় কেনো? কি হয়েছে?
সংক্ষেপে ইমতিয়াজ ঘটনাটা বলে। বেয়াই বলে, পুলিশে দিন লোকটাকে। আজকাল এই রকম ঘটনা মাঝে মাঝেই হচ্ছে। ওদের কিছু শাস্তি পাওয়া দরকার। পয়সা হয়েছে, ভদ্র হয়নি।

ব্যাপারটা সারাদিন পাগল করে রাখলো ইমতিয়াজের বাড়ির লোকজনকে। মিলিও চায়, লোকটার শাস্তি হওয়া উচিত। আর মেয়েটাকে তো ওর হাতে দেয়াই হবে না।
অবশেষে মানুষটাকে বাড়ির মধ্যে এনে বসতে দেয়া হলো। পরিচয়ের এক পর্বে জানা গেলো, সেই লোকের নাম খোরশেদ প্রধান। পঞ্চগড়ের লোক। দেশ থেকে মেয়েটাকে এনেছিলো বাড়ির কাজের জন্য। ঢাকায় তার বেকারির ব্যবসা আছে। আয় রোজগার ভালোই। সে জানালো, তার বেগম সাহেব একটু রাগি। কথা না শুনলে মাঝে মাঝে এক আধটু মারধোর করে। তবে সেটা এমন কিছু না।

মেয়েটা কিছুতেই যাবে না ঐ লোকের সাথে। ভাঁড়ার ঘরে এক কোনায় জিনিস পত্রের আড়ালে কুঁচে মুরগির মতো গুটিয়ে বসে আছে। আর ঐ লোকটা কাজের মেয়ে ভানুকে না নিয়ে যাবে না।

প্রফেসর এলেন রিকশায় করে। সরাসরি কথা শুরু করলেন ঐ লোকের সাথে। বললেন, আপনি যদি ভানুকে নিতে চান তাহলে আমি পুলিশ ডাকবো। তাদের সামনে আপনার হাতে তুলে দেবো ওকে।
-এর মধ্যে আবার পুলিশ ডাকাডাকি কেনো? ও আমার বাসা থেকে পালিয়ে এসেছে, আমি ওকে নিয়ে যাবো। ব্যস!

-আমি যা দেখলাম, ওর তো চিকিৎসা দরকার।
-সে ব্যবস্থা আমি করবো।
-আমার বেয়াই ডাক্তার। আহত মানুষকে সে কি করে বিনা চিকিৎসায় ছেড়ে দেয় বলেন?
-আপনারা বাড়াবাড়ি করছেন প্রফেসর সাহেব।
-তাহলে পুলিশের মধ্যস্থতায় ভানুকে দেয়া হোক, কি বলেন?
-কিছুতেই না। আমি ওকে নিয়ে যাবো। ডেকে দেন ভানুকে।
-আমি ডাকবো পুলিশকে। আমার শ্যালিকা এখন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, তাকেই ডাকি। এসব শিশু নির্যাতনের কেস ভালো বোঝে ও।
-এটা করতে পারেন না আপনারা।
-এটা একটা সামাজিক দায়িত্ব। আমরাও চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না। এর একটা বিহিত করতে চাই।
-আমিও তাহলে সাহেবজাদাকে ডাকি, সে তার দলবল নিয়ে আসুক।
এই তল্লাটে সাহেবজাদার নাম জানে না কে? নাম করা গুণ্ডা। বোঝা গেল, লোকটার চলাফেরা কাদের সাথে।
-বেশতো। ডাকেন তাকে। তবে তার আগেই পুলিশ আপনাকে নিয়ে যাবে থানায়। থানা থেকে কোর্টে। কোর্ট থেকে রিমান্ডে। রিমান্ড থেকে জেল। কোনটা চান? বেয়াই সাহেবের মুখে কঠিন রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

রনে ভঙ্গ দিতেই হলো লোকটাকে। সে বেশ শাসানি দিয়ে চলে গেলো। মিলি বললো, বেয়াই সাহেব, ওদের মতো অসভ্য লোক তো একটা নয়।
কাজের মেয়েকে নির্যাতনের ঘটনা অনেক হচ্ছে। আর করছে তো নগরের মধ্যবিত্ত লোকেরাই। সংখ্যায় বেশি না ওরা। তবু নগর জীবনে অন্য মধ্যবিত্ত লোকদের গায়ে কাদা ছিঁটোনোর জন্য যথেষ্ট।
-আমরা রুখে দাঁড়ালে কিছু তো কমবে বেয়ান।
-আমার কিন্তু ভয় লাগে। দেখলেন না কীভাবে শাসালো? যদি সত্যি কিছু করে? ওরা সব পারে।
-আমরাও কিছু পারি বেয়ান। লোকের হাতে প্রচুর টাকা হয়েছে। সারাদিন পার্টি, দাওয়াত, রেস্টুরেন্টে খাওয়া, উৎসব উদযাপন, এই নিয়ে সবাই মেতে আছি আমরা। এটা তো কোনো সভ্য দায়িত্বশীল জীবন হলো না।

সেই কোন সকাল থেকে ধুন্ধুমার চলতে চলতে বেলা প্রায় তিনটে বাজে। মিলি সবাইকে দুপুরের খাবার জন্য ডাকলো।

টেবিলে সুন্দর করে সাজানো খাবার। মিলির মায়ের সাথে দেখা হতেই প্রফেসর বললেন, মাঈমা, কেমন আছেন?
-ভালোই তো ছিলাম। কিন্তু দেখলে তো বাবা কি সব বিশ্রি কান্ড? কি নিষ্ঠুর ভাবে মেরেছে মেয়েটাকে? হাতে-পায়ে, পিঠে ছ্যাঁকা। কোনোটাতে ঘা হয়ে গেছে। রোগা পটকা একরত্তি মেয়ে। সইবে কি করে? তার ওপর পেট ভরে খেতে দিতো না। আহা! কি কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা!
-তাই তো পালিয়ে এসেছে মা। ইমতিয়াজ বলে, বেয়াই এসে খুব ভালো হয়েছে। আমি তো বুঝতেই পারছিলাম না, কি করা উচিত?
মিলির বাবা এলেন খাবার ঘরে। হাতে নেবুলারের ছোট মেশিনটা। সম্ভাষ বিনিময় হলো সবার সাথে। ওঁকে একটু কাহিল মনে হলো। মিলি গিয়ে বাবার হাত ধরে টেবিলে বসালো। আমি জানি, তোমার শরীর ক'দিন থেকে একটু খারাপ। ইমতিয়াজ বলেছে আসার সময়।
-হাঁপানির রোগীদের এই তো অবস্থা রে মা। এই ক'দিন ভালো, তো কদিন আবার খারাপ। তা বসো বাবারা। কি যে ঝামেলা সকাল থেকে বলোতো? ঢাকা শহরে কি এসব মানায়? হাঁপিয়ে গেলো মানুষটা এই ক'টা কথা বলতেই।
-ছেড়ে দেন বাবা। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। ইমতিয়াজ বলে।
-ভানুর কি হবে? মিলি বলে, আমি তো সে কথা ভেবেই সারা।
-আমি ওকে কুমিল্লা নিয়ে যাবো, মিলির মা বলে।
-তোমার খুব সাহস মা। মিলি বলে।
-তো কি করবি? ওর বাবা নেই। মা গেছে কাতারে কাজ করতে। তিন বছর হলো কোনো যোগাযোগ নেই ভানুর সাথে। ওর খালাই তো ওকে কাজের জন্য দিয়েছে। সেও খোঁজ খবর নেয় না।
প্রফেসর বলেন, যাই করা হোক, পুলিশকে জানিয়ে করতে হবে কিন্তু। ও লোক পাজি আছে। কেস টেস করে ঝামেলায় ফেলার চেষ্টা করতেও পারে।
-কথা ঠিক বেয়াই সাহেব। এই জন্য তো কেউ কারো ভালো করতে চায় না। উদোড় পিণ্ডি বুদোড় ঘাড়ে হয়ে যায়।
-সে যাই হোক, ভানুকে আমি নিয়ে যাবো। আমাদের বাড়িতে কত লোক আসে যায়, খায় দায়। অন্তত পেট পুরে খেতে পারবে। কেউ তাকে মারবে না। মিলির মা বলেন।
খালা বলে, আর ক'দিন আগে এমন ঘটলে নাতনির সাথে বিদ্যাশে পাঠিয়ে দেয়া যেত।

সবারই হাসি পায়, কিন্তু হাসে না। মিলি বলে, ভানুর মা তো অভিবাসী হয়েই আছে, ভানুও হয়ে যেত। কিন্তু ওসব যে অনেক ঝক্কির কাজ গো খালা। এতো সহজে হয় না।
-কেন? আমাকে নিয়ে যেতে চাহেলো না? আমার বদলে ভানু চইলা যাইতো। খালা নিজের মতকে জোরদার করতে চায়।
মিলি আর কথা বাড়াতে চায় না। এমনিতেই অনেক বেলা হয়ে গেছে। সবার খাওয়া দরকার। সেও তো ক্লান্ত। কিছু বিশ্রাম চাই তারও। বলে, খালা লইট্টা মাছের শুঁটকির তরকারিটা কই?
-মা (মানে মিলির মা) বলেছিলো, রাতের জন্য রাখতে।
-না না, বেয়াই খুব পছন্দ করেন শুঁটকির তরকারি। নিয়ে এসো।
মিলির মা বলে, ছি ছি, আমিই তো মনে করতে পারতাম। যাও যাও, নিয়ে এসো তরকারিটা।
-আ হা হা হা, কি কপাল? হরতালের দিন লইট্টা মাছের শুটকির তরকারি খাবো। প্রফেসর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। টেবিলে আরো পদ আছে, কিন্তু উনি কোনোদিকে তাকালেন না। খেতে বসে প্রথমেই বেগুন দিয়ে রান্না শুঁটকির পদ দিয়ে খাওয়া শুরু করলেন। খুব ইনফর্মাল মানুষ। কিন্তু অন্যায় দেখলে অন্য মানুষ।

খেতে খেতে নানা গল্প চলছে। ইমতিয়াজ বললো, বেয়াই সাহেব, ঘটনাটা কিন্তু এখনো মিটলো না।
-পৃথিবীতে কোন ঘটনার পূর্ণ সমাধান হয় বলেন তো ডাক্তার বেয়াই? তা নিয়ে এতো ভাবলে চলে? ব্যাপারটা আমি আমার শ্যালিকাকে বলে রাখবো। যা করার ও করবে। খুব এফিশিয়েন্ট অফিসার হয়েছে মল্লিকা।

ভানুর চিকিৎসা শুরু হলো। কোন প্রাণে যে ওকে মারতো ওরা? মলম লাগাতে বসে কাঁদে খালা। বোকার মতো ও তাকিয়ে থাকে খালার দিকে। ভালোবাসা কি জিনিস তা জানে না ভানু। খালার কান্না দেখতে ভালো লাগে ওর। কেমন নরম নরম ভাব একটা স্পর্শে। গায়ে হাত দিলে অদ্ভুত আরাম লাগে। ব্যথার জায়গাতেও আর বোঝা যায় না ব্যথা। খালা জিজ্ঞাসা করে, লাগত্যাসে মা?
-কি কমু? ভানু বলে।
-কষ্ট লাগলে কবা।
-লাগে না তো।
-আমারে খালা ডাকবা।
-আপনের নাম কি খালা?

-পাগলে কি কয়? খালা কি কারো নাম অয়?
-সবাই ডাকে যে!
-অই আর কি? সবাই খালা কয়া ডাকে। তুমিও কবা।
ভানুর কাপড় কেনা হয়। সুন্দর করে চুল কেটে দেয়া হয়। সাবধানে লাইফবয় সাবান দিয়ে গোসল করিয়ে দেয় খালা। চুল ধুয়ে দেয় শ্যাম্পু দিয়ে।
দু'দিনের মধ্যে ভানুর জামা কাপড় চিরুনি সাবান গামছা স্যান্ডেল সব হয়ে গেছে। ঘুমোনোর জন্য তোশক-চাদর-বালিশ-মশারি কেনা হয়েছে। তিন বেলা খেতে পাচ্ছে। খালা বসে থেকে এটা ওটা তুলে দিয়ে ভাত খাওয়ায়। যেনো স্বপ্ন দেখছে ভানু। কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লো? মা গেছে কোন দেশে চাকরি নিয়ে, আর ফিরলো না। কেউ বলে হারিয়ে গেছে। কেউ বলে মারা গেছে। কেউ বলে, দেশ ছেড়ে গেলে কেউ আর ফেরে না।

খালাটা গরিব। ভিক্ষা টিক্ষা করে খায়। খাওয়ার কষ্টেই দিয়ে দিয়েছিলো ভানুকে মানুষের বাসায় কাজে। সেই জালিমের বাসায় তার ভাগ্যে নিত্য মারধোর আর অর্ধাহার। দুর্বল শরীরে কাজের কমতি ছিলো না। মেঝেতে শুয়ে ঘুমোতে হতো। বালিশ চাদর মশারি কিছুই ছিলো না। অথচ নিয়ে যাওয়ার সময় কতো ভালো ভালো কথা!

কতদিন ভেবেছে পালিয়ে যাবে। কিন্তু এমন ভাবে পাহারার মধ্যে রাখতো যে জানালা খুলে বাইরের জগত দেখারও জো ছিলো না। খালাও আসেনি কোনোদিন দেখতে। কোনো আত্মীয়কে সে জীবনে দেখেইনি। তাই কেউ আসেওনি তাকে দেখতে। শহর জীবনের কাজকর্ম তো সে জানে না। তাই ভুল ত্রুটি হতো। ফলে চড় থাপ্পড় তো ডালভাত। বেগম সাহেব বলতো, ভালো করে কাজ না করলে একদিন গলা টিপে মেরেই ফেলবো তোকে। ভয়ে বুক শুকিয়ে যেত ভানুর। কিইবা বোঝে জীবনের? কি বা দেখেছে ভালো কিছু? তবু বাঁচার আকুলতা ছিলো ষোলো আনা। তাই তো সে পালিয়ে এসেছে এখানে। ভালো কোনো কিছুর আশায় সে পালায়নি। পালিয়েছে শুধু বাঁচার জন্য। যে বাঁচার মানেটাও সে জানে না।

ওদিকে পুলিশের ভয়ে ঐ লোক আর তার পরিবার মহল্লা ছেড়ে গেছে। ইমতিয়াজ স্বস্তি পায় ওদের চলে যাওয়ায়। কেস টেসের মধ্যে আর যেতে হলো না। যদিও ইচ্ছে ছিলো, ঐ লোকের একটা শাস্তি হোক। কিন্তু কেস মানে তো বিশ্রি ঝামেলা। কারো সময় নেই কোর্ট কাচারি দৌড়োনোর।
প্রফেসরেরও সময় নেই। মাসুম তো বাইরে। সেজান তার পড়া নিয়ে নাওয়া খাওয়ার সময় পায় না। ইমান ছোট। তবু তার ইচ্ছে ছিলো ঐ লোকটাকে জেলে ঢুকানোর। সে খুব লাফালাফি করলো কয়েক দিন। কেউ তাকে পাত্তা

দিচ্ছে না বলে সে বললো, এই জন্যেই তো শয়তান লোকগুলো বেঁচে যায়। পাড়ার ছেলেরা মিলে দু'ঘা দিতেও পারলাম না তোমাদের ভালোমানুষির জন্য।

বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠেছে ভানু কয় দিনেই। কিন্তু এখনও তার চোখে ভয় থমকে আছে। বাইরে কোনো লোক এলেই দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘরে লুকোয় সে। কে জানে, ঐ শয়তানদের কেউ এলো কি না? রাতে খালা তার পাশে শোয়। ঘুমের ঘোরে কখনও সে খালার গলা জড়িয়ে ধরে। অস্ফুটে কাঁদে, 'মা মাগো। কোথায় তুমি? আমারে নিয়া যাও। অরা আমারে মাইরা ফালাবে'। খালার মায়া বেড়ে যায়। বুকের কাছে টেনে নেয়। বলে, এই তো আমি ভানু। কেউ মারবে না তোরে। আমি আছি না?

মিলি বেশ পছন্দ করে মেয়েটাকে। শান্ত ভিরু ভিরু খরগোশের মতো শব্দহীন চলা ফেরা। সারাদিন থাকে খালার গা ঘেঁষে ঘেঁষে। টুকটাক কাজও বেশ করতে পারে। কানাডা থেকে নিরা বলে, মা ওকে লেখাপড়া শেখাও। মিলিরও ইচ্ছে তাই। একটা এতিম অনাথ মেয়েকেও যদি জীবনে করে কর্মে খাওয়ার উপযুক্ত করা যায়! ভানু বেশ চালাকও। দেশ গ্রামের নাম বলতে পারে। মা খালা বাবার নাম বলতে পারে। মিলি লেখে রাখে ওর ঠিকুজি। বড়ো হলে কোনো দিন যদি ও যেতে চায়, তখন কাজে লাগবে। নাই থাকলো কেউ, পাড়ার লোকে তো চিনতে পারবে ভানুর মাকে বাবাকে খালাকে।

দিন তো একতালে চলে না। ইমতিয়াজ চেম্বার থেকে বাড়ি আসেন দশটার দিকে। সাধারণত রাতের খাবার উনি এলেই শুরু হয়। সবাই অপেক্ষা করে ওর জন্য। কাজের ছেলে আর ভানু বসে টিভি দেখে। আগে কখনও টিভি দেখেনি ভানু। সন্ধেবেলায় টিভি ছাড়া হলে ওকে রান্না ঘরে বন্ধ করে রাখা হতো। বেগম সাহেবের মতো হলো, সিরিয়াল দেখলে ভানু শয়তান হয়ে যাবে। তবু দরজায় কান পেতে ভানু গান শুনতো। নাটকের গল্পের কথা শুনতে চেষ্টা করতো। হাসির কিছু হলে হাসতো একা একা। বিনোদন বলতে ঐটুকু গোপন আনন্দ ছিলো তার। কখনো ক্লান্ত হয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে শুয়ে ঘুমিয়ে যেত। সেদিন কপালে জুটতো কিছু উত্তম মধ্যম। আর এখন বসে বসে টিভি দেখছে সবার সাথে। এই জগতটাই আলাদা তার কাছে।

মিলির কাজের ছেলেটা ভানুর বয়সিই হবে। দিনের বেলা ঠিকা বুয়া আসে। রান্না-বান্না ধোয়া-মোছা সবই করে। সাথে সাথে কাজের ছেলেটা ঘর ঝাড় দেয়া, চেয়ার টেবিল মোছার কাজে সাহায্য করে। এখন ভানুও ঘরের

আসবাব মোছার কাজে সাহায্য করে। প্রতিদিন এতো ধুলো কোথা থেকে আসে, কে জানে?

কানাডায় এই বালাই নেই। ধুলো নেই ও দেশে। তবু মাঝে মাঝে একটু মোছামুছি করতে হয়। মাসে একবার করলেই চলে। তাই তো মানুষ পারে একা একা সব কাজ সামলাতে। বাসন কোসনও মেশিনে ধোয়া হয়। রান্নার ধরন বদলে নিয়েছে বাংলাদেশের মানুষেরাও। মাঝে মাঝে হৈ চৈ করে খানাপিনা ছাড়া অন্য দিনের খাওয়া খুব সহজ। দিনে তো সবাই ঠাণ্ডা লাঞ্চ খায় অফিসে। যারা বাসায় থাকে, তারাও একরকম করে খাওয়া সেরে নেয়। রাতে হয় গরম খাবার। কখনও ওভেনে, কখনও চুলায় রান্না। প্যাকেট বা টিনজাত খাবার কেনাই থাকে ঘরে। কাটা বাছা ধোয়া জমানো খাবার। শুধু গরম করা। এই সব আরাম আছে।

শুক্রবারে সাধারণত বাজারে যায় ইমতিয়াজ। এই এক সখ ওর। ইচ্ছে হলে হঠাৎ কখনও একেবারে সোয়ারি ঘাটে গিয়ে মাছ কিনে আনে। সে মাছ তো অল্প স্বল্প নয়। কমপক্ষে বিশ কেজি মাছ আনবে। নানা পদের মাছ। কিছু পাঠাবে বেয়াই বাড়ি। বাকিগুলো গুছোনোর অনেক কাজ। কিছু আস্তই রাখা হবে ডিপ ফ্রিজে। ধীরে ধীরে খাওয়ার জন্য। কিছু রান্না ভাজা ভর্তা চচ্চড়ি হবে।

আর সাধারণ বাজারের জন্য যায় কাওরান বাজারে। সেখান থেকেও মাছ, মুরগি, শাক-সবজি আনবে প্রচুর। মানুষ তারা দুটো। কিন্তু বাজারের দিন দারোয়ান খাবে। ড্রাইভার তো আছেই। এখন তো বাড়ি ভরা। মা, বাবা, খালা আছে। ভানু এসেছে। শুক্রবারে বুয়াও খায় বাসায়, নাহলে নিয়ে যায়।

ভানু তো এতো খাবার দেখেইনি কখনও। খালা ওর থালা সাজিয়ে দেয়। এতো পদের মাছ মাংসের তরকারি দেখে ওর চোখ দুটো চক চক করে ওঠে আনন্দে। অনেক সময় নিয়ে বসে বসে খায়। তারপরে রান্নাঘরের নির্দিষ্ট কোনায় গিয়ে মাটিতে শুয়ে ঘুমায়। প্রিয় কোনা তার। যেন কতো আরামের! নিরাপদ তো বটেই!

সামনেই রোজা আসছে। একদিন মিলি আর ইমতিয়াজ বসলো, যাকাত ফিতরার হিসেব নিয়ে। ফিতরার পরিমান জানা যায় রোজার মাসেই। কিন্তু মিলি আর ইমতিয়াজ মাথা পিছু একশো টাকা করে দিয়ে দেয়। কটাই আর মানুষ? তবে জাকাতের টাকা হিসেব মতো দিতে চেয়েও হয়ে ওঠে না। সে জন্য অপরাধবোধও আছে ইমতিয়াজের। সে জানে ভালো করে যে, সে আয় করলেও সব টাকা তার নয়। গরিব প্রতিবেশী, গরিব আত্মীয়, এবং

এতিমরাও সেই টাকার হকদার। তাই ঠিক করেছে এবার কুমিল্লায় ইমতিয়াজের বাপ দাদার গ্রামে তাদেরই জায়গায় একটা অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে। তাতে যতই খরচ হোক। মিলিরও একশো ভাগ মতো আছে তাতে।

ছোটো ভাই ইলিয়াসের সাথে আলাপ করে একটা ট্রাস্টি বোর্ড করতে হবে। গ্রামে কাছের দূরের আত্মীয়-স্বজন আছে। তাদের মধ্য থেকে তিন জন সদস্য আর তারা দুই ভাই, এই মোট পাঁচ জনের কমিটি করা দরকার। একেবারে আইন আদালত করে পাকা বন্দোবস্ত হতে হবে। যেন সহজে এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি না হয়।

কানাডায় নিরাকে জানানো হলো। খুশি হলো শুনে মাসুমও। সে বললো, তার বাবাকে বলবে, সেও যেন এই রকম একটা প্রকল্প নেয়। কারণ, তারা তো আর দেশে ফিরে যাবে না। বাবা মা একদিন থাকবে না। তার মানে, দেশ থেকে তাদের নাম হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো?

শুনে ইমতিয়াজ আর মিলি খুব আনন্দিত হলো। প্রফেসর বেয়াই একদিন দুঃখ করে বললেন, এক ছেলে তো পাচার করে দিয়েছি। বাকি দুজন কি আর থাকবে? উন্নত জীবনের হাতছানিতে ছুটে যাবে ওরাও। মানেটা কি হলো? বাংলাদেশের মাটি থেকে তাদের বংশ পরিচয় মুছে যাবে। নাতি-নাতনি জন্মভূমি হবে বিদেশ। ওরা যদিও কেউ ফিরে আসে, তাহলে ইন্ডাষ্ট্রি বা ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে আসবে। জন্মভূমির মাটিতে জন্মের চিহ্ন রাখার জন্য নয়। এগুলো সবই তত্ত্ব। বাস্তবে কি হবে তা বলতে না পারলেও খুব যে আলাদা একটা কিছু হবে তা মনে হয় না।

রাতে শুয়ে শুয়ে মিলি আর ইমতিয়াজ এই সবই আলোচনা করছিলো। মিলি হঠাৎ বেমক্কা একটা প্রশ্ন করে বসলো, আমরা একটা বাচ্চা পালতে পারি না?
-পারি। কিন্তু এখন আমাদের বয়স হয়ে গেছে।
-সেই জন্যই তো চাই।
-আমরা ভানু আর তাসিরকে তো পালছি। পড়ালেখাও শেখাচ্ছি।
-তবু আমার ইচ্ছে করে।
-কথাটা পনেরো বছর আগে বললে তো ঘটনা অন্য রকম হতে পারতো।
-কেমন সেটা?
-আমরাই একটা বাচ্চা নিয়ে নিতাম।
-আমি তো না করিনি। আপত্তি ছিলো তোমারই।

-আমি না মেয়েদেরকে বুঝি না। একবার মা হয়ে তাদের সাধ মেটে না, তাই না? আবার উন্নত বিশ্বে মেয়েদের অনেকেই মা হতেই চায় না।
-আমার কিন্তু সত্যি ইচ্ছে ছিলো আরো বাচ্চা নেয়ার।
-এমনি কি আর বলে, যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর?
-না না রাজা, ওসব কিছু না। মাঝে মাঝে ভাবি কিনা।
-আমরা তো ডিম পাড়ি মাত্র। তাতে তা দিয়ে বাচ্চা বানাও তোমরা। বাচ্চা পাড়োও তোমরা । নিজেকে ব্যথা বিষে নীল করে, দিন করে, রক্তাক্ত করে পৃথিবীতে আনো একটা প্রাণ। কতো মেয়ে মরেও যায়। তুমি তো চলেই গিয়েছিলে রানি।

বুকে জড়িয়ে ধরে মিলিকে। বলে, আমার ভাগ্য ভালো তাই তোমাকে ফিরে পেয়েছি। ওপরওয়ালার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।
আপ্লুত হয়ে যায় মিলিও। বলে, তোমার জন্যই আমার জন্ম হয়েছিলো, তোমাকে ফেলে যাবো কোথায় আমি রাজা?

রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে হঠাৎ। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে কোথা থেকে যেনো। বেহায়া রসিক চাঁদটা জানালা দিয়ে এমন করে ঢুকে বিছানায় লুটপুটি খাচ্ছে যে, দুটো মানুষের আদিম রুপ দেখা যায় স্পষ্ট। দুষ্ট রিপুর ঘুম ভেঙে যায়। নেশার নরম প্রলেপ দিতে থাকে সে তাদের সারা শরীরে। অবশ হয়ে তারা যেন পাতালে নেমে যেতে থাকে। মিলি আর ইমতিয়াজ ভুলে যায় সব জাগতিক পরিকল্পনার কথা। সচেতনে ভালোবেসে দুটো পরিণত মানুষ একেবারে মিশে যায় দু'জনের সাথে। আনন্দ, আরাম, সুখ, পবিত্রতা আর নৈকট্যের চাদর দিয়ে ঢেকে দেয় সরল নির্বিকার সময়। সবারই আপন সে।

ছয়

দেশের বাড়ির সংসার একেবারে ছোটো হয়ে গেছে। মিলির মা বাবা খালা সবাই গত হয়েছেন একে একে। শূন্য বাড়িতে থাকারও কেউ নেই। সেই বাড়িতে মা বাবার নামে একটা মেয়েদের অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল করার পরিকল্পনা করে মিলি। সখটা মায়েরই ছিলো। বাবার সমর্থন থাকলেও তা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া জায়গা বাড়ি পড়ে থাকলে কেউ না কেউ ভোগ দখল তো করবেই। ইমতিয়াজেরও একই অবস্থা। তাদের বাপ দাদার ভিটেতেও ঘুঘু চরে। মিলি আর সে পরামর্শ করে দুই জায়গায় দুটো স্কুল করতে চাইলেন।

এসব কাজে সময় লাগে। চাওয়া মাত্রই হয়ে যায় না। গ্রাম সমাজের লোকজনদের সক্রিয় সমর্থন সহযোগিতা লাগে। সেটা পাওয়া গেলো সহজেই। দু'তিন বছরের চেষ্টা, শ্রম আর অর্থের বিনিময়ে কাজ দুটো হলো। মিলিদের বাবার বাড়িতে হলো একটা মেয়েদের প্রাথমিক স্কুল। আর ইমতিয়াজের জন্ম ভিটেয় হলো একটা ছেলেদের প্রাথমিক স্কুল।

মিলির ইচ্ছে ছিলো, ইমতিয়াজ একটা দাতব্য হাসপাতাল করুক। কিন্তু ইমতিয়াজ বলেছে, ওটা বেশিদিন দাতব্য থাকবে না। আমাদেরই লোকজন ব্যবসা শুরু করবে। গিজগিজে জনসংখ্যার দেশে রোগ রোগি বাড়বেই। তখন বিশ টাকার রেজিস্ট্রেশন ফিস হয়ে যাবে দু' হাজার টাকা।

-আগে থেকেই এসব ভাবছো কেনো?

-আমি দেখেছি কয়েকটা এই রকম কেস মিলি। এদেশের লোকের প্রাণ নেই একথা ঠিক নয়। অনেকেই কিছু করে গেছেন। কিন্তু এ দেশের লোকের মধ্যে আবার কিছু খাদকও আছেন। তারা যেখানে যা পাবেন তাই খাবেন।

-খুব খারাপ কথা।

-তাই তো বলি স্কুলই ভালো। বিশেষ করে মেয়েরা কিছু হলেও লেখা পড়া শিখুক। এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেনিতে হাতের কাজের প্রকল্পটা সবাই খুব পছন্দ করেছে।

-বিশেষ করে, বাঁশ বেতের কাজগুলো। আমাকেও অনেকে বলেছে। মিলি বলে, আমি নিজেও চেয়েছিলাম এই রকম কিছু একটা প্রকল্প। যাতে ঘরের জিনিস পত্র নিজেরাই করে নিতে পারে মেয়েরা।

-রাইট। যতো যাই বলি না কেনো, আমাদের দেশে উন্নত জীবনের হাওয়া লাগতে এখনও অনেক দেরি ভাই।

-তাই তো বলি, সব কিছুই শহরের বাজার থেকে না কিনে কুলো ডালা, পাটের ছিকা, ব্যাগ, শাড়ির পাড়ের সুতো দিয়ে চটের কার্পেট, খেজুর পাতার পাটি, এসব যদি নিজেরা বানিয়ে নিতে পারে, তাহলে সংসারে দুটো পয়সার সাশ্রয়ও হয়।

-আমি প্রশংসা করি তোমার পরিকল্পনার।

-তাছাড়া নিজের হাতের জিনিস ব্যবহারে আলাদা আনন্দও আছে, না? অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য মেয়েদেরকে বাইরে গিয়েই কাজ করতে হবে, এটা আমি ষোলো আনা মানতে পারি না।

-এইবার আমি হার মানি মিলি।

-কেনো?

-ঐ ক্ষমতায়ন টমতায়নের কঠিন কঠিন কথা আমি বুঝতে পারি না। মেয়েরা পড়ালেখার পাশাপাশি কিছু হাতের কাজ শিখলে খুব ভালো হবে, এটুকু বুঝতে পারি।
-থাক, বুঝে কাজ নেই তোমার। এটা তো জানো যে, দেশে এনজিওর আকাল নেই?
-তা জানি। এখন তো পুরুষদেরও এনজিও আছে।
-আবার কোথা থেকে কোথায় যাও?
-তোমাকে জানালাম পুরুষ এনজিওর কথা।
-আমি জানি। কেউ পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন, কেউ মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছেন, কেউ বনায়ন নিয়ে আছেন।
-ঠিক ঠিক। তুমি তো আমার চেয়ে ভালো জানো দেখছি।
-আমার সবচেয়ে বিরক্ত লাগে মানবাধিকার এনজিওর ন্যাকা ন্যাকা কথা। কাজের কাজ করতে দেখলাম না কোনো দিন। যাক, শোনো, কোনো নারীবাদি এনজিও যদি ওদের তৈরি জিনিস পত্র বিপননের ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে খুব ভালো হয়। কিন্তু হবে কীভাবে?
-হবেই যে না, তাই বা ভাবছো কেনো মিলি?
-না, আমি তা ভাবছি না। বরং ভাবছি এনজিওদের অনেকেই সৎ নয় বলেই শুনি। বিপননের পয়সার ভাগ নেয় তারা।
-দুঃখের কথা। এমন তো হওয়ার কথা নয়। ওরা হবে সেবক, না?
-আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তাই তো ভাবি। কিন্তু বাস্তব অন্য রকম। তোমার আমার কিছুই করার নেই।
-আমার জগত তো একেবারে আলাদা। তবু ভাবছি সপ্তায় একদিন এক বেলা গরিবদের জন্য ফ্রি চোখের চিকিৎসা করবো। কি বলো মিলি?
-আমি খুশি হবো। আমাদেরও তো কিছু দিতে হবে দেশকে।
-ঠিক বলেছো। শুধু খেয়ে পরে ভোগ করে জীবন কাটানোর বাইরেও কিছু করবো বলেই তো স্কুল করলাম। এবার আমার বিদ্যা দিয়ে কিছু করি।
-আমি গর্বিত ইমতিয়াজ তোমার দর্শনের জন্য। তোমার একটা সুবিধে আছে, তুমি চাইলেই তা করতে পারবে। মানে একবেলা চোখের চিকিৎসায় ফ্রি সার্ভিস দেয়ার কথা বলছি।
-তুমিও পারবে মিলি।
-কি পারার কথা বলছো?
-মেয়েদের হাতের কাজ বিপননের কথা।
-কিন্তু আমি কীভাবে মেয়েদের হাতের কাজের বিপনন করবো?
-চেনা কোনো এনজিওর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো।

-আমার বন্ধু মেঘনাকে তো চেনো। সে এখন মস্ত এনজিওর হর্তা কর্তা। গাড়ি বাড়ি হয়েছে। লোকে বলে প্রকল্পের নামে যে টাকা পায় তার বেশির ভাগই চলে যায় এনজিও পোষনে। গরিবরা আর কতোটুকু পায়? তবু ভালো যে কিছু তো পাচ্ছে।
-বেয়াই সেদিন বলছিলেন, শায়েস্তা খানের আমলে যখন এক টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেতো, তখনও গরিবেরা পেট ভরে খেতে পায়নি, এখনো পায় না। এটা এই দেশের সিস্টেমের দোষ। গরিবেরা গরিবই থাকবে, ধনিরা ধনিই হতে থাকবে।
-এসব নিয়েও ভাবেন বেয়াই? মিলি অবাক হয়।
-নিশ্চয় ভাবেন। তিনি আরও বললেন, এখনকার সিস্টেমে ধনী আর গরিবের ব্যবধান কোনোদিন কমবে না, বাড়তেই থাকবে।
-আমি আবার এসব বুঝতে পারিনা। যাক, শোনো, আগামি শুক্রবারে মেয়েদের স্কুলটা দেখতে যাই চলো। অমনি বাবাদের স্কুলটাও দেখে আসবো। কি বলো? কাছাকাছি গ্রাম তো।
-তাহলে ইলিয়াসকে জানিয়ে দিই।
-তাড়াতাড়ি জানিও। আমি চাইছি, মাসুম নিরা আর কথা মহারাজ দেশে আসার আগেই আমাদের কাজগুলো সেরে ফেলবো। ও হ্যাঁ, ভানু তো ক্লাস এইট পাশ করলো, ওকে যুব প্রশিক্ষণের কোনো একটা কোর্সে ভর্তি করে দিলে কেমন হয়?
-ভালো বলেছো। সাধারণ আইএ বিএ ডিগ্রি করে কি আর চাকরি পাবে? হতভাগা ছোঁড়াটা চলে গেলো দেশে। অথচ ভানুটা কেমন সুন্দর এইট পাশ করে ফেললো, দেখো।

বেয়াই সাহেব মিলিদের প্রকল্পের প্রশংসা করেন। কিন্তু বেয়ানের কাছে তেমন একটা ভালো লাগে না ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। সেজান ডাক্তার হয়ে চলে গেছে কেনিয়া। ভালোই ছিলো। এখন সেখান থেকে যেতে চাচ্ছে সিয়েরালিওনে। বেয়ানের চোখে দুর্গম অসভ্য এলাকা। ওখানে নাকি সে বাংলাও শেখাবে ওদের। বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা সেখানে। দুঃখের সীমা নেই বেয়ানের। কোথায় ডাক্তার ছেলে দুহাতে টাকা কামাবে, ভালো ঘরে বিয়ে থা করে সংসার করবে। তা নয়, যতো ভুতুড়ে কথাবার্তা! তার ছেলে এমন হতে পারে কি করে? সবই কপাল তার! নইলে ডাক্তার ছেলে বনে জঙ্গলে ঘুরতে চায়?

মিলি বুঝতে পারে, বেয়াই-বেয়ান দুই মেরুতে অবস্থান করেন। দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক হওয়ার আগে এসব বোঝা যায়নি। তবু তো সংসারে

তিনটে ছেলে হয়েছে তাদের। ওরা লেখা পড়ায়ও বেশ ভালো। লোকে বলে পৃথিবী এখন একটা বিশ্বগ্রাম। সব দেশের মানুষ এখন পৃথিবীর যে কোনো দেশে গিয়ে থাকতে পারে। মানুষগুলোও কেমন উড়ু উড়ু হয়েছে।

কথা সত্যি। তথ্য প্রযুক্তির বরাতে পৃথিবী এখন বিশ্বসংসারের খোলা উঠোন। কার ঘরে কি আছে, কি হচ্ছে তা অন্যে সহজেই দেখতে পায়। পছন্দ করতে পারে হাজার মাইল দূরের উঠোন। যার উড়ুমুখ মন আছে, সে উড়ে যায় দূর দেশে। কেউ পড়তে যায়। কেউ চাকরি নিয়ে যায়। লেখাপড়া শেষে কেউ ঘরে ফেরে। কেউ ওদেশের মাটিতে গেঁথে যায়। বিয়ে করে ঘর সংসার করে। প্রজন্মের জন্ম দেয়। কেউবা তুলে নিয়ে যায় এদেশের মাটির সন্তান মায় মা বাবা ভাই বোনকে। ঘর বাঁধে ভিনদেশের উঠোনে। কিছু করার নেই।

বেয়ানের ধারণা, ইমান যে গেছে কুয়ালালামপুরে ইসলামিক স্টাডিজ পড়তে, সেও আর ফিরবে না দেশে। কেমন করে যেনো কয়েক বন্ধুর মাথায় পোকা উঠলো, কুয়ালালামপুরে যাবে। তো গেলোই। প্রতি দুই সেমিস্টার শেষে দল বেঁধে আসে সবাই। আবার চলে যায় ছুটি শেষে হলেই। ওদের হাব ভাব বদলে গেছে অনেক। আইক্রিস নিয়ে গল্প করে। শেষে না আইক্রিসে মিশে যায়। একজন তো যাবে সিয়েরালিওনে। আর একজন যদি আইক্রিসের যোদ্ধা হয়, কি করার থাকবে তার? দুশ্চিন্তায় মাঝে মাঝে রাতে ঘুম আসে না বেয়ানের।

বেয়াই বেয়ানও একা হয়ে গেছেন সংসারে। বেয়ান বলে, মানুষের বাচ্চাই আসলে শ্রেষ্ঠ নিমকহারাম। বড়ো হয়ে গেলে মা বাবার দিকে ফিরে তাকায় না।

মিলি বলে, এমন করে ভাবছেন কেনো বেয়ান?

-কি বলবো আর ভাই? কতো কষ্টে লালন পালন করতে হয় একটা বাচ্চা। বড়ো হলে মনে থাকে না কিছুই তার। পাখির ছানার মতো ডানা মেলে উড়াল দেয় নতুন ঠিকানার খোঁজে।

-আমরাও কিন্তু কিছুটা দায়ী বেয়ান। ভেবে দেখেন।

-আমরা তো আর ওদের বিদেশে উড়ে যেতে শেখাই নি।

-কিন্তু সব সময় আমরা চেয়েছি, আমাদের সন্তান বড়ো হবে। অনেক বড়ো হবে।

-তাতো হতেই হবে বেয়ান। দেশের দশের একজন হবে, সেটাই তো চেয়েছি। এ তো সব বাবা-মা'ই চান, না?

-নিশ্চয় তাই। খাইয়ে পড়িয়ে ওদের আমরা এতোটাই পুষ্ট করে তুলি যে, তখন আর আমাদের মাটির ছোটো খাঁচা ওদের ভালো লাগে না। বেশি

ভালোর প্রতি জন্মে যায় আসক্তি। সত্যি বড়ো হতে চায় তারা। অনেক বড়ো হয়ে দিগন্ত ছাড়িয়ে যেতে চায়। কিছু করার নেই ভাই।
-কেনো এতো স্বার্থপর হবে বাচ্চারা? বাবা মা কেউ নয়?
-উন্নত বিশ্বের ঝলমলে জীবন ওদের হাতছানি দেয় যে।
-আমার একটুও ভালো লাগে না বেয়ান।
মিলি হাসে। বলে, ভালোবাসা আর মায়ার দড়ি এখন অনেক লম্বা হয়ে গেছে। তবু তো আমাদের ছেলে মেয়েরা ধরে রেখেছে সেই দড়ি। এখনও যোগাযোগ রাখে।
-সেটা আবার কেমন কথা বেয়ান? আমি বুঝতে পারি না।
-হাজার মাইল দূর থেকে ওরা ফোন করে। স্কাইপে কথা বলে, দেখা দেখি হয়। মনে হয় এই তো কাছেই আছে সবাই।
-তা অবশ্য হয়। না পারতে মেনে নেয়ার মতো করে বলেন মহিলা।
-কেউ কেউ তো সেটাও করে না বেয়ান। মানে, করতে পারে না কাজের চাপে। মনে হয় কথা বলি। দিন কেটে যায়, কথা বলা হয় না। ছিঁড়ে যায় এক সময় ভালোবাসার দড়ি। এই যেমন টিভি সিরিয়ালের নাটকগুলো হয়ে গেছে। মিলি তুলনা দিয়ে বেয়ানকে বোঝানোর চেষ্টা করে।
-আমার বাসায় কাজের বয়সি লোকটার বউ নাকি আবুধাবি যাবে মেইড-এর কাজ করতে। শুনে তো আমি অবাকের পর অবাক হলাম।
-কেনো বেয়ান? ভানুর মা তো সেই কবেই গেছিলো কাতারে। যদিও আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তার।
-মানে?
-হয়তো অসুখ-বিসুখে বা কোনো দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কে জানে? কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
-ভানুর কপাল ভালো যে, ও আপনাদের কাছে এসে পড়েছে।
-সবই ওপরওয়ালার দাবা খেলা ভাই। তবে মেয়েটা ভালো। এবার ক্লাস এইট পাশ করলো। ভাবছি ওকে কোনো টেকনিক্যাল লাইনে পড়াবো।
-এইট পাশ করে কি টেকনিক্যালে পড়বে?
-এই দর্জিগিরি, রেডিও টিভি মেরামত, কম্পিউটার শেখা, মানে যাতে ও সহজে টাকা আয় করতে পারে।
-ভালো বুদ্ধি করেছেন তো।
-ভাবছি ও যদি কম্পিউটার শেখে বা দর্জির কাজ শেখে, তাহলে আমাদের মেয়েদের প্রাইমারি স্কুলে ওকে মাস্টার করে নেবো।
-গ্রামে কম্পিউটারের চেয়ে দরজির কাজই বোধ হয় বেশি ভালো হবে। নাজিফা বলেন।

-না বেয়ান। গ্রাম আর সেই গ্রাম নেই। আসেন না আমাদের সাথে স্কুলটা দেখতে। আমরা যাবো আগামি সপ্তায় আশা করছি।
-ঠিক আছে। আমারও দেখার ইচ্ছে ছিলো। বুড়ো বয়সে কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো।
খুশি হয়ে যায় মিলি। বলে, বেয়াই সাহেবকেও নিয়ে চলেন। আশা করি, উনি পছন্দ করবেন আমাদের প্রকল্প।

বাড়ি ফিরে মিলি প্ল্যান প্রোগ্রাম করতে শুরু করে। থাকার কোনো সমস্যা নেই কোনো স্কুলেই। দুটো করে ঘর ঠিক করে রাখা থাকে। বেতের খাট টেবিল চেয়ার সবই আছে। স্যানিটরি বাথরুম আর ছোটো রান্না কাম খাওয়ার ঘর আছে। লোকজন আছে রান্না করে দেয়ার। গ্রামের লোকজন পীরের ভক্তি করে তাদের। আর নিজেদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন তো আছেই।

ও বাবা! নিরা ফোন করে জানালো, তারা এক সপ্তাহ আগেই আসবে। মাসুমের কি যেন কাজ পড়ে গেছে। তাই আগে এসে আগেই ফিরতে হবে। ব্যস, ভেস্তে গেল এতো সুন্দর প্রোগ্রামটা। তবে যেতে হবেই একবার। ছেলেদের স্কুলে একটা নতুন ক্লাস, মানে ক্লাস সিক্স খুলতে হবে। ইচ্ছে আছে এই ভাবে প্রতি বছর নতুন ক্লাস খুলতে খুলতে ক্লাস টেন পর্যন্ত খুলবে। তারপর দেখা যাবে।

দুই পরিবারেই খুশির হাওয়া। এক পরিবারে ছেলে, বউ আর নাতি আসছে। অন্য পরিবারে মেয়ে জামাই আর নাতি আসছে। একটু সাজ সাজ গোছগাছ চলছে। আর তো মাত্র দুটো দিন। কি কি খাওয়া হবে, কোথায় কোথায় যাওয়া হবে সেই সব প্ল্যান হচ্ছে দুই বাড়িতেই। আর ফোনের কথা তো চলছেই দুই বাড়ির মধ্যে।

মাসুম নিরা আর কথা এসে উঠলো প্রফেসরের বাসায়। মিলি আর ইমতিয়াজ গেলো সন্ধের আগেই। আহ, কতোদিন পরে মেয়েটাকে দেখলো মিলি। কথা বাঁকা চোখে দেখছে নানুকে। ও এখন আটে পা দিয়েছে। দুবছর আগে দেখেছে। তাছাড়া স্কাইপে দেখে। কথা বলে। মনে আছে নিশ্চয়। তবু একটু সংকোচ আর কি। ইমতিয়াজ কাছে গিয়ে সরাসরি কোলে তুলে নিলো। সে কি তার লজ্জা! বড়ো হয়ে গেছে না!
নিরা বলে, অতোবড়ো ছেলেকে কোলে নিয়েছো কেন বাবা?
-বড়ো কি রে? গতবারও তো কোলে নিয়েছি।
-এখন ও আটে পা দিয়েছে না বাবা? বড়ো হয়েছে না?

-থাক না কিছুক্ষণ। বড়োই তো হবে। তারপর ডানা মেলে কোন দেশে যে যাবে, কে জানে? আমরা তো সব পাখির ছানা মানুষ করি রে মা।

লিভিং রুমে কথা হচ্ছিল। সাড়া পেয়ে বেয়াই বেয়ান এলেন। বড়ো বাড়িতে মানুষ মাত্র তিনজন কাজের ছেলেকে ধরে। ড্রাইভার থাকে গ্যারাজের ওপরের ঘরে। ওকে ধরলে চার জনের জন্য বেশ বড়ো এলাকা। সামনে পেছনে বাগান আছে। মালি আসে দিনের বেলায়। কিচেন গার্ডেনে বেশ শাক সবজি হয়। এটা প্রফেসরের সখ। বেয়ানের অবসরের সঙ্গি হলো ফোন আর বই।

জমে উঠলো সন্ধেটা। মাসুম আরো স্মার্ট হয়েছে। নিরা দেশে এলে সালোয়ার কামিজ পরে এখনো। অতি আধুনিকতা নেই ওদের কারো মধ্যে। বাসায় বাংলা কথা বলে নিরা আর মাসুম। তাই কথা সোনা দিব্যি বাংলা বলতে পারে। তবে মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে ফেলে। এটা তো দেশের প্রজন্মেরও স্টাইল হয়ে গেছে। এরা বলে সখ করে। কথা বলে সহজাত সাপ্লাই থেকে। বাংলা শব্দ না এলে ইংরেজি দিয়ে পুরন করে নেয়। তবে লিখতে বা পড়তে পারে না। মনে মনে হাসে ইমতিয়াজ। কি সংস্করণ যে হবে এরা? কার সময় আছে ওদেশে? কে বসে বসে বাংলা লেখতে পড়তে শেখাবে? বাংলাদেশে শুধু জন্মেছেই। সেইটুকুই যা মাটির ছোঁয়া। জন্ম ঋণ। সেও কি আর আছে? থাকার কথাও না। জীবনের ইতিহাস ভূগোল সব বদলে গেছে।

কেউ ছাড়লো না ডিনার না খাইয়ে। পদ ছিলো অনেক রকম। তবে তেমন গুরুপাক নয়। রান্নাও ভালো হয়েছিল। বিশেষ করে বেকড ইলিশটা। ডেসার্ট হিসেবে পায়েশটা খুব মজার হয়েছিল খেতে।

কথার জন্য আইস্ক্রিম এনে রাখা হয়েছিলো। চকলেট আইস্ক্রিম তার খুবই পছন্দ। দুই লিটারের বক্স যখন বের করা হলো ফ্রিজ থেকে তখন কথা বললো, সব আমার দাদি? মা তো আমাকে দাঁতে পোকার ভয় দেখায়। বলে আইস্ক্রিম খেলে কালো কালো পোকা হবে দাঁতে। তাই সহজে আইস্ক্রিম কিনে দেয় না। আর দিলেও একটা মাত্র বার, না হয় কাপ।

সবাই হাসে কথার বক্তব্য শুনে। নিরা ইচ্ছে করে সেধে সবাইকে আইস্ক্রিমও খেতে দিলো। কারণ থাকলেই তো কথা দুই বেলা খাবে। তারপর তবক দেয়া পান। মিলিই বলে, বেয়ান সাহেব কি আজকাল পান খাওয়া ধরেছেন?
-না না বেয়ান, আপনার বেয়ান হলেন স্বাত্ত্বিক মানুষ। পান টান খান না। এটা আমারই সখ। মাঝে মাঝে ভাল মন্দ রান্না হলে এনে রাখি, বলেন খায়ের সাহেব।

-সোরায়ার কথা মনে আছে না মা তোমার? নিরা বলে, ও বিয়ে করেছে এক কাশ্মীরি ছেলেকে। সে দারুণ পান খায়। মাঝে মাঝে আমাদের জন্য নিয়ে আসে।
-যাক, মেয়েটার ঘর সংসার হয়েছে জেনে ভালো লাগলো।
মাসুমের মা বাবাও একবার কানাডা গেছিলেন। তাঁরাও দেখেছেন সোরায়াকে। নিরা শাশুড়িকে বলে, মা আপনারও তো মনে আছে ওকে? তাই না? আপনাদের জন্য কাবাব করে এনেছিলো?

কথায় কথায় রাত এগারোটা বেজে গেলো। এবার যেতে হয়। উঠে দাঁড়ালো ইমতিয়াজ। এমন সময় ড্রাইভার এসে জানালো, ফার্মগেটে মারামারি গোলাগুলি হয়েছে দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে। আর একটু পরে বের হতে হবে। পাশের বাড়ির ড্রাইভার এখনি এসেছে ঐ পথের ওপর দিয়ে। সেই বললো।
-তুমি কখন জানলে খবরটা? প্রশ্ন করে মিলি?
-এই তো আধাঘণ্টা আগে খালাম্মা।
-তাহলে এখন আমরা যেতেই পারি, বলে ইমতিয়াজ।
খায়ের সাহেব বলেন, উঁহু, একটু খোঁজ খবর নিয়েই দেখা যাক না। এই যে বেগম সাহেব, ফোন করো না তোমার পুলিশ বোনকে।
খবর পাওয়া গেলো। ড্রাইভারের খবর ঠিক। তবে সব চুকে বুকে গেছে অনেক আগে। যাত্রী চলাচল স্বাভাবিক হয়ে গেছে এখন।

এরই মধ্যে দুই বেয়াই গল্প জুড়ে দিয়েছেন। খায়ের সাহেব বলেন, ঢাকা সিটিকে উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে ভাগ করার দরকার কি ছিলো বলেন তো বেয়াই? মারামারি তো ওরাই করছে রোজ।
-আমি এসব ব্যাপারে বকলম বেয়াই। শুধু নিজের কাজটা করতে জানি। ইমতিয়াজ বলেন।
-আমার মনে হয়, পদ পদাধিকার সৃষ্টি করার কৌশল এগুলো।
-হয়তোবা। ভাবিনি কখনও।
-ব্যবসায়িরা এখন শুধু ব্যবসার টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তারা ক্ষমতাও চায়। ক্যান্ডিডেটরা সবাই ব্যবসায়ি। ওদেরই ভোট হবে। তাই নিয়ে রোজই কোথাও না কোথাও মারামারি লেগে থাকে। বিরক্তিকর!
-আপনি তো বেশ খবর রাখেন দেখছি। হাসেন ইমতিয়াজ।
-ঐ ছাত্র-ছাত্রীরা বলাবলি করে কিনা। এই প্রজন্ম আমাদের চেয়ে অনেক চালাক এবং সচেতন। আমরা যা না বুঝি, ওরা তা বোঝে।

-মিলি বলছিলো, কাল নাকি আপনাদের কলেজ ক্যাম্পাসে গোলাগুলি হয়েছে? আহতও হয়েছে কয়েকজন ছাত্র ছাত্রী?
-আমিও শুনেছি। আমি সকালেই ক্লাস নিই। ক্লাস শেষ হলে চলে আসি বাসায়। মারামারি সাধারণত হয় দুপুরের দিকে। তাই অনেক কিছুই জানতে পারি পরে। তাছাড়া আজকাল পত্র-পত্রিকা খুললেই তো খুন খারাবির খবর। এতো পত্রিকা, খবর না ছাপালে পাতা ভরবে কেমন করে? জেলা শহরে তো জায়গা দখল, ঘরে আগুন দেয়া, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া, বাচ্চা চুরি করা, এসব ঘটনা ডাল-ভাত। মাঝে মাঝে পত্রিকা পড়তেও ভালো লাগে না।
-হচ্ছেটা কি দেশে বেয়াই? ইমতিয়াজ বলেন, ডিটেইলস না জানলেও আঁচ যে একবারে পাই না তা নয়।
-আমি তো মনে মনে বলি, ছেলেরা বাইরে আছে, ভালোই আছে।

মাসুম এসে বলে, বাবা, আমি আর নিরা গাড়ি নিয়ে একটু ঘুরে আসি?
-না বাবা শুনলে তো সব। কাল দিনে যেও। খায়ের সাহেব বলেন।
-নিজের দেশে লুকিয়ে থাকতে ভালো লাগে না বাবা, মাসুম বলে।
বেয়ান এগিয়ে এসে বলেন, দিনকাল ভালো না রে বাবা। তোর বাবা ঠিকই বলেছেন।
নিরা বলে, বাবারা তো যাচ্ছেন। ওঁদের সাথে যাই? একটু ঘোরা আর কি? আসার পর থেকে বাড়িতেই আছি মা।
আমাদের যে বাড়ি যেতেই হবে রে মা। ইমতিয়াজ বলেন, কিন্তু তোমাদের তা নয়। কাল বেরোতে পারবে তোমরা।
-এতো আগলে রাখার কি আছে বাবা? আমরা বড়ো মানুষ না?
-থাক না। বেয়াই বেয়ানের ইচ্ছেটাকে মেনে নাও মা। মিলি বলেন।
কেমন গুমোট হয়ে গেলো বাড়ির আবহাওয়া। মাসুম বললো, তোমরা এমন আঁটোসাটো হয়ে থাকো কি করে এখানে মা?
-থাক আর কথা না বাড়িয়ে বিশ্রাম নাও গে বাবা, ইমতিয়াজ বলে। আমরা এবার আসি। আর রাত করা ঠিক না। খোদা হাফেজ।

সময় তো দৌড়োচ্ছে না, যেন উড়ে যাচ্ছে। দুই বাড়ির বাবা মায়েরা দারুন সময় কাটাচ্ছেন। লোকে যতো কথাই বলুক, বহু সংসারে এখনও সুখের বাতাস বয়। জানটা ভরে আছে ক'দিন থেকে দুই বাড়ির লোকের। কথা সোনা একাই তো একশো। সে যেদিকে যায়, আনন্দ ঝুর ঝুর করে পড়তে থাকে। বিদেশে তো এতো খোলামেলা বাসা পায় না। দাদু নানু দু'জনের বাসাই বেশ

বড়ো। রোজ সকালে দাদির বাগানে গিয়ে মালির সাথে সবজি তুলে আনে। কি আনন্দ তার!

মাসুমরা চলে গেলে দুই বাড়ির বাবা মায়েরা যাবেন গ্রামের স্কুল দেখতে। সে গল্প শুনতে শুনতে মাসুম আর নিরার একটু ইচ্ছে হয়েছিলো গ্রামে যাওয়ার। হাজার হোক দাদা নানার বাড়িতে স্কুল হয়েছে। নানার বাড়ি বুড়িচং সে গেছে। মনেও আছে। সেখান থেকে ময়নামতিও গেছে। কিন্তু দুলাইপুরে দাদার বাড়ির কথা তার মনে পড়ে না। কথা এখন বড়োই হয়েছে। সব না হলেও কিছু কিছু মনে থাকতো। কিন্তু গ্রামে মশার উৎপাত বেশি। পাছে জ্বর জারি হয়ে যায় কথার, তাই সেই প্রস্তাব বাতিল হলো। আর আছেও তো মাত্র সাত দিন। ঢাকার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের বাসায় ঘোরাঘুরি করাও দরকার। আবার কবে আসা হয় কে জানে?

ঝকঝকে সকাল। দুই বাড়ির মানুষেরা নাস্তা করতে বসেছিলো মিলিদের বাসায়। লুচি, ভাজা পরোটা, সেঁকা পারোটা, ডিম ভাজা, নারকেল আর গুড় দিয়ে ভাপা পিঠে সবই করা হয়েছে। স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে ছেলে মেয়ে বিদেশ থেকে এলে এই সব খাবার করা হয়ে থাকে সাধারণত। দেশি খাবার পছন্দ করে খায় মাসুম নিরা আর কথা। ভাপা পিঠে খুব ভালোবেসে খাচ্ছে কথা। আগে কখনো হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেনি।
গল্পে গল্পে খাওয়া হয়ে গেলো। ভানু চা নিয়ে এলো। এমন সময় বাইরের গেটে 'স্যার স্যার' বলে বেশ উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলো তিন চার জন মানুষ। বেরিয়ে এলেন ইমতিয়াজ। তাঁর ছেলেদের স্কুলের হেড মাস্টার, বাংলা মাস্টার আর দুজন সহকারি মাস্টার এসে দাঁড়িয়ে আছেন গেটের বাইরে। প্রত্যেকের কাপড়ে রক্তের ছোপছোপ দাগ। কিছু তো একটা হয়েছেই।

প্রথমে ওদেরকে ভেতরে এনে বসতে দিলেন ইমতিয়াজ। ওঁরা কথা বলবে কি, হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলেন। তারপরে একটু শান্ত হয়ে যা বললেন, তার মর্ম মারাত্মক। আতঙ্কজনকও বটে।

স্থানীয় প্রভাবশালীদের চেলা-চামুণ্ডারা প্রায় এসে স্কুলের জায়গাটা কিনতে চাইতো। ওখানে কেউ একটা হিমাগার তৈরি করবে। লেখাপড়ার চেয়ে তাতেই নাকি কৃষকদের লাভ অনেক বেশি। গ্রামের চাষীদের উন্নতি হলেই গ্রামের উন্নতি। আর গ্রামের উন্নতি হলে দেশের উন্নতি। হাবি জাবি পড়ে কি হবে? ওরা আরো বোকা হয়ে যাবে। এই সব বলতো।

হেডমাস্টার রাজি হননি। তিনি বুঝিয়ে বলেছেন, এই স্কুল একজন সমাজসেবীর তৈরি। তার বাবার ভিটেতে গড়ে তোলা। ছেলেদের পরীক্ষা

চলছে। হেড মাস্টার ভেবেছিলেন, পরীক্ষা হয়ে গেলে তিনি নিজে ঢাকায় গিয়ে বলবেন সব কথা।

দুইদিন আগে ওরা আবার এলো। বললো, আপনাদের সমাজসেবীর সাথে কথা হয়েছে? আসলে এসব ব্ল্যাক মানি সাদা করার ধান্দা। আমরা সবই বুঝি। সে যাই হোক, এই জমি আমাদের চাই। শেষবারের মতো বলে গেলাম কিন্তু।

হেড মাস্টার বলেছিলেন, আগামি সপ্তায় তিনি ঢাকায় যাবেন। এখন ছেলেদের পরীক্ষা চলছে তাই যেতে পারছেন না।
-গুল্লি মারো তোমার পরীক্ষা ফরীক্ষায়। তিরিক্ষি মেজাজের একটা যুবক বলে।
বাংলা মাস্টার বলেন, ভাই, উনি আমাদের হেড স্যার। উনাকে সম্মান করে কথা বলেন। আমাদের নাহলে খুব খারাপ লাগে।
-তুমি তো ভালো চামচা মনে হচ্ছে, ঐ যুবকটাই বলে।
ক্লাস ফাইভের দুটো ছেলে বলে, ভাইজান, উনি আমাদের স্যার। উনাকে চামচা বলবেন না ভাইজান।
ছুটে গিয়ে ছেলে দুটোকে হিড় হিড় করে টেনে ক্লাসের বাইরে এনে খুব মারলো ছেলেটা। বললো, শালার বাচ্চা হারামজাদা, আমি কে জানিস? আমি হলাম নেতার আপন চাচাতো ভাতিজা। ছোট ছোট ছেলেরা ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে বাড়ি গেলো। খালি হয়ে গেলো স্কুল। পরীক্ষা দেয়া হলো না ছেলেদের। ওরাও চলে গেলো বাড়ি। মারকুটো ছেলেটা বীরদর্পে চলে গেলো। পিছে পিছে গেলো ওর সাগরেদরাও। মাস্টারেরা কি করবেন বুঝতে পারলেন না।

পাড়ার লোকজন জমা হয়ে গেলো। কেউ বললো, থানায় জিডি করতে। কেউ বললো, ঢাকায় খবর দেন। কেউ বললো, ওদের সাথে কেউ পারবে না। থানা ওদের কথায় ওঠে আর বসে। পুলিশ ওদের বন্ধু। হেড মাস্টার বললো, ঢাকায় তো খবর পাঠাবোই। কিন্তু আমি থানায় একবার যাবো। সত্যিই কেস নিলো না পুলিশ।

সারাদিন খাওয়া নেই দাওয়া নেই। থানা থেকে আসতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেলো। ভালো করে স্কুলের ঘর বন্ধ করে বাড়ি গেলেন হেডমাস্টার। অন্যরাও চলে গেলেন। সবার মনেই রাগ আর হতাশা। প্রকাশ্যে মারপিট করে গেলো, আর থানায় মামলা নিলো না? এমন ঘটনা তাঁরা শোনেনও নি, দেখেনও নি। দেখা যাক কাল ঢাকায় গিয়ে কি হয়? ছেলেদের পরীক্ষা পিছিয়ে দিলো এক সপ্তাহ।

হঠাৎ মাঝরাতে হাতে মশাল নিয়ে কারা এলো চেনেননি হেড মাস্টার। পনরো বিশ মিনিটের মধ্যে তুলকালাম কান্ড ঘটিয়ে উল্লাস করতে করতে চলে গেলো

ওরা। এই সময়ের মধ্যে ওরা স্কুলঘরে আগুন দিয়েছে। পুকুরের মাছ সব ছেঁকে মেরে নিয়ে গেছে, গ্রামের তিনজন মেয়ে বউকে তুলে নিয়ে গেছে, আর সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই মারধর করেছে। ওদের হাতে দা চাপাতি লাঠি সবই ছিলো। কেউ এগোয়নি ভয়ে।

আসবাবপত্রসহ স্কুল ঘর পুড়ে গেছে। সামনের বেগুন খেত পুড়ে গেছে। ইমতিয়াজদের থাকার ঘর দুটো থেকে সব ফিটিংস নিয়ে গেছে খুলে। বলেছে, থানায় জিডি করতে যাবি না? গেছিলি তো। কাল থেকে বালি ঢেলে পুকুর ভরাটের কাজ চলবে। দেখবি হারামিরা এখানে একমাসের মধ্যে হিমাগার তৈরি হয়ে যাবে। স্কুলের হাউস মিটায়া দিসি। এবার বাপ-দাদার জমি কোথায় যায় দেখবে তোদের ডাক্তার। বলেই হু হু করে কান্না হেড মাস্টারের। ফুঁপিয়ে ওঠে অন্যরাও।

হতভম্ব হয়ে গেলো সবাই। এমনটা যে ঘটতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবে নি ইমতিয়াজ। অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনা তো সত্য। তার মানে কেউ এখানে ভালো কাজ করতে পারবে না? যে দেশে এখনও অর্ধেক লোকের অক্ষর জ্ঞান নেই, সে দেশের আনাচে কানাচে স্কুল গড়ে তোলা দরকার। অন্তত মানুষের চোখ যেনো পৃথিবীর আলো দেখতে পায় ভালো করে। পৃথিবীটা যে কতো সুন্দর তা বুঝতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের কাগজ পত্র পড়তে পারে। নিজের নাম লেখতে পারে। নিজের কৃষি কাজ, পশুপালনের কাজ এবং সাধারণ সাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে জানতে পারে। শুধু বোবা প্রাণির মতো বেঁচে থাকা জীবনের গণ্ডি থেকে বের হতে পারে। তাই তো স্কুল তৈরি করা!

কারো মুখে কোনো কথা নেই। যেন বোবা হয়ে গেছে সবাই। মিলির দু'চোখে ধারা। সে ভাবছে, এতোগুলো টাকা আগুনে পুড়ে গেলো? তার চেয়ে বড়ো দুঃখ, শ্বশুরের ভিটে বেদখল হয়ে যাবে? সন্ত্রাসীরা গায়ের জোরে দখল করে নেবে এতো বড়ো জায়গা? হিমাগার হবে ভালো কথা। এতোগুলো বাচ্চার লেখাপড়ার কী হবে? সন্ত্রাসীরা যে মেয়েদের তুলে নিয়ে গেছে, তাদেরই বা কি হবে? ওদেরকে আর পাওয়া যাবে কি না, সেটাও অনিশ্চিত। বুকের ভেতর উথাল পাথাল করে তার।

খায়ের সাহেবও নির্বাক হয়ে বসে আছেন। তাঁর পুলিশ শ্যালিকার কথা কি মনে পড়ছে? বুঝতে পারছেন না তিনি। সব কিছু তো বিনাশ হয়ে গেছে। কিন্তু সন্ত্রাসীদের তো ছেড়ে দেয়া যায় না। অন্তত এ্যারেস্ট করতে হবে পালের গোদাদের। তারপর জেল জরিমানা কিছু তো হতেই হবে। দেশে এখনও আইন আদালত আছে। বিচার-আচার আছে। একেবারে ছেড়ে দিলে চলবে না। মগের মুল্লুক নাকি?

ইমতিয়াজ চেম্বারে ফোন করে কাকে যেনো বললেন ডাক্তার নিয়ে আসতে। লোকগুলোর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। মিলি উঠে গেলো বাড়ির মধ্যে। অন্তত ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করতে হবে ওদের জন্য। নিরীহ গরিব মানুষ এরা। স্কুলটাকে ভালোবেসে কাজ করতো মিলে মিশে। গ্রামে একটা স্কুল ছিলো একসময়। খড়ের ঘরে পড়ানো হতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনি সেটা পুড়িয়ে দিয়েছিলো। তারপর থেকে স্কুলশূন্য এই গ্রাম। দু'তিন গ্রাম ডিঙিয়ে ছেলেরা স্কুলে যেতো। মেয়েদের পড়ার জায়গা ছিলো না কোথাও।

এই স্কুল প্রতিষ্ঠা হলে কি যে খুশি হয়েছিলো গ্রামের মানুষ! বেশ ভালোই চলছিলো। এইবার প্রথম প্রাইমারি পরীক্ষা দেয়ার কথা ছেলেদের। আগামি বছরে ক্লাস সিক্স খোলার কথা ছিলো। ক্রমে একদিন এই স্কুল থেকে ছেলেরা এস এস এস সি পরীক্ষা দেবে। এই স্বপ্ন দেখতো মিলি আর ইমতিয়াজ। এখন ছেলেদের পরীক্ষাটাও গেলো। মানুষ কি ভাবে আর কি হয়! গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে ইমতিয়াজের বুক থেকে।

-দেখলেন তো বেয়াই, স্কুল করে কি আমি কোনো দোষ করেছিলাম? ইমতিয়াজ প্রশ্ন করে খায়ের সাহেবকে। কেমন ঠাণ্ডা গলা।
-না বেয়াই, কোনো দোষ করেন নি আপনি।
-দেশের মানুষের জন্য কিছু ভালো একটা করতে চেয়েছি, এই তো? আমি না কিছুতে মেনে নিতে পারছি না।
-ক'দিন আগেই বলছিলাম না বেয়াই, দিনকাল কেমন হয়ে গেছে?
-তার মানে মানুষ মানুষের জমি জায়গা দখল করবে, স্কুলের মতো পবিত্র একটা স্থাপনা পুড়িয়ে দিয়ে হিমাগার বানাবে, মানুষজনকে মারবে, ধরে নিয়ে যাবে মেয়েদের? এ কেমন নৈরাজ্য বলেন তো?
-আমার কিছু বলার নেই ভাই। খায়ের সাহেব মুখ ঘুরিয়ে বলেন, তাঁরও বেশ কষ্ট হচ্ছে এমন ঘটনা হজম করতে।
-আমি কিন্তু ছেড়ে দেবো না। বিচারের জন্য কোর্ট কাচারি যা করতে হয় করবো। ইমতিয়াজ জোর দিয়ে বলে।
-এটা তো একটা মাত্র ঘটনা নয় বেয়াই সাহেব। পত্র পত্রিকায় আমি প্রায় রোজ এমন ঘটনার বিবরন পড়ি। কষ্ট পাই মনে মনে। ভাবি, কি কারণে আমাদের দেশের মানুষগুলো এমন হয়ে গেলো? কোথায় গেলো বিবেক? কোথায় গেলো মানবতা?

মিলিকে সাহায্য করার জন্য বেয়ান উঠে গেলেন ভেতর বাড়ি। তারও ভালো লাগছিলো না একটুও। এই দেশে ছেলেরা থাকবে কেমন করে? মনে মনে

ভাবেন, ভালোই হয়েছে যে ছেলেরা বাইরে থাকে। এই প্রথম কথাটা মনে হলো তার।

ডাক্তার ঐ চারজনকে ফার্স্ট এইড দিয়েছেন। টিটেনাস ইঞ্জেকশনও দেয়া হয়েছে। সবারই গায়ে জ্বর। ইমতিয়াজ কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করতে বললেন ডাক্তারকে। ড্রাইভারের কোয়ার্টারে ওদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন ইমতিয়াজ। চলে গেলো ওরা। কি চেহারা হয়েছে ওদের? মনে হচ্ছে, ওরাই খুনি। কাপড়ে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ।

খায়ের সাহেব তার ড্রাইভারকে ডেকে নিউমার্কেট থেকে চারটে শার্ট, চারটে লুঙ্গি, চারটে গামছা আর চারজোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডাল কিনে আনতে বললেন। ইমতিয়াজ মুখ খোলার সময় পেলেন না। খায়ের সাহেবের দিকে তাকালেন চোখে চোখ রেখে। মানে, এটা কেমন হলো বেয়াই?
-আপনার কষ্ট তো আর ভাগাভাগি করতে পারবো না বেয়াই, কিছু একটা করতে দেন।
ইমতিয়াজ কথা বলে না। কথা জোগায় না মুখে।
-আমি বলি কি, যাই করবেন একটু ভেবে চিন্তে করবেন বেয়াই।
-আমি তো কেইস করবোই। এর মধ্যে আর ভাবনার কিছু নেই ভাই। ইমতিয়াজ বলেন।
এমন সময় একটা ফোন এলো। কর্কশ কণ্ঠে কে যেনো বললো, বাড়াবাড়ি করলে নির্বংশ কইরা দিমু কয়া রাখলাম।

ইমতিয়াজ ফোনটা খায়ের সাহেবের হাতে দিলেন। হ্যাঁ, হ্যালো, কে বলছেন?
-এহনো টের পান নাইক্যা?
-আপনি পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের বাসায় ফোন করেছেন তা জানেন?
-হ জানি। ঐ গেরামের একশো লোকের নামে মামলা দিসি। সেইডা সামলান আগে। আর হোনেন, গেরামের দিকে পা রাখলে কিন্তু কোবাইয়া পুইত্যা রাখুম। আমার নাম চাপাতি। পুলিশও জানে আমার নাম।

মুখ কালো হয়ে যায় খায়ের সাহেবের। ফোনের বাক্যগুলো থেমে থেমে বলেন ইমতিয়াজকে।
-তবুও কেইস করবো আমি। ইমতিয়াজ অটল। বলেন, দুলাইপুর গ্রামে আমার বাপ দাদার গায়ের গন্ধ পাওয়া যায় এখনও। সেই তাদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য স্কুল করেছি। দুর্বৃত্তরা সেটা করতে দেবে না? কিছুতেই হতে পারে না বেয়াই। আমি আবার স্কুল ঘর তুলবো। এর শেষ দেখে ছাড়বো।

-আমার শ্যালিকার সাথে কথা বলে নিতে চাই। মনে হয় সাবধানে কাজ করতে হবে। একটু সময় নিয়ে ভাবেন বেয়াই। ওরা খুব বাজে মানুষ। যে কোনো ক্রাইম করতে ওরা দুইবার ভাববে না।

মাসুম সকাল থেকেই শুনছে সব। সমস্ত ঘটনাটা ওর কাছে হিন্দি সিনেমার মতো মনে হচ্ছে। বিস্ময়ের অবধি নেই তার। এ কেমন দখলবাজি? ইচ্ছে হলো আর অন্যের সম্পত্তি দখল করে নিলাম? গতো দশ এগারো বছরের মধ্যে এতো পরিবর্তন হয়েছে দেশের?

উচ্চশিক্ষার হার বাড়ছে আর নিম্নদিকের ইতরামিও বাড়ছে।

একটা জিনিস স্পষ্ট মাসুমের কাছে। তা হলো, প্রচুর টাকা হয়েছে নগরের মানুষের। বোঝা যায়। অসংখ্য বড়ো বড়ো দোকান পাট হয়েছে। বেড়েছে সুপার মার্কেটের সংখ্যাও। খাবারের দোকানের তো সীমা সংখ্যা নেই। আর কোনোটাই ফাঁকা থাকে না। সব সময় চলছে কেনাকাটা আর খাওয়া। কোথা থেকে এতো টাকা আসে? তাদের তো এতো টাকা ছিলো না। এখনও নেই তার বাবার।

লোকে বলে কালো টাকার দাপটে লোকের চরিত্র বদলে গেছে। গ্রামেও তার প্রভাব পড়ছে। 'আরো চাই'-এর রোগে সবই করতে পারে ওরা। আর করবেই বা না কেনো? এই কয়দিনে বন্ধু বান্ধবেরা বললো, ঘাগু ঘাগু অপরাধীদের কোনো শাস্তি হয় না। সবাই পার পেয়ে যায় কালো টাকার জোরে। ফলে যার যা খুশি করছে। বিকল হয়ে বসে থাকে পুলিশ। তারা বদ লোক ধরতে পারে না। চিনতে পারে না। আর ধরলেও ছেঁড়ে দিতে হয়। পাপ, পাপী পাহারাদার, দখলদার, সাজাদার সব একাকার হয়ে গেছে।

এমন কি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও দুর্নীতির রমরমা বিচরন। মইন, মাসুমের বন্ধু বলেছিলো, অবৈতনিক সরকারি স্কুলে টিউশন ফিস নেই। কিন্তু খেলা, মিলাদ, নানা দিবস পালন এই নামে প্রতি মাসেই ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হয়। ফ্রি বইয়ের দাম নেয়া হয়। স্কুলে কোচিং নিতে বাধ্য করা হয়। ফলে স্কুল শিক্ষকরাও এখন ভালো টাকা কামায়।

বিশ্বাস করেনি মাসুম। বলেছে, তোরা সবাই সিক হয়ে গেছিস। আমরা তো এই দেশেই লেখাপড়া করেছি। তখন একটা আন্দোলন হয়েছিলো, নতুন ক্লাসে উঠলে আবার নতুন করে ভর্তি ফিস দেয়া নিয়ে। শুরু করেছিলো একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল।

মইন বললো, আমরা তো একসাথেই পড়তাম। বেশ মনে আছে কথাটা। কেস টেস হলো। বন্ধ হয়ে গেলো স্কুলটা। আরো যেনো কি কি হয়েছিলো। অবশেষে সেটাই তো এখন রীতি হয়ে গেছে।

-সত্যি রে মইন, আমরা কিছু করতে পারিনি।

-সেই 'পারিনি' এখন আরও বিশাল 'পারিনি' হয়ে গেছে। দুষ্টু লোকের দুষ্ট চক্র ভাঙতে কেউই আর পারছে না। রাজার চেয়ে প্রজা শক্তিশালী হয়ে গেছে এখন। তাতে মদদ দিচ্ছে রাজার কিছু পারিষদেরা। অন্যায় উপার্জনের কালো টাকায় ভরিয়ে দিচ্ছে সবার খাজাঞ্চিখানা। তুই আমি কে? কি করতে পারি আমরা? কেই বা শুনবে আমাদের কথা?

-এখানে পড়ে আছিস কেনো মইন? চলে যা না যে কোনো উন্নত দেশে, মাসুম বলে।

-তোর মতো অভিবাসী হয়ে? হাসে মইন, অতো টাকা পাবো কোথায়? তা ছাড়া সবাই তো দেশ ছেড়ে যেতে পারবে না ভাগ্যবানেরা ছাড়া।

-আমাকে টিজ করছিস?

-না রে। মনে অনেক দুঃখ। বুকে অনেক ব্যথা। বাবা রিটায়ার করেছেন। নিজেদের একটা বাড়ি নেই। বাড়ি ভাড়া দিতে হয় অনেক। গ্রামে গিয়ে মাঝে মাঝে মা বাবা থাকতেন। তা সেখানেও নাকি স্বস্তি নেই। গাছের ফলমূল পেড়ে নিয়ে যায়। বাগানের সবজি তুলে নিয়ে যায়। পুকুরের মাছ মেরে নেয়। কাউকে কেউ সম্মান করে না। বাবা পুরুষ মানুষ কষ্ট সহ্য করে। মা কান্নাকাটি করেন রীতিমতো। হাতে লাগানো গাছের ফল যার ইচ্ছে সে পেড়ে নেবে? সহ্য হয় না মায়ের।

-কি বলছিস এসব মইন? আমাদের গ্রাম তাহলে ভালো আছে বলতে হবে। কোনো ঝামেলার কথা শুনিনি এখনও।

-অন্তত একটা তো ভালো খবর দিলি।

এই তো পরশুদিন মইনের সাথে কথা হয়েছিলো। ঠিক তার দুই দিন পরে কি ঘটে গেলো তাদের গ্রামে। তার শ্বশুরের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। শাশুড়িও বিমর্ষ হয়ে আছেন।

সাত

নিরা আর মাসুম চলে গেলো সবাইকে ঐ অসহায় অবস্থায় রেখে। মাসুমের চাকরির জন্য যেতেই হলো। সারাটা পথ নিরা মন খারাপ করে থেকেছে। বুকের ভেতর সব যেন গুড়ো গুড়ো হয়ে যাচ্ছে। বাবার এতো কষ্টের টাকার জন্য নয়, তাঁর আদর্শের অপমৃত্যু দেখেই কষ্ট পাচ্ছে নিরা। ছোটো থেকেই দেখেছে বাবাকে। কি অসাধারণ ভালো মনের একজন মানুষ। তার কপালে কেনো এমন কান্ড কারখানা ঘটবে?

কানাডায় ফিরেও খারাপ খবর। সোরায়া আর রাহিম পাহাড়ি রাস্তায় ড্রাইভ করার সময় একসিডেন্ট করে দু'জনেই পড়ে আছে হাসপাতালে। খুব বেড়াতো ওরা। সুখি জুটি। উইকেন্ড এলে পাখির মতো উড়ে যেতো যেখানে মন চায়। কিন্তু কি থেকে যে কি হয়, কে বলতে পারে? দুজনেই ভালো গাড়ি চালায়। লং ড্রাইভে যায়। ফিরতে দেরি হবে বুঝতে পারলে থেকে যায় কোনো হোটেলে। সেদিন কি হলো, একদিনেই তারা লম্বা পথ ড্রাইভ করে বাসায় ফিরতে চেয়েছিলো। হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো শেষ দিকে। হয়তো কনসেন্ট্রেশন থাকছিলো না। অথবা দৈব ডাক দিয়েছিলো। তার ফাঁদে তো পড়তেই হয় মানুষকে। পুর্ব নির্ধারিতকে যে বিশ্বাস করে সে করে। আর যে করে না সে করে না। ঘটিতব্যের কোনো পরিবর্তন হয় না তাতে।

মশিউর সবারই বড়ো ভাই বলে দায়িত্বও বেশি। কাউকে দিতে হয় না, সে নিজেই কাধে নেয় ভার। বারো ঘাটের পানি খেয়ে যে ছেলেটা এলো টরেন্টোতে সে নাকি হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেছে। তাই মশি ভাইয়ের চিন্তার অবধি নেই। বাবলু বলে, হয়তো বাড়ি গেছে। ভাবছেন কেন? এসে পড়বে। কিংবা দেখেন গিয়ে কুইবেক গিয়ে বসে আছে।

-তোমরা কি বলো আর না বলো? কুইবেকে কে আছে যে ওখানে যাবে?

-ওর এক্স ফিয়াঁসে আছে না?

-সে ওর জন্য বসে ধ্যান করছে। রেগে যায় মশিউর। ওর জন্য একটা চাকরি ঠিক করেছিলাম। কালই জয়েন করতে হবে তাবরিজকে। আমি অস্থির সেজন্য।

-ও তো কারো কথা শোনে না। বলেছিলেন দাড়ি মোচ বাবরি চুল কামাতে। সে তো এখনো তালিবান সেজেই আছে।

-কবে লাস্ট দেখেছো? মশিউর চঞ্চল হয়ে ওঠে।
-দিন চারেক আগে ম্যাকডোনাল্ডের বাইরে দাঁড়িয়ে বার্গার খাচ্ছে।
-ওখানেই ওর চাকরি ঠিক করেছি। আসলে গাধাকে ঘোড়ার ভালোবাসতে নেই। তাহলে খচ্চর পয়দা হবেই।
এমন উদ্ভট কথা বলেই থাকে মশিউর। বাবুল হাসে শব্দ করে।
-তাবরিজ একাই ছিলো, না আর কেউ ছিলো ওর সাথে?
-তালিবান মার্কা দু'তিনজন আরো ছিলো।
-ঠিক যা ভেবেছি তাই। একা একা কথা বলে মশিউর। ওদের সাথে যেনো মেলামেশা না করে সে জন্য মশি ওকে সাবধান করে দিয়ছিলো। প্রচন্ড হতাশায় ভোগা ছেলেরা সহজেই ভজে যায় বেহেশতে যাওয়ার কথা শুনলে। কি আর করা? ওর কপাল। নির্ধারিত ভবিষ্যতেরই জয় হলো! এরা আসলে বোঝে না কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। কিন্তু বিশ্বাস করে ভুলটাকে। রাহিম আর সোরায়ার দুর্ঘটনার জন্য কব্জা থেকে বেরিয়ে গেলো ছেলেটা। সময় দিতে পারলো না সে।
-কি হলো মশি ভাই? কিছু ভাবছেন?
-তাবরিজের কথাই ভাবছি। আরো একটা চেনা ছেলে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে কয়েক মাস আগে। তাকে আমি ভালো করে চিনতাম না।
-কোথায় যায় এরা ভাই?
-বেহেশতের ধান্দায়। নিরাসক্ত ভাবে বলে মশিউর।
-মানে?
-নতুন দর্শন গ্রহন করে। আইত্রিস-এ যোগ দেয়। ওদের বিচারে কাফির মারলে সোজা বেহেশত। দুনিয়াটা এক আজব জায়গা। এতো বয়স হলো, কিছুই বুঝতে পারি না এখনও। পাগলা হয়ে গেছে দুনিয়া। শান্তি ভালো লাগে না কারো।
-বাদ দেন তো মশি ভাই। আমি তো আরোই বুঝি না।
-বাদ তো দিতেই হবে। চেষ্টা করলাম ওকে স্বভাবিক জীবনে রাখতে। কিন্তু পারলাম না। মৃত্যু এদের টানে চুম্বকের মতো।
-হাসপাতালের খবর কি ভাই? প্রসঙ্গ পাল্টায় বাবুল।
-একই রকম। সোরায়ার জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তার মনে করছে, ও নাকি কোমায় চলে যাচ্ছে।
-আর রাহিম?
-ও ভালো আছে। কিন্তু হাসপাতাল ওকে ছাড়ছে না। সোরায়াকে দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে রাহিম।
বাবলু বলে, কি আজব মানুষের জীবন মশি ভাই!

-সোরায়া যে এখনও ক্যারি করছে, এতে ডাক্তারেরা অবাক হয়ে গেছে। ডাক্তারদের ধারণা বেবিকে ওরা বাঁচাতে পারবে। কিন্তু ওর যদি আর জ্ঞান না ফেরে, তাহলে রাহিমের কি হবে? মশি বিষাদমাখা কণ্ঠে বলে, আমি বাচ্চার জন্য ভাবছি না। ভাবছি রাহিমের কথা। বিশ্ব এতিম হয়ে যাবে ও।
-সত্যি বলেছেন। ওরা ছিলো পায়রার মতো জোড় বেঁধে।
-কাশ্মির থেকে পালিয়ে এসেছিলো নতুন করে বাঁচবে বলে। কি বলি, বলো? ওপরওয়ালার দাবা খেলা বোঝে সাধ্য কার? ও হ্যাঁ, মাসুম তো মোটামুটি রেগুলার ডিউটিতে। আজ ও আসেনি। কে জানে ওর শ্বশুর বাড়ির ঝামেলায় হয়তো আপসেট আছে। কথাও হয়নি।

মশির অনুমানই ঠিক। দখল বাজেরা উল্টো মামলা করে গ্রামের বহু লোককে থানা পুলিশ করাচ্ছে। খায়ের সাহেবের শ্যালিকা তানিয়া খান ডেপুটি পুলিশ কমিশনার হয়েও কোনো সাহায্য করতে পারছে না। স্থানীয় থানার ওসি এসপি সবাই যেনো পাকাল মাছ। সব সময় এড়িয়ে যাচ্ছে ঢাকার তলব।

মিলি কিছুতেই ইমতিয়াজকে গ্রামে যেতে দিচ্ছে না। ভেল্কি বাজির মতো ধাঁ ধাঁ করে উঠে যাচ্ছে হিমাগারের বিল্ডিং। কেউ কিছুই করতে পারছে না। দিনে দুপুরে ওরা চাপাতি লাঠি নিয়ে ঘোরে। প্রাণ দেয়ার জন্য কে যাবে বাধা দিতে ওদের কাজে? কানাডা থেকে ফোনে নিরা বার বার একটা অনুরোধই জানায়, বাবা যেন না যান গ্রামে। যা গেছে তা গেছে। ধরে নেবো যে, আমাদের বাপ দাদার ভিটে ছিলো না।

স্কুলের শোক কিছুতেই ভুলতে পারে না ইমতিয়াজ। গ্রামে যেতেও পারছে না। প্রতিপক্ষের সংখ্যা বেশি। অপশক্তি বেশি। শয়তানি বুদ্ধি বেশি। ওদের সাথে একা যুদ্ধ করা যাবে না। মানুষের শেষ আশ্রয় আইন। মাধ্যম হলো আইন শৃঙ্খলার লোকজন। তাদের ওপর ভরসা নেই। এতিমের মতো অবস্থা হয়ে গেছে তার।

প্রায় প্রায় গ্রামের ছেলেদের ধরে থানায় নিয়ে যায় দখলবাজদের দল। মারধোর করে। মিথ্যে কেস দেয়। জামিনের জন্য টাকা চায় অনেক। টাকা না দিতে পারলে চালান দেয় কোর্টে। হয়রানির একশেষ গ্রামবাসির। একবার হেডমাস্টারের ছেলেকেও ধরে নিয়ে যায় মিথ্যে কেস দিয়ে। কোর্টে চালানও দিয়েছিলো। অনেক ঝামেলা আর টাকা পয়সা খরচ করে ছেলেকে নিয়ে আসে মাস্টার।

গ্রামের যুবক ছেলেরা অতিষ্ট হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়। কিন্তু কি ভাবে? কোথায় যাবে? কয়েকজন সুযোগ পেয়েও গেলো। চোরা পথে বিদেশে

নিয়ে যাওয়ার দালাল গ্রামেও ঘোরাঘুরি করে। কীভাবে কীভাবে যেনো যোগাযোগ হয়েছিলো তাদের সাথে হতাশ যুবকদের কারো সাথে। এই সুযোগ তারা ছাড়তে চাইলো না। যা থাকে কপালে, চলে যাবে দেশ ছেড়ে। এখানে কাজ নেই, আশা নেই, লুকিয়ে চুরিয়ে অত্যাচারীর হাত থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে চলে যাওয়াই ভালো। জন্মভূমির মাটি থেকে আর জীবন রস নিতে পারছেনা তারা। প্রতিদিন মরছে তিলে তিলে।

নৌকোয় করে দালালের সাথে গোপনে রওনা দিয়েছিলো গ্রামের একদল ছেলে। তাদের নিয়ে যাওয়া হবে মায়ানমার হয়ে থাইল্যান্ডে। দালাল আশা দিয়েছিলো, সেখানে গেলেই চাকরি পাবে। এইটুকু কথার মধ্যেই ওরা পেয়েছিলো ফুসফুস ভরা বাতাস। অসহায় মানুষ বাঁচার জন্য খড়কুটোটাও আঁকড়ে ধরে পরম আশ্বাসে। জীবনের তো একটা মাত্রই দাবি। সেটা হলো, বেঁচে থাকা। তারই সন্ধান দিয়েছিলো দালালেরা।

উত্তাল সাগরের বুকে ছোট দুটো নৌকোয় গাদাগাদি ঠাসঠাসি করে মানুষ বসেছে। সেকি অথৈ দরিয়ার পানি! কুল নেই কিনার নেই। চারপাশে শুধু কালো কালো থৈ থৈ করা পানি। একটানা শব্দ ছল ছল ছলাৎ ছল নয়। মানে, শব্দটা নদীর মতো নয়। কেমন ভারি গলগলে আর দাপুটে। ভয়ে বুকের ভেতর পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। বুঝতে পারে সবাই, ভয়ের থাবার মধ্যেই ঢুকে আছে তারা। প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা হয় ভাসছে তারা। কথা ছিলো কিছু খেতে দেবে নৌকোতে ওঠার পর। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই। খাওয়া নেই। পানি নেই। পানির ওপরেই আছে তবু পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে। মনে শুধু একটা আশা নিয়েই তারা চুপ করে বসে আছে। ভাবছে, গন্তব্যে পৌঁছোলে সব হবে। কাজ হবে। খাওয়া হবে। জীবন যাপনের নিত্য দুঃসহ জ্বালা থেকে বাঁচবে।

অনেকেই প্রশ্ন করেছে, আমাদের ওস্তাদ কই? মানে দালাল কোথায়? প্রশ্ন করা মানে পরস্পরের মধ্যে জানতে চাওয়া। কেউ জানে না উত্তর। এক সময় মাঝি বলে, আইত্যাসে আর এক নৌকায়। আরও কিছু লোকও আসবো হুনছি। তয় আপনেরা ডরায়েন না। আপনাগো উস্তাদ পাকা মানু। কতো মানুষ পার করলাম। নিচ্চিন্তে বইসা থাকেন। লুরালুরি কইরেন না বেশি। দরিয়ার পুলিশগুলান বড্ডা হারামি। ঘোর আন্ধার রাইতেও ওগো চোখ জ্বলে বিলাইয়ের মতো। উরা দ্যাখলে বিপদ আছে বাইসব।

সাগরের উথাল পাথাল ঢেউয়ের নাচনে বসে থাকার যো আছে? ছোটো নৌকোতে গতি নেই বেশি। তার ওপর রাতের গাঢ় আঁধার। কোন দিকে যে

নৌকো যাচ্ছে, কিছুই বোঝা যায় না। আকশের তারাগুলো আস্তে আস্তে ঢেকে গেলো। মনে হয় মেঘ জমেছে। আর দেখা যায় না আকাশের তারার খুব মৃদু ঝিকিমিকি। মাথার ওপরে কালো আকাশ। নৌকার নিচে কালো দরিয়ার পানি। নৌকা তো কালোই। মেটে রঙের মানুষগুলোকেও লাগছে কালো কালো মুর্তির মতো। সারা দুনিয়াটাই কেমন কালো কালো হয়ে গেলো। মাঝি বলে, সামাল সবাই। ঝড় আইত্যাসে মুনে লয়।

কপাল মন্দ হলে কেউ বাঁচাতে পারে না মানুষকে। দৈবের কাছে চিরকালই মানুষ পরাজিত হয়েছে। বাতাস উঠতে না উঠতেই বেগ বাড়লো। বাতাস তো নয় যেনো ঝাপ্টা মারছে নৌকো আর মানুষগুলোকে। বাতাসের সাথে যোগসাজস করে লাফিয়ে উঠলো ঢেউয়ের মাথাগুলো। দু'তিনবার ওঠা নামা করেই উল্টে গেলো দুটো নৌকোই। ডুবে গেলো শক্ত কাঠের যান মোচার খোলার মতো। আহারে মানুষ! নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত মাপের দেহ। বিশাল দরিয়ার বুকে তলিয়ে যেতে এক মিনিট সময়ও লাগে না। রাক্ষুশে দরিয়ার পেটে এক লক্ষ্য মানুষও কিছু না। নাম পরিচয়-হিন মানুষগুলোর স্থায়ী অভিবাসন হলো পাতালে।

মাছ ধরা ট্রলারগুলো কয়েকটা ভাসমান লাশ উদ্ধার করেছিলো সকালে। পত্র-পত্রিকায় খবর বের হলো। লাশ তুলে রাখা হলো কক্সবাজারে। পত্র পত্রিকায় ছবি ছাপা হলো লাশগুলোর। কেউ জানে না কতোজন মানুষ ছিলো নৌকোয়। তার মানে, কতোজনের সলিল সমাধি হয়েছে তার হিসেব নেই। তবে একটা কথা ঠিক, থাইল্যান্ডে অভিবাসন হয়নি কারোই।

হাহাকার পড়ে গেলো গ্রামে। অনেকের ছেলেকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ কান ও কান হয়ে কিছু কথা তো জানাজানি হয়েছিলোই। অনেকের যুবক ছেলে বিদেশে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলো বাড়ি থেকে, তাও জানা গেলো। খবর পাওয়া গেলো, ইমতিয়াজের স্কুলের হেডমাস্টারের ছেলেও তার মধ্যে ছিলো। তবে যে সব লাশ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সে নেই।

বাকি লাশের কোনো দাবিদার এলো না। তিনদিন অপেক্ষা করে অজানা বাবা মায়ের বুকের ধনকে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে দাফনের জন্য দেয়া হলো 'আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম'কে। মানুষের শেষ অভিবাসনের জায়গায় আড়াই হাত মাটির নিচে রেখে এলো তারা লাশগুলো। আত্মীয় স্বজন কেউ জানলো না ওদের কথা।
কেউ দেখলো না। কেউ কাঁদলো না।

খবর তো গোপন থাকে না। ঢাকায় ইমতিয়াজের বাসায় চলে এলো খবর। একটা নয় দুটো খবর। একটা শোকের। অন্যটা আনন্দের। হিমাগার তৈরি হয়ে গেছে। তার উদযাপন হচ্ছে গরু-খাসি জবাই দিয়ে খানা পিনার মধ্য দিয়ে। বুঝতে পেরে গেছে ইমতিয়াজ, স্কুল আর সে করতে পারবে না। হিমাগার উড়িয়ে দিয়ে উদ্ধারও করতে পারবে না বাপ দাদার ভিটে। তবুও প্রতি নিঃশ্বাসে তার আয়ু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। এতো বড়ো অন্যায় মেনে নিতেই পারছে না সে। সারাক্ষণ কেমন করে বুকের ভেতর।

খায়ের সাহেব অনেক বোঝান। মিলি বোঝায়। কানাডা থেকে মাসুম আর নিরা বোঝায়। কিন্তু বোঝা আর মেনে নেয়া এক কথা নয়। খায়ের সাহেব তুলনা দিয়েছেন ইসরায়েল আর ফিলিস্তিনের। পাখি শিকারের মতো মানুষ মারা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে। সেই অন্যায়ের কোনো বিচার কি হচ্ছে? আসলে এই পৃথিবীতে সব অন্যায়ের বিচার হয় না। সেটা জানা বোঝা আর মেনে নেয়া কি এক হতে পারে?

-এতোকাল আমরা কি লেখাপড়া করলাম? কেনো শিখেছিলাম যে, অন্যায় করলে তার সাজা অনিবার্য? বলেন ইমতিয়াজ।

-হয়তো হয়ও। আমরা বুঝতে পারি না। তবে মানুষ একটা ইকুয়েশন করে নেয় বেয়াই সাহেব। আমাদেরই এক শরিক তার আপন ভাইকে খুন করায়। উদ্দেশ্য, তার সম্পত্তি দখল করা। করেওছিলো। কিন্তু কি হলো? তার সংসার যখন ফুলে ফসলে ভরে উঠেছিলো, তখন মহামারির আকারে গ্রামে এলো কলেরা। সাতদিনের মধ্যে তার পরিবারে সাতজন মারা গেলো। সেটা কি তার শাস্তি হলো না?
-এটা তো কাকতালীয় ব্যাপার খায়ের ভাই। সেই কলেরায় নিশ্চয় আরো অনেক লোক মারা গেছে।
-অবশ্যই। কথাই তো আছে, একের পাপে দশের সাজা। দেখবেন, একদিন ঐ দখলবাজদেরও সাজা হবে। ওপরে একজন আছে না?
-আপনার কথা শুনলে স্বান্ত্বনা পাই আমি। চেয়েছিলাম পুর্বপুরুষের নামে কিছু রেখে যেতে। সেটা পারলাম না আর কি। এখানকার কথা রেখে ঢেকে বলে নিরাকে। কিন্তু বিবিসি বেয়ান কানাডার ওয়েবে বিস্তারিত জানিয়ে দেন দুঃখের খবরগুলো।

ইমতিয়াজ যেখানে চোখের চিকিৎসায় একবেলা ফ্রি কাজ করে। তাদের মালকিন খুব অসুস্থ। বয়সও হয়েছে। কাজের লোকজন নিয়ে থাকা কেউ আর পছন্দ করছে না। চার ছেলেমেয়েই আমেরিকায় থাকে। তারা মাকে বলছে সেখানে চলে যেতে। বাধা হলো দোতলা বাড়িটা।

খায়ের সাহেব শুনে বললেন, বেচে দেবে। সমস্যা কোথায়?
-আছে খায়ের ভাই। যাত্রাবাড়িতে ছোটো একটা মুদিখানার দোকানের আয় থেকে চার ছেলেমেয়ে মানুষ করেছে তারা। ঝুপড়ি বাড়িকে করেছে দোতলা। সেই বাড়ির প্রতি ইটে লেগে আছে তার স্বামীর শ্রম আর ঘামের দাগ। সেই নমুনা রাখতে চায় মহিলা।
-তাহলে কোনো প্রতিষ্ঠানকে দান করে যাক। যে তার স্বামীর নামে কিছু গড়ে তুলবে। তবে ছেলেদের মতো হবে কি না সেটাই কথা।
-ছেলেমেয়েদের সাথেও কথা বলেছে মহিলা। তারা সবাই এখন রাজার হালে আছে। এখানকার সম্পত্তি দরকার নেই তাদের।
-তাহলে তো ভালোই হলো বেয়াই।
-মহিলা চায়, আমি ওখানে একটা চোখের ক্লিনিক করি।
-সেতো মস্ত খরচের ব্যাপার। বাড়ির দামই তো অনেক।
-বাড়িটা সে দান করতে চায়। স্বামীর নামে ক্লিনিক হবে, এটাই তার একমাত্র চাওয়া। খায়ের ভাই, সাধারণ মানুষের মধ্যেও কতো যে মহৎ প্রাণ আছে, আমরা তার খবর জানি না।
-কথা সত্যি বেয়াই। তো কাকে দান করবে কিছু ঠিক করেছে?
আর সেই ক্রেতা যে আপনাকে ক্লিনিক করতে দেবে তারই বা ভরসা কি?
-বাড়িটা আমাকেই দান করতে চেয়েছে মহিলা।
-এক্সেলেন্ট। আপনার একটা এই রকম কাজ দরকার ছিলো বেয়াই।
-মহিলার কথা হলো, প্রায় আট বছর হলো সে আমাকে দেখছে। তার মনে হয়েছে, আমিই তার ইচ্ছে পুরন করতে পারবো।
কিন্তু বিষয়টা জটিল হয়ে গেছে পুরনো এক ভাড়াটিয়ার জন্য।
-সে আবার কি রকম বেয়াই?
-বাড়িটা সে কিনতে চায়। ওখানে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং বানাবে সে।
-এই এক মুশকিল। মানুষ শুধু টাকা চায়। মানুষ নগন্য হয়ে গেছে।
-শুধু এইটুকু হলে তো কথা ছিলো না। সেই লোক মহিলার সাথে দেখা করে তার ইচ্ছে জানিয়েছে। মহিলা বলেছে, সে বাড়ি বিক্রি করবে না।
-মেনে নিয়েছে সে?
-না, মেনে নেয়নি। বলেছে, আমার কাছে পাকা খবর আছে যে, আপনি আমেরিকা চলে যাবেন।
মহিলা বলেছে, সেখানে বেড়াতে যাবো। তখন সে বলেছে, আপনি তো বাড়িটাকে আপনার স্বামীর নামে ক্লিনিক করার জন্য ডাক্তার ইমতিয়াজকে ভার দিয়ে যাবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

মহিলা বলেছে, এই নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না আপনার সাথে। বরং আমি বলছি, সব ভাড়াটিয়া উঠে যাক। আমি আর বাড়ি ভাড়া দেবো না।

এই নিয়ে দু'চার কথা হয়েছে। পাড়ার লোক বলে, ভারি বজ্জাত ঐ লোক। সে নাকি অনেক দিন থেকেই ধান্দা করছিলো ঐ বাড়ি দখল করতে বা নাম মাত্র দামে কিনতে। সম্প্রতি অনেক টাকা হয়েছে তার। কি করে, তা কেউ জানে না।

-সবখানেই যদি সম্পত্তির গন্ধ পেলে মানুষ হামলে পড়ে, তাহলে ভারি বিপদ তো। আপনি এখনও সাপ্তাহিক ফ্রি ট্রিটমেন্ট করছেন?

-নিশ্চয় করছি বেয়াই সাহেব।

-আপনিও তো বিপদ ঘটাতে পারেন বলে মনে হচ্ছে ভাই।

-আমি আবার কি বিপদ ঘটাবো? আমি তো কারো সম্পত্তি চাই না। কিছু দিতে চাই দেশের মানুষকে। তবে ক্লিনিক করার ভার পেলে আমি খুশি হতাম। কাজটা আমার পছন্দের। বেশ মঙ্গল বটে।

-আমিও তাই মনে করি বেয়াই। আপনার ডেডিকেশন সে বুঝতে পেরেছে। মানুষ তো বটেই, পশুপাখিও ভালো মানুষ চিনতে পারে।

-ভালো মন্দ জানি না ভাই। মানুষ আসলে চাইলেই অন্যের উপকার করতে পারে নিজের উদবৃত্ত দিয়ে। আমিও তো তাই চেয়েছিলাম খায়ের ভাই গ্রামে স্কুল করে।

-সত্যি কথা বলেছেন বেয়াই।

-আসলে আমি কতোটুকু আমার? প্রয়োজনই বা কতোটা আমার? এই একটা কথা ভাবলেই অনেক কমে যায় ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তা।

-আপনার মতো করে কয়জন ভাবে বলেন? বেয়ান কি বলছেন?

-মিলি খুশি হয়েছিলো শুনে। তারও ধারণা, এই রকম একটা কাজ আমার জন্য দরকার। কিন্তু সেদিন যখন ফ্রি ট্রিটমেন্ট করার চেম্বারে তালা লাগানো দেখে ফিরে এলাম, তারপর থেকে অন্য সুরে গাইছে সে। বলছে, আর কোনো ঝামেলার মধ্যে তুমি নিজেকে জড়িও না।

বিবিসি বেয়ান এই সব কথা নিরাকে বলেছে। ফোনে সে কি কান্নাকাটি মেয়ের। তারও এক কথা, আর কোনো ঝামেলার মধ্যে তুমি জড়িও না বাবা। তোমার কিছু হলে আমি মরেই যাবো।

কথা বলে, নানু, তুমি চলে এসো আমাদের কাছে।

-ঘর পোড়া গরু যে আমরা। আমারও তো এখন দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কেমন একটা আগ্রাসি পরিবেশ গড়ে তুলেছে লোকটা।

-দেখা যাক খায়ের ভাই। ভালো কথা, ছেলেদের খবর কি? ইমানের পড়া শেষ হতে আর কতো দেরি?
-বেল পাকলে কাকের কি লাভ বেয়াই?
-মানেটা কি হলো? বুঝলাম না ভাই।
-হেসে বললেন, পাস-টাস করে ও তো আর দেশে ফিরবে না, তাই বললাম প্রবাদটা।
-তেমন কিছু বলেছে কি?
-স্পষ্ট তার মাকে জানিয়ে দিয়েছে, পাস করে সে ওখানেই চাকরি করবে। ওখানেই ঘর বাঁধবে ভিনদেশি মেয়ের সাথে।
-কোন দেশের মেয়ে সে?
-মালয়েশিয়ার। তবে ওর বাবা ইহুদি ছিলো। সে চলে গেছে নিজের দেশে। মা কুয়ালালামপুরের।
-বেয়ান কি বলছেন?
-বলার কিছু নেই বেয়াই। এখন যা ঘটবে, সবই মেনে নিতে হবে। আকু পাকু করে কোনো লাভ নেই। পূর্বনির্ধারিত সব। আমরা জানতে পারি না আগে থেকে এই যা।
-আমাদের চেনা জগতটা এমন ভাবে বদলে গেলো কি করে তাই ভাবি বেয়াই। একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ইমতিয়াজ।

দিন তো কেটেই যায়। ভালোতেও যায়, মন্দতেও যায়। সহস্র জটিলতা, কুটিলতা, কলুষতা, আবিলতা, দাঙ্গা, মারামারি, খুনোখুনি রাহাজানি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, ধান্দাবাজিতে মানুষের জীবন যখন ওষ্ঠাগত, তখনও এক সেকেন্ডের জন্য থেমে থাকে না এই গ্রহের উন্মাতাল ঘুরে ঘুরে ছুটে চলা। থেমে থাকে না চন্দ্রকলার দুই পক্ষের লীলা। নিয়ম করে আসে অমাবশ্যা। নিয়ম করে আসে পূর্নিমা। তারই মধ্যে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের উৎসব এবং শোক ফিরে ফিরে আসে ঘরে ঘরে।

গ্রামের স্কুলটার ব্যাপারে আর কোনো কথা বলেন না ইমতিয়াজ। বুকের ভেতর পাথর চাপা দিয়েছেন। অন্যায় অপশক্তির কাছে এমন নিপাট অসহায়ত্ব তাকে কুরে কুরে খায়। একটা ক্লিনিক গড়ে তোলার কাজ পাবে জেনে বেশ খুশি হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কি হবে বোঝা যাচ্ছে না। পরিণত বয়সে জীবনে স্বস্তি শান্তি যখন বেশি দরকার, তখন যদি সব কিছু এলেবেলে হতে থাকে, তাহলে কেমন লাগে? ঘাটে ঘাটে কোনা কাঞ্চিতে বিষাক্ত পোকা মাকড় কি নিপুন ভাবে ওৎ পেতে থাকে! সুযোগ পেলেই বিষদাঁত বের করে কামড়ে ধরে।

মহিলা একদিন ফোন করে বললো, ইমতিয়াজ ভাই আপনি আর আসেন না যে ফ্রি চিকিৎসা দিতে?
-কি করে যাবো বলেন?
-কেউ কিছু বলেছে কি?
-বলেনি। করেছে।
-কে? কি করেছে?
-কে তা জানি না। তবে চেম্বারে তালা দিয়ে রেখেছে। যাতে আমি ওখানে বসতে না পারি।
-কেউ বলেনি তো আমাকে? খুব খারাপ কথা তো!
-ভেবেছিলাম আপনাকে জানাবো। পরে ভাবলাম, আপনি তো জানতেই পারবেন কথাটা।
-আহা, আমাকে একটা ফোন করতেন! ঠিক আছে, কাল আসেন। আমি দেখছি কি হয়েছে? আমার দারোয়ান কেনো বলেনি আমাকে? সেটা তো আজই দেখবো। কথা বলতে বলতে মহিলা কাশছিলেন।
-আপনার কি শরীর খারাপ? অন্তরঙ্গ কণ্ঠে জানতে চায় ইমতিয়াজ।
-আজকাল প্রায় কাশি হচ্ছে। একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়।
-ডাক্তার দেখান। অবহেলা করলে তো চলবে না।
-দেখাবো দেখাবো। জীবনের শেষ কাজটা করে নিতে চাই। সেটাই এখন একমাত্র চিন্তা। কিন্তু কি দেখেন, যতোই এগোতে চাই, ততোই দেরি হয়।

পরদিন ইমতিয়াজ যান যাত্রাবাড়ি। তার ফ্রি ট্রিটমেন্টের দিনও ছিলো। বাড়ির কাছে গিয়ে দেখে, মহিলা অন্য ভাড়াটিয়ার কাজের ছেলেকে বলছে তার দারোয়ানকে খুঁজে আনতে। চেম্বারে এখনো তালা দেয়া। সকালে বলেছিলো দারোয়ানকে তালা খুলে রাখতে। কিন্তু তারই পাত্তা নেই এখন। এটা কাকতালীয় না উদ্দেশ্যমূলক, সেটাই বুঝতে পারছে না মহিলা। ওপর তলার অসভ্য পুরনো ভাড়াটিয়াও বাসায় নেই।
ইমতিয়াজকে দেখে মহিলা বললো, দেখেন তো ডাক্তার বাবা, তালা খুলে না দিয়ে দারোয়ানটা যে কোথায় গেলো?

কি বলবে ইমতিয়াজ। সে বুঝতে পারছে, উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই দারোয়ান হাওয়া হয়ে গেছে। বেশ বুঝতে পারছে, আসল কলকাঠি নাড়ছে কে।

কিন্তু কিছুই বলতে চায় না। মিলি সাবধান করে দিয়েছে, কোনো বিবাদে জড়াবে না। কোনো কথাও বলবে না কারো পক্ষে বা বিপক্ষে। মুখ খুললেই নাকি গুম হয়ে যায় লোক আজকাল। পরিবেশ বদলে গেছে একেবারে। আগের মানুষদের আর চেনা যায় না। কি বিশ্রী অবস্থা!

ফিরে এলেন ইমতিয়াজ। তবে মহিলার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করে এলেন। বড়ো ছেলেকে ডেকেছে মহিলা। বাড়ি এবং জমির দানপত্র লেখা এবং রেজিস্ট্রি করার কাজ একেবারে কম নয়। শিক্ষিত ছেলে বুঝে শুনে কাজগুলো করে দিক। তারই সাথে চলে যাবে আমেরিকা। একা থাকাটা এখন আর নিরাপদ মনে হয়না তার কাছেও।

পুরনো ভাড়াটিয়া লাপাত্তা হয়ে থাকলে বলার কিছু নেই মহিলার। কিন্তু তার বেতনভূক্ত দারোয়ান গেলো কোথায়? সারাদিন খোলা থাকে গেটের দরজা। নিজে এসে তদারকিই না করলে অন্য ভাড়াটিয়ারাও গরজ করে না। হয়তো সারারাতই হা হা করে খোলা রইলো দরজা। সেটা কারো জন্যই নিরাপদ নয়।

ইমতিয়াজ খুব দমে গেছেন। গ্রামের ব্যাপার একটু অন্যরকম। ভিলেজ পলিটিক্স বরাবরই ছিলো। গ্রামের মাতব্বরদের দাপটকে সবাই ভয় করতো। মতান্তর বা কোনো কারনে শত্রুতা হলে দু একটা খুব খারাপি বা ঘর পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটতো। কিন্তু এখনকার মতো দুঃসাহসিক কাজকর্ম তখন কি ছিলো? সাহিত্যে পড়েছে, গোসল সেরে ভেজা কাপড়ে রানির ঠাণ্ডা লাগছে তাই তাপ সৃষ্টির জন্য গ্রামে সবার খড়ের ঘরে আগুন দেয়া হয়েছে। সে তো গল্প কাহিনি।

ধরেই নেয়া হয়, নগরের মানুষ শিক্ষিত সভ্য এবং শালীন। যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে ঢাকা নগর। যেখানে ভালো রাস্তাই ছিলো না, সেখানে বড়ো বড়ো দালান উঠেছে। রাস্তাঘাট হয়েছে। কিন্তু আচার আচরণে গ্রামের ছোঁয়া দেখা যায়। সেই জটিলতা, কুটিলতা, ধান্দাবাজি এখানেও আছে। পার্থক্য এই যে, সহজে বোঝা যায় না।

মহিলার দারোয়ান আর এলোই না। সবাই হৈ চৈ শুরু করে দারোয়ান নেই বলে। নিরাপত্তার ব্যাপার বলে কথা। নতুন এক দারোয়ান আনলো মতলববাজ পুরনো সেই ভাড়াটিয়া আজমত আলি। মহিলার সাথে কথা বলে তাকে নিয়োগ দেয়াও হলো। কিন্তু দারোয়ান আব্দুলকে মহিলার তেমন একটা পছন্দ হয়নি। কতোই আর বয়স হবে? বছর চল্লিশেকের মতো। কানে কম শোনে। চোখে ভালো দেখে না। সে না হয় চশমার ব্যবস্থা করা যাবে। ডাক্তার ইমতিয়াজের চেম্বার আবার চালু হয়েছে। তাকে দিয়ে করানো যাবে। কিন্তু কানের কি ব্যবস্থা করা যাবে?

মুশকিল হলো মালকিন মহিলার। ডাকতে ডাকতে গলা শুকিয়ে গেলেও সে শুনতে পায় না। ফলে তাকে ডাকার জন্য বেল সিস্টেম করতে হলো। কেউ কেউ বলে, গ্রামের মানুষ এমনিতেই কানে কম শোনে। কারণ পুকুরে গোসল

করার সময় কানে পানি যায়। কখনও পেকে যায় কান। ব্যথা হয়। পুঁজ হয়। চিকিৎসা করার সাধ বা সাধ্য কোনোটাই নেই। লতা পাতার রস দিয়ে গ্রামীন ভেষজ চিকিৎসা করে। ভালোও হয়ে যায় এক সময়। আর এই রকম তো একবার হয় না। এই ভাবে ওদের শ্রবন শক্তি কমে যায়। আসলে এটা কোনো গল্প নয়। বাস্তবতা তাই বলে। কিন্তু নতুন দারোয়ান কিছু বেশি ঠসা। মানে বয়রা।

কয়েকদিনের মধ্যেই মালকিন লক্ষ্য করলো, একমাত্র পুরনো ভাড়াটিয়া ডাকলে আব্দুল তার ঘর থেকে ধড়মড়িয়ে বের হয়ে আসে। আর আসে তিনবার বেল বাজালে। এটা নিয়ে ছেলের সাথে কথা হয়েছে মহিলার। সে বলে এটাও একটা ষড়যন্ত্র তোমার বিরুদ্ধে মা। ওকে বিদেয় করে দাও। কিন্তু বিদেয় করা বললেই তো আর বিদেয় করা যায়না। একটা লোক ঠিক করতে হবে তো! নিজে তো কোথাও গিয়ে লোক খুঁজে আনতে পারবে না। মনে মনে ভাবে, ডাক্তার ইমতিয়াজকেই বলতে হবে। তাদের বড়ো সড়ো ক্লিনিকে অনেক রকম লোকজন। কেউ হয়তো একজন দারোয়ান এনে দিতে পারবে।

এক সপ্তাহর মধ্যে সত্যি পাওয়া গেলো একজনকে। নাম সোহরাব। কিন্তু ও নিজেই বলে, আমার নাম শোরাব। দেখতেও তেমন পালোয়ানের মতো। কাজে খুবই ভালো। ভাড়াটেরা খুশি। কানা ঠসা লুলা দিয়ে কি দারোয়ানের কাজ হয়? কিন্তু আজমত আলির পছন্দ নয় তাকে। তার অভিযোগ হলো, এমন তাগড়া জোয়ান যুবককে রাখা ঠিক নয়। এটা নিয়ে সে মালকিনের সাথে কথাও বলেছে। কিন্তু মালকিন তাকে বেশ পছন্দ করেছে শুধু তাই না, অন্য ভাড়াটিয়েরাও করেছে।

আজমত আলির কথা হলো, প্রতি বাড়িতেই বউ ঝি আছে। তাদের নিরাপত্তাও দেখতে হবে।

মহিলা বলে, কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

-আজকালকার জোয়ান ছেলেরা তো ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কখন কি মতি হয় ওদের?
-এখনো বুঝিনি আলি ভাই। খুলে বলেন বিষয়টা।
-মানে দারোয়ান টারোয়ানের একটু ভারি বয়স হলেই ভালো।
-সোহরাব কি কোনো বেয়াদবি করেছে?
-এখনো করেনি। কিন্তু ওকে পেলেন কোথায়? পরিচয় কি? বিয়ে থা হয়েছে কিনা?

-পরিচয় আমি নিয়েছি। দেশে ওর বউ আর মা আছে। আমি ভেবেছি, ওর ঘরটা একটু ঠিক করে দেবো। যাতে ওর বউ আর মাকে নিয়ে আসতে পারে। তাহলে ঘন ঘন ছুটি চাইবে না।
-তাহলে তো দুজন দারোয়ান রাখতে হবে। হাসে আজমত আলি।
-এতোদিন একজন দিয়ে হয়েছে, এখনও একজন দিয়েই হবে। দারোয়ান তো দিনরাত এখানেই থাকে।
-আসলে বয়স কম লোকেরা এই দায়িত্ব করতে পারে না ভালো করে। কেমন উচাটন ভাব দেখি মাঝে মাঝে।
-পরিবারকে আনলে উচাটন ভাব আর থাকবে না আশা করি।
-যাই বলেন, আব্দুলটা কিন্তু বেশ ভালো ছিলো।
-আমি তো ওকে মন্দ বলি নি ভাই। একেবারেই যে কানে শুনতো না। সেটাই অসুবিধে ছিলো।

আজকাল আলির বাসায় অনেক রকম লোকজন আসে। খানাপিনা হয়। সেটা ভালো ঠেকে না মহিলার। সোহরাব তার কাজে আন্তরিক। কেউ এলে তার পরিচয় জানতে চায়। ও তো এক কোম্পানির লোক। এটুকু প্রশিক্ষণ আছে। বাসার লোকজনকে দেখলে সালাম দেয়। বেশ ভদ্রসদ্র। তার চেয়ে বড়ো কথা, মালকিনের কাজকর্ম কিছু করে দেয়। ওর পরিবারকে আনতে পারলে বাইরের কাজের মেয়েকে আর রাখবে না। ওর মা বউ মাঝে মাঝে ঘরের কিছু কাজ কর্ম করে দিতে পারবে। সোহরাবের সাথে এসব নিয়ে কথাও হয়েছে। রাজি হয়েছে সে।

মহিলা ভাবে, দারোয়ান নিয়ে এতটা ভাবতে আগে তো দেখে নি আলিকে। দারোয়ান বদল হওয়ায় এতো বিচলিত কেনো সে? ছেলে মেয়ের মতো হলো, ঐ লোকের কোনো মতলব ছিলো। হতে পারে। মহিলা এবং তার স্বামী যাত্রাবাড়িরই মানুষ। তাদের বয়সি চেনা মানুষদের অনেকেই গতো হয়েছে। ছেলেমেয়েদের অনেকেই ঘর বাড়ি বেচে কিনে বিদেশে চলে গেছে। উঠেছে উঁচু উঁচু দালান। ফলে অনেক নতুন লোক এসেছে এই এলাকায়। বলতে গেলে চেনা মানুষ আর নেইই। এবার তাকেও পাততাড়ি গোটাতে হবে।

মনটা ভালো থাকে না আজকাল মহিলার। প্রায় চার বছর হয় স্বামীও চলে গেলো তাকে একা ফেলে। তখন থেকেই দোটানায় ভুগছে মহিলা। কত স্বপ্ন ছিলো, ছেলেমেয়েরা আসবে যাবে। হয়তো কেউ থাকবে। বাবার বাড়িকে ভেঙে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং বানাবে। ছেলেমেয়েরা বলে, সেই মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এ কে থাকবে? আমরা তো আর দেশে ফিরবো না। তার চেয়ে ভালো,

বাবার নামে তুমি দান করে দাও কোনো প্রতিষ্ঠানকে। সেই থেকেই চিন্তাটা মাথায় এসেছে। এটা ভালো কাজ হবে অবশ্যই।

কিন্তু ভালো কাজে এতো বাঁধা কেন? এখানে এখনো কোনো ভালো ক্লিনিক নেই। ইমতিয়াজ যদি সেটা করতে পারে, তাহলে এলাকার লোকেরই তো ভালো। ঢাকা মেডিকেল তো আর সেই মেডিকেল নেই। সবার কাছে শোনে, পরে ক্লিনিকেই দৌড়োতে হয়। যাত্রাবাড়ি থেকে মেডিকেলের দূরত্বও অনেক।

কিছু বুঝতে পারে না মহিলা। তারা খুব সাদামাটা জীবন যাপন করেছে। একটাই আকাঙ্ক্ষা ছিলো, ছেলেমেয়েদের বিদেশ পাঠাবে উচ্চশিক্ষা নিতে। সেই আকাঙ্ক্ষা যে তাদের এমন করে দেউলিয়া করে দেবে সেটা তো বুঝতে পারেনি তারা। স্বামী বেঁচে থাকতেও দুঃখ করেছে। বলেছে, আমরা নিজের হাতে পাখি উড়িয়ে দিয়েছি কাঁকনের মা। বড়ো মেয়ের নাম কাঁকন। তবে সে গেছে স্বামীর সাথে। সেই রকম জামাই তারা খুঁজেই নিয়েছিলো। ছেলে দু'জনকে তো আয়োজন করে ধার দেনা করেই পাঠিয়েছে বিদেশে। আর একজন গেছে ডিভি ভিসা পেয়ে।

সমস্যা আর উৎকণ্ঠা কোন বাড়িতে নেই? মিলি বলছিলো, নিরা আবার ক্যারিং। বেশ অনেক দিন পরে নতুন অতিথি আসবে। তাদের প্ল্যান ছিলো এই রকমই। কথা একটু বড়ো হলে তবে আর একটা বেবি নেবে।

শুনেই মিলির অস্থিরতা শুরু হয়েছে। ওখানে বন্ধু-বান্ধব আছে। তবে নিজে চোখেই তো দেখেছে, কি ব্যস্ত জীবন কাটায় ওরা! সোরায়াটা থাকলে অনেক সাহায্য পেত নিরা। পাঁচমাস কোমায় থেকে শেষে ঘুমিয়েই গেলো মেয়েটা নিঃশব্দে।

মিলি মনে করতে চায় না সোরায়ার কথা। নিগ্রহের নিষ্ঠুর মুঠো থেকে সেও পারলো না বের হতে। শুরু করে দিয়ে গেছে তার দাদির দাদির বোন। সে কি আজকের কথা? তখন আফগান সমাজে মেয়েদের ওপর স্টিম রোলার চালানো হতো নির্বিচারে। এমন কি বাচ্চা নাহলে সেই বউকে গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হতো কাজের মেয়ে হিসেবে। শুধু এইটুকু না। সে তখন সবার নারী। এমন কি নিজের শ্বশুরের জন্যও হালাল নারী (একটা আফগান লেখকের নভেলের সূত্রে পাওয়া) হয়ে যেতো। সইতে না পেরে মাথায় সমস্যা দেখা দেয় সেই মহিলার। তখন বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয় তাকে। বাবা বা ভাইয়ের বাসায় ফিরে আসবে তারও উপায় নেই। কেউ তাকে আশ্রয় দেবে না। দেয়ও নি। তো যাবে কোথায়?

পেটের জ্বালায় ঐ মহিলা তখন পতিতালয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। সেই কারনে তার অন্য বোনদের বিয়ে নিয়ে ভারি ঝামেলা হয়। কেউ ভালো থাকেনি। কেউ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। কেউ যক্ষা হয়ে মারা যায়। তবু টিক টিক করে কারো না কারো সন্তানের সিঁড়ি বেয়ে নেমেছে বংশ লতিকা। ছেলেদের নিয়ে তো ঝামেলা নেই। তারপর আফগানিস্তানের যুদ্ধে তছনছ হয়ে যায় সোরায়ার দাদা নানার সংসার। কেউ মারা যায় গুলি খেয়ে, কেউ মারা যায় বোমায় পুড়ে। সোরায়া পালিয়ে আসে দেশ ছেড়ে অজানা অচেনা কোনো এক দলের সাথে।

কে যে কার কে, কেউ জানে না। অবিশ্রান্ত বোমা পড়ার সময় যে যেদিকে পেরেছে প্রাণ নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছে। রাতের আঁধারে পাথুরে রাস্তায় হাঁটার সময় জুতো ছিঁড়ে গেলে খালি পায়ে হাঁটতে হয়েছে সবাইকে। খিদে পেলে খাবার নেই। পিপাসায় প্রাণান্ত হলেও খাবার পানি নেই। খাওয়ারও কিছু নেই সাথে। বুদ্ধি করে কে যেনো হাতে বানানো রুটি আর কয়েকটা পেয়াজ কাগজের ঠোঙায় মুড়ে এনেছিলো। সেটাও খাওয়ার সময় নেই। দৌড়োচ্ছে সবাই। কোথায়, তাও জানে না।

সীমান্ত পার হতেই হবে সকালের আগে। রাত থাকতে থাকতে। পথ তো কেউ চেনে না। তবু যেতে হবে যতক্ষণ না পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখে। এদিকে প্রায় ভোর হয় হয় অবস্থা। রাতের আঁধার ফিকে হয়ে আসছে। মেয়েরা আর হাঁটতে পারে না। সোরায়ার মতো পাঁচ ছয়টা মেয়ে ছিলো দলে। কেউ কাউকে চিনতো না। পলাতক জীবনের রাস্তায় পরিচয়।

সবাই কিশোরী। পথের কষ্টে আর খিদেয় ওরা চুপি চুপি কাঁদতে শুরু করলো। কিন্তু বাঁচার সাধ এমনই যে কষ্টকে মাড়িয়ে যেতেই থাকে মানুষ। তারপর অনেক অনেক কাহিনি। সময় এবং স্থান সোরায়াকে এনে ফেলে দেয় পৃথিবীর উল্টো প্রান্তে।

এখন মৃত্যুর গলা ধরে অজ্ঞান হয়ে আছে। প্রায় পাঁচ মাস হতে চললো। আগামি সপ্তায় নাকি অপারেশন করে তার বাচ্চা বের করবে। উন্নত প্রযুক্তি আর মানুষের প্রতি ভালোবাসা থাকলে মানুষ অসম্ভবকেও সম্ভব করে। নিজের অজান্তেই মিলি দুহাত তুলে ওপরওয়ালার কাছে ওর জন্য দয়া চায়।

ভানু এসে বলে, মা আজ কি রান্না হবে?
-তোর খালু আব্বা কোথায়?
-জুম্মার নামাজ পড়তে গেছে।
-ও মা, তাহলে এসেই তো খাবার চাইবে। তুই কি কি রান্না করেছিস?

-ভাত ডাল বেগুন ভর্তা করলা ভাজি আর কাচকি মাছের দোপেঁয়াজি।
-হলোই তো।
-আপনে যে সকাল বেলা মুরগি বের করে দিয়ে বললেন, নিজে রান্না করবেন?
-ওহো, আমি তো ভুলেই গেছিলাম। এখন কি আর রান্না হবে?
-হবে আম্মা। সব কাটেকুটে রেখেছি। ফারামের মুরগি চুলায় দিলে আর কতখুন?
-চল তাহলে রান্নাটা বসিয়েই দিই।

চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে কেমন করে যেন মিলি পড়ে যায়। ব্যথা পায় হাঁটুতে।

ভানু দৌড়ে গিয়ে ফ্রিজ থেকে বরফ এনে দেয় হাঁটুর ওপর। বোকা হয়ে যায় দুজনেই। সামলে নিয়ে মিলি ভানুকে বলে, তুই আজ মুরগি রান্না করে ফেল। পারবি না? আমি একটু শুয়ে থাকি।
-পারবো আম্মা।
-বেরেস্তা ভাজা আছে?
-না আম্মা। আমি ভাইজা নিমু।
-আবার ঐরকম করে কথা বলছিস? ঠিক করে কথা বল হাঁদা।
ভানু হাসে। বলে, আমি ভেজে নেবো আম্মা।
-ভালো করে কথা না বলতে পারলে চাকরি হবে না তোর।
-ভালো করে কথা বললে কেলাসের সবাই হাসে, ঠাট্টা করে।
-করুক। বল ক্লাস, কেলাস না। তোকে নিয়ে পড়তেই হবে দেখছি।
ভানু চলে যায় রান্নাঘরে। ছুটা বুয়া আজ আসেনি। ওদের তো এটাই সমস্যা। যখন তখন ছুটি। বেয়ান বলেছিলো, বেতন কেটে নেবেন। তাহলে সাবধান হবে। খুব আশ্চর্য হয়ে মিলি বলে, কি বলেন বেয়ান?
-আমি তো কাটি। কাজ দিয়েছে ঔষুধটা। এখন ছুটা বুয়াটা সহজে আর ছুটি করে না।
-আপনার বেয়াই জানতে পারলে খুব কষ্ট পাবে।
-আপনারা বেশি ভালো মানুষ বেয়ান। আমি অন্যায় সহ্য করতে পারি না। মুখে বলে ওদের দায়িত্ব শেখাতে পারা যায় না।
-ওদেরও অসুবিধে থাকতে পারে। নাকি?
-তাহলে আগে থেকে বলে রাখবে।
-বেয়ান, ওদের তো সাপ্তাহিক ছুটিও নেই।
-ও বাবা। আপনি কি ওদের ছুটির পক্ষে?
-আমি তো বটেই। আপনার বেয়াইও।

-মুশকিল হলো, আমি রান্নাঘরে যেতেই পারি না আজকাল। খানেওয়ালা চারজন। আমরা যদিও বা এটা সেটা খেয়ে থাকতে পারি, দারোয়ান আর ড্রাইভার একবেলা ভাত না খেয়ে থাকতে পারে না।
-আপনার বিপি ঠিক আছে তো?
-সেটা তো তালগাছের মাথায় থাকতেই ভালোবাসে। রান্না করতে গেলে গরমে আগুনের তাপে সেটা আরো ওপরে উঠতে চায়।
-আমারও সেই অবস্থা। বাবার খাস সম্পত্তি। বিনে পয়সায় পেয়েছি। যত্ন করতেই হয় যেনো সে নিচেই থাকে।
হাসে দুই বেয়ানে। কিন্তু মিলির মনের ভেতর কাঁটার মতো বিঁধে থাকে কাজের লোকের বেতন কাটার কথাটা। এসব ছোটোখাটো বিষয়, কিন্তু অনেক মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করে।

ইমতিয়াজের জিব বড়ো সেনসেটিভ। বলেই ফেলে, মুরগিটা আজ ভানু রেঁধেছে মনে হয়। খাওয়ার সময় টেবিলের ধারে পাশে থাকে ভানু। সে বলে, আম্মাই রানতে চাইছিলো। কিন্তু---
-চুপ করতো ভানু। যা, দই নিয়ে আয় ফ্রিজ থেকে।
-কি ব্যাপার মিলি? কিছু হয়েছে?
-আম্মা পইড়া গেছিলো, দই হাতে ভানু এসে দাঁড়ায় টেবিলের পাশে।
ব্যস্ত হয়ে পড়ে ইমতিয়াজ। বলে, এই কথাটা জানাবে না আমাকে?
-জানাবো তো বটেই। বাইরে থেকে এসে খাওয়া দাওয়া করবে, তারপর বলবো ভেবেছিলাম। আর ভানুটাও এমন হয়েছে! লেখাপড়া শিখে বেশি ডেঁপো হয়ে যাচ্ছে।

ভানু এসব আদরের শাসন বোঝে। বলে, আপনি বলেছিলেন এক্স-রে করবেন না। যুদি কিছু অয়?
-আবার যুদি আর অয়? বল, যদি, হয়।
-সে নাহয় হলো, কিন্তু ব্যথাটা পেলে কোথায়? ইমতিয়াজ জানতে চায়।
-এমন কিছু না। হাঁটুতে লেগেছে সামান্য।
-পড়লে কি করে?
-বুঝতেই পারলাম না, কেনো পড়লাম?
-মেয়ের কথা ভাবছিলে নিশ্চয়।
-সেতো ভাবিই। তা বলে পড়ে যাবো?
-যাক বিকেলে একটা এক্স-রে করতে হবে। এই বয়সে হাড়ের ব্যাপারে সচেতন থাকা দরকার।

আট

চরম দুঃসংবাদ এলো যাত্রাবাড়ি থেকে। মালকিন মহিলা রাতে ঘুমের মধ্যে মারা গেছে। ছেলে আসবে কাল সকালে। প্রফেসর বেয়াইকে নিয়ে ইমতিয়াজ গেলো যাত্রাবাড়ি। সবাই অপেক্ষা করছিলো ইমতিয়াজের জন্য। আজমত আলিকে খুব ব্যস্ত দেখা গেলো। অন্যেরাও বুঝে উঠতে পারছে না যে কি করা উচিত এখন?

ইমতিয়াজ বললো, পুলিশ টুলিশের হাঙ্গামা করার দরকার নেই। লাশটা বার্ডেমের হিমঘরে রাখার বন্দোবস্ত করা হোক। কালই তো ছেলে আসছে, নিজের হাতে দাফন কাফনের কাজটা করুক সে।

প্রফেসর সায় দিলেন ইমতিয়াজের প্রস্তাবে। তিনি লক্ষ করলেন যে, আজমত আলি মহিলার ঘরে যাচ্ছে বার বার। যেহেতু তিনিই জানেন যে বাড়িটা ক্লিনিকের নামে রেজিস্ট্রি হয়নি, তাই ভাবলেন কাগজ পত্র নিশ্চয় সব ঘরেই আছে। ঘরটা বন্ধ করে রাখাই ভালো। তাই ইমতিয়াজকে বলতে বললেন যে, মহিলার ঘরে যেখানে যে জিনিস আছে, সেখানেই তা থাকুক। লাশ হিমঘরে পাঠানোর পর ছেলে না আসা পর্যন্ত ঐ ঘর তালা দেয়া থাকবে।
প্রশ্ন হলো, চাবি থাকবে কার কাছে?

কেউ বললো, চাবি ইমতিয়াজ নিয়ে গেলেই ভালো। কিন্তু ইমতিয়াজের সেটা ইচ্ছে নয়। আজমত এগিয়ে এসে বললো, সে দায়িত্বের সাথে চাবি রাখতে পারবে। তাই হলো সিদ্ধান্ত।

সব কাজ সেরে ইমতিয়াজ আর প্রফেসরের বাসায় আসতে বিকেল হয়ে গেলো প্রায়। মনটা এতোই খারাপ হয়েছে ইমতিয়াজের, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর দু তিনটে দিন হাতে পেলে ক্লিনিকের নামে বাড়ির দানপত্র রেজিস্ট্রি হয়ে যেতো। কাগুজি কাজ কর্ম সব গুছিয়ে নিয়েছিলো মহিলা। অন্যদিকে ইমতিয়াজও প্ল্যান প্রোগ্রাম আঁকিজুকি প্রায় সব করে ফেলেছিলেন। মনে হলো মাথায় একটা ভারি মুগুরের ঘা বসিয়ে দিয়েছে কেউ হঠাৎ। এমন কেনো হচ্ছে তার কপালে?

প্রফেসর যা সন্দেহ করেছিলেন, তাই হয়েছে। ছেলে এসে মায়ের ঘর হা হা করা খোলা পেয়েছে মানবতার কারনেই ইমতিয়াজ গিয়েছেন যাত্রাবাড়ি।

পরিচয় হলো ছেলে শাকিলের সাথে। মোটামুটি চৌকস ছেলে। ঝক ঝকে চেহারা। নিজের ছোটো একটা আইটি ফার্ম আছে। সে জানালো, জমি বাড়ি সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র সে পায়নি মায়ের ওয়ারড্রোবে। ভাড়া আদায়ের রশিদ বই ছাড়াও কয়েকটা সরু লম্বা খাতা পেয়েছে। তাতে মা হিসেব পত্র লেখে রাখতো।

শাকিল এসেছে দুই সপ্তাহের জন্য। কি আশ্চর্য! এঁটেল মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত আটকে গেলো মনে হচ্ছে তার। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো কাজ। এ কেমন জালা! বাধ্য হয়ে তাকে থানায় এজাহার করতে হলো এই মর্মে যে, তার মায়ের ঘরের তালা ভেঙে কে বা কারা ঘরে ঢুকেছিলো। জরুরি কাগজপত্র সব খোয়া গেছে। তারপর যা হয়। পুলিশ এলো বাড়িতে। সবাইকে এক এক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হলো। যাকে সবচেয়ে বেশি দরকার, সেই আমজাদ আলি গেছে আজমির শরিফে। সময় লাগবে ফিরে আসতে। কাউকে বলেও যায়নি। তাকে চোখেও দেখেনি শাকিল।

মায়ের শেষ কাজের দিন পরিচয় হয়েছিলো ইমতিয়াজ আর প্রফেসরের সাথে। ফোনে মা বলেছিলো যে, ডাক্তার ইমতিয়াজকে ক্লিনিকের ভার দিয়ে যাবে। মায়ের বিশ্বাস ছিলো, উনিই পারবেন এই মহৎ কাজটা করতে। তাছাড়া উনি যে দীর্ঘদিন ধরে তাদের বাড়ির একটা ঘরে সাপ্তাহিক একবেলা ফ্রি ট্রিটমেন্ট করতেন, সেটাও মা জানিয়েছিলো। দেখা হলো এই প্রথম। প্রফেসরকেও মনে হয়েছিলো বেশ মানবিক চরিত্রের লোক।

কয়েক দিন পর শাকিল ইমতিয়াজের বাসায় গিয়ে হাজির হলো। বললো, আংকেল, মনে হয় না আমি এই ঝামেলার সুরাহা করে যেতে পারবো। আজমত আলি কাল ফিরেছে। কিন্তু দেখা হয়নি। এদিকে আমার যাওয়ার সময় হয়ে এলো। বুঝতে পারছিনা কি করবো?

-সময় বাড়ালে ভালো হয় বাবা। ইমতিয়াজ বলেন।
-আমার তো ওয়ান ম্যান শো কোম্পানি। আমি না থাকলে কিছুই হয় না বলতে গেলে। একটু ইতস্তত করে বলে, আপনি যদি এই কেসটার ভার নিতেন আংকেল। টাকা পয়সা আমি দেবো।
-তুমি হলে তার ছেলে। আর আমি হলাম একেবারে পর। এটা কি ভালো দেখায়?
-আপনি পর হবেন কেনো? মা তো দানপত্রে আপনাকে সব দিয়ে গেছে ক্লিনিক গড়ার জন্য। লেখাপড়াও করে রেখেছে। বাকি ছিলো শুধু রেজিস্ট্রেশন।

-সে তো শোনা কথা। তুমি বা আমি কেউ সেই দানপত্র দেখিনি।
-তাতে কিছু আসে যায় না আংকেল। বাধা দিতে পারে শুধু ছেলেমেয়েরা। আমি সবার পক্ষ থেকে আপনাকে মেনে নিতে চাই। কারণ মায়ের শেষ ইচ্ছে ছিলো বাবার নামে একটা ক্লিনিক করা। এবং সেটা করবেন আপনি। এসব তো আমরা জানি।
-আমাকে ভাবতে দাও বাবা। বিষয়টা একটু বুঝে নিই। আত্মীয় নই, স্বজন নই, আমাকে স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করতে চাইবে কেনো?
-আমি কাল বাসায় একটা মিলাদের আয়োজন করেছি। সেখানে প্রফেসর আংকেলকেও দাওয়াত করবো। পরিচয় করিয়ে দেবো আপনাদের সাথে স্থানীয়দের। জানিয়ে দেবো যে, বাবার নামে এই বাড়িতে যে ক্লিনিক হবে, মার শেষ ইচ্ছেতে তার দানপত্র হয়েছে আপনার নামে। ক্লিনিকটা গড়বেন আপনি।
-সেটা অবশ্যই হওয়া দরকার। আমি বলছি পরিচয়ের কথা।
-আমি তো দেখলাম, অনেকেই চেনে আপনাকে।
-হতে পারে। হয়তো তারা আমার চিকিৎসা নিয়েছে।
-ঠিক আছে আংকেল, মিলাদে আসেন আপনারা। আমার বিশেষ অনুরোধ।

দুই বেয়াই মিলে গেলো মিলাদে। সামিয়ানা টাঙিয়ে বেশ ভালো আয়োজন করেছে শাকিল। অতিথি বিদায় হলো তবারুক বিতরনের পর। এবার স্থানীয় গণ্যমান্য নিয়ে ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনার পালা।

শাকিল তার কথাগুলো বলে গেলো হড়বড়ো করে। সবাই রাজি হলো এতে। মেনে নিলো শাকিলের কথা। কারণ তার কথা তো তার কথা নয়, তার মায়ের কথা। তার ভাইবোনের কথা।
-আজমত আলি বললো, আমি তো এই কথা জানি না। আমাদের মালকিন বাড়িটা আমাকেই দান করতে চেয়েছিলেন এবং সেখানে একটা ক্লিনিক হবে। আমি তার দায়িত্বে থাকবো। সেই অনুযায়ী লেখাপড়াও হয়েছিলো। হঠাৎ আল্লাহ তাকে নিয়ে গেলো। এখন এসব কি কথা তুমি শোনাচ্ছো বাবাজি?
শাকিল অবাক হয়ে বললো, আমি তো কোনোদিন মার মুখে আপনার কথা শুনিনি। কাগজপত্রও পাইনি আলমারিতে।
-আমার কাছে আছে কাগজপত্র। বলেই সে একটা খাম বের করলো। তারপর নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে লেখা আসল কাগজ বের করে দেখালো সবাইকে যে, আজমত আলির নামে দানপত্র হয়ে গেছে। এখন যে কোনো দিন রেজিস্ট্রি করে নিতে পারা যায়। তারপর ক্লিনিকের কাজ।

ইমতিয়াজের মনে হলো, বাড়িটা ঘুরছে শুণ্যের ওপর। বলে কি লোকটা? এত বড়ো মিথ্যে কথা কেমন করে বলছে ও?

তারপর বলেই বসলেন, হতেই পারে না।
-এই যে দেখেন দলিলের খসড়া। ইমতিয়াজের কাছে নিয়ে এলো কাগজগুলো সে।
সবাই অবাক হয়ে দেখলো, সত্যি ওটা দলিলের খসড়া এবং দানপত্রে আজমতের নামই লেখা।

শাকিল বললো, এটা জাল কাগজ। আমি মানি না। মৃত্যুর দুদিন আগেও আমার সাথে মার কথা হয়েছে। আপনার নাম না, মা ইমতিয়াজ আংকেলের কথা বলেছেন।
-ঠিক আছে, তোমাদের কাগজ আনো। আমরা দেখি।
মিলাদে শাকিল মার উকিল সাহেবকেও দাওয়াত দিয়েছিলো। তিনি এগিয়ে এসে দলিলটা দেখতে চাইলেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন কাগজগুলো। তাঁর মাথাও গুলিয়ে যাচ্ছে। বললেন, আমি নিজে হাতে দলিলের খসড়া তৈরি করেছি। আপনার নাম তো লেখি নি?
-আমাকে উনি এই কাগজটা দিয়েছেন। পাশে বসে থাকা একজনের হাত ধরে আজমত বললো, এই যে আমার উকিল। একে জিজ্ঞাসা করেন, কার নাম লেখেছে সে দলিলে?
শাকিলের মার উকিল বললো, এই কাগজ নকল। কমপিউটার শপে গিয়ে মডার্ন টেকনিক ব্যবহার করে বানানো হয়েছে।
আজমত বললো, বেশ তো, আপনি আসল খসড়া আনলে মিলিয়ে দেখা যাবে। সেটা আনেন।
-আপনার নামে আমি দেওয়ানি কেস দেবো,উকিল সাহেব বলেন।
-বেশ ভালো। কোর্টেই তাহলে ফায়সালা হবে। আজমতের উকিল বলে।
শাকিল বলে, কথা কাটাকাটি করে কোনো লাভ হবে না। আমাদের আসল দলিলের কাগজটা আগে হাতে পেয়ে নিই।
-চোর তো আর কাগজগুলো ফেরত দেয়ার জন্য চুরি করেনি। প্রফেসর এই প্রথম কথা বললেন।

বিশ্রি একটা ব্যাপার হলো। পথে যেতে যেতে বললেন, বাড়িটা ও-ই খাবে বেয়াই। নগরও গ্রাম হয়ে গেলো দেখছি। গ্রামীন জীবনে এমন দলিল জাল করে সম্পত্তি দখল করার ঘটনা আকসার ঘটে শুনেছি বাবার কাছে। এখন তো জোর যার মুল্লুক তার।

কেস করতেই হলো শাকিলকে। কিন্তু দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তি এতো সহজে তো হবে না। কোনো কুল-কিনারা করতে না পেরে সে তার মেজোভাই ওমরকে আসতে বললো। তার ছুটি নেয়াই ঝামেলার। ওর বছরে আটাশ দিন ছুটি। এখান ওখানে বেড়াতে গিয়ে প্রায় সেটা শেষ। তবু স্পেশাল ছুটি নিয়ে সে আসলো। পিঠেপিঠি ভাই। দেখতেও প্রায় একই রকম। কিন্তু বিষয়-আসয় কিছুই বোঝে না। সেও ইমতিয়াজের কাছে গিয়ে পরিচিত হয়ে আসলো।
ইমতিয়াজ ভাবে, এ কি ধরনের প্রজন্ম? দেশের কিছুই শেখেনি? দেশ ছেড়েছে, ভালো কথা। কিন্তু দেশে তো ছিলো আঠারো বছর। চোখ মেলে কিছুই কি দেখেনি? বাবা শিখিয়েছে, বিদেশে যেতে হবে, বড়ো হতে হবে বিদ্যায় লেখাপড়ায়, ব্যস? তারপর কি হবে? ওরা তো ইমিগ্র্যান্ট হয়ে যায়নি গিয়েছিলো পড়ালেখা করতে। বাবার ধারণা ছিলো যে ছেলেরা দেশে ফিরে আসবে। কিন্তু সোনার হরিণের পেছনে একবার ছোটা শুরু করলে আর যে ফেরার উপায় থাকে না। সেটা না বুঝেছে বাবা, না বুঝেছে ছেলেরা।

ইমতিয়াজ স্কুল জীবনে শুনেছিলেন 'ব্রেন ড্রেন'-এর কথা। তখন থেকেই তার প্রতিজ্ঞা ছিলো, তিনি কখনও বিদেশে থাকবেন না। লেখাপড়ার জন্য গেলেও ফিরে আসবেন দেশে। মাটির ঋণ শোধ করতে হবে। জন্মভূমি আর মা যে সমান। স্কুলে শেখা এইসব কথা বিশ্বাস করেছেন প্রাণের ভেতর থেকে। জীবনে করেছেনও তাই। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। নিজের মেয়েই হয়ে গেছে পরবাসী। অভিবাসী। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এসবের পেছনে তাদের ভুল দর্শন দায়ী।

কোর্টে প্রথম শুনানির দিন আরো যে সব মামলা ছিলো, তার মধ্যে আরো অনেক মামলার শুনানি ছিলো। বিশেষ করে বিশিষ্ট রাজবন্দি এবং নারায়নগঞ্জের সাত খুনের মামলার কেসে বহু লোক এসেছে কোর্টে। বেশ উত্তেজনা আদালত প্রাঙ্গনে। ওমরদের উকিল অন্য একটা কেসের কাজ আছে বলে সেই যে গেলো আর এলোই না। আজমত আলিকেও দেখা যায় না। বুঝতে পারে না ওমর, এসব কি হচ্ছে?

তাদের উকিলের খোঁজ করতে গিয়ে সে শুনলো, তাদের উকিল আজমত আলির সাথে কোথায় যেন গেছে। মানেটা সেই মানুষই বুঝিয়ে দিলো। সেটা হলো, ওমরদের উকিলকে কিনে ফেলেছে আজমত আলি।

অনেক পরে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উকিল বললো, বিশেষ কাজে সে আটকে গিয়েছিলো। এখন শুনানির জন্য আর একটা দিন নিতে হবে। আজকের মত আদালত শেষ।

ঘটনার বিবরণ শুনে ইমতিয়াজ বুঝে গেলেন যে, এই কেস চলতে থাকবে। ওমরও চলে যাবে কদিন পর। কেউ থাকবে না এখানে কেস চালানোর জন্য। এটাই তো চায় আজমত আলি।

মিলি মনে মনে খুবই দুঃখিত। কাজ পাগল স্বামী ক্লিনিকের কাজটা না করতে পেরে মর্মে মর্মে মরে যাচ্ছে। এখন একবার নিরার ওখানে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো মন ভালো হতো কিছুটা। একই বৃত্তে ঘুরপাক খেতে খেতে মানুষটা কেমন হয়ে যাচ্ছে। স্কুল তো গেছে চিরদিনের জন্য। যাত্রাবাড়ির ফ্রি ট্রিটমেন্টও গেছে। ক্লিনিকের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে একটা অমানুষের জন্য। এটাও যে শেষ হয়ে গেছে সেটা বুঝতে পারে মিলি।

খাওয়ার টেবিলে একদিন কথাটা পাড়ে। বলে নিরার তো ছয় মাস যাচ্ছে। এবার চলো দু'জনে গিয়ে তিনমাস থেকে আসি।
-আমার শরীরটা ভালো না মিলি। মনও না।
-ওখানে ভালো ট্রিটমেন্ট করার সুযোগ পাবো, না?
-হয়তো। কিন্তু আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।
-আমরা তো আবার ফিরে আসবো কয়মাস পরেই।
-দেখি ভেবে।
-তুমি ডাক্তার, ভালো করেই জানো, আগেকার দিনে কোনো অসুখ হলে হাওয়া বদলের পরামর্শ দিতেন ডাক্তার।
-আমি জানি, তুমি চাও আমি যেনো হাওয়া বদল করি, এই তো? তোমার মমতা আমি বুঝি।
-এই তো লক্ষ্মী রাজা। আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছো।
-সে তো পেরেইছি। কিন্তু সত্যি বিদেশে যেতে একটুও ভালো লাগে না আমার।
-আমার মনে হয়, কিছুদিন বাইরে থাকা দরকার তোমার। একেবারে ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে। নিরা কাল খুব মন খারাপ করেছে তোমার জন্য। খুব দুশ্চিন্তা ওর তোমাকে নিয়ে।
-আহা, এখন ওর জন্য দুশ্চিন্তা ভালো নয়।
-ওরও ধারণা তোমার আউটিং দরকার। কথা বড়ো হয়েছে, ওর সঙ্গ তোমার ভালো লাগবে।
-ঠিকই বলছো মিলি। তবু বলছি, ভেবে দেখি।
-তার মানে তুমি চাও না যে আমি যাই নিরার কাছে?
-সে কি কথা? আমি যাই বা না যাই, তোমাকে তো যেতেই হবে মেয়েটার কাছে।

-তুমি না গেলে আমি যাবো না। এই পরিস্থিতিতে একা তোমাকে রেখে যেতে পারবো না আমি।
-কেনো? আমার আবার কি হলো?
-ওকি, উঠলে কেনো? পায়েস খাবে না একটু?
-তাই তো, তাই তো। ভুলেই গেছি।
-দেখলে তো তুমি কতো অন্যমনস্ক হয়ে গেছো?
-ও কিছু না।
-ভাবের ঘরে চুরি করো না। আমি বেশ বুঝি তোমাকে।

কথা শেষ হলো না। বিছানায় গিয়ে আবার নিরার কাছে যাওয়ার প্রসঙ্গ ওঠালো মিলি। বললো, একবার একা গিয়ে বুঝেছি, তোমাকে ছেড়ে থাকা কতো কষ্টের।

হেসে ফেলে ইমতিয়াজ। মনে আছে, আমি যখন বিদেশে পড়তাম? তখন তো চিঠিই ভরসা ছিলো। নির্দিষ্টি দিনে চিঠি না পেলে নাকি ভারি কান্না কাটি করতে?
-থাক আর ওসব সোহাগের কথা বলতে হবে না?
-বয়স কতো হলো যে সোহাগের কথা ভুলে যেতে হবে?
-চটুল বাক্যে আমাকে ভোলানোর চেষ্টা করো না।
-মনে আছে, যেদিন বিদেশ থেকে ডিগ্রি করে ফিরলাম? রাতে সেকি কাঁপুনি তোমার!
-ধ্যাৎ! কি সব কথা বলছো?
-তুমি তো বোঝোনি, আমিও কাঁপছিলাম আবেগে।
-সত্যি?
-সত্যি। তারপর কেটে গেছে কতো বছর বলো?
-আমাদের খুব ভালো রেখেছেন আল্লাহ, রাজা।
-একশোবার স্বীকার করি সে কথা রানি।
এই রকম পিটিশ পিটিশ গল্প হলে ঘুম পালিয়ে যায়। আস্তে আস্তে শরীর জাগে। মন জাগে। সুরভিত হয়ে ওঠে নিশ্বাসের বাতাস। চারপাশে থৈ থৈ করে প্রাণের সরোবর। অদৃশ্য হয়ে যায় পৃথিবী। অবগাহন না করে তখন আর থাকা যায় না। গেলোও না।

সকালে পিঠে খাওয়ার দাওয়াত ছিলো বেয়াই আর বেয়ানের। মিলি নিজে হাতে পিঠে বানিয়েছে। পাটিসাপটা, চন্দ্রপুলি আর নোনতা চিতই। আসলে খাওয়ার চেয়ে গল্প-গুজব করাই উদ্দেশ্য। শুক্রবারে তো জুম্মার তাগাদা থাকে। তাই শনিবারই বেছে নেয় মিলি।

টেবিলে পিঠে সাজানো দেখেই বেয়াই খুশি হয়ে উঠলেন। বেয়ান বরাবরই একটু শান্ত প্রকৃতির। তিনিও আজ উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বলে, দাওয়াত ছিলো পিঠে খাওয়ার। এখন দেখি লুচি, ডিম ভাজা আর আলুর দমও সাজিয়ে রেখেছেন বেয়ান।
-সাজানো বললে শুনবো না। খেতে হবে সবই। মিলি বলে হেসে।
-চিন্তা নেই বেয়ান। আমি দুজনেরটা একাই সাবাড় করবো। বেয়াই তো স্বল্পাহারি। আমার ওসব চলে না, প্রফেসর বলেন।
-ঠিক আছে, আজ পাল্লা দেয়া হবে, ইমতিয়াজ বলেন।

সময়টা খুব ভালো কাটলো। খোলা বারান্দায় এসে বসেছে সবাই। একদিকে দুই বেয়াই। অন্যদিকে দুই বেয়ান। কি কথা নিয়ে যেনো দুই বেয়াই উচ্চস্বরে হাসছেন। প্রফেসর বেয়াইয়ের গলাই শোনা যায় বেশি।

মিলি বললো, আচ্ছা বেয়ান, বেয়াই সাহেবকে এতো তরতাজা রেখেছেন কেমন করে? বেয়ান হাসে। বলে, উনি তো এই রকমই।
-রাতের সঙ্গী হিসেবেও এই রকম? দুষ্টুমির হাসি মিলির ঠোঁটে।
-এই রকম রাখতে চাইলেই রাখা যায়। রহস্যের হাসি বেয়ানের ঠোঁটেও।
-তার মানে?
-ডাক্তার নিয়ে ঘর করেন, আর এটা আমাকে বলে দিতে হবে?
-সত্যি বুঝলাম না বেয়ান।
-বেয়াই জানেন, জিজ্ঞাসা করে নেবেন।
-আপনি তো বেশ রসিক। হাসেন দু'জনেই।
অতিথি চলে গেলে মিলি ব্যস্ত হয়ে পড়ে সংসারের কাজে। ভুলেই গেছে প্রসঙ্গটা। মনে একটা কথাই ঘুরে ফিরে আসে, কেমন করে ইমতিয়াজকে নিরাদের কাছে নেয়া যায়।

মিলিদের ঘরটার দক্ষিণ পশ্চিম খোলা। দু'দিকে দুটো বড়ো বড়ো জানালা। চাঁদ সূর্যের অবারিত আলো ঘরে লুটোপুটি খায় রাতে দিনে। পূর্নিমার চাঁদ বিছানায় শুয়ে উপভোগ করতে পারে তারা। পেশাগত কাজে যত সিরিয়াস হোক না কেনো, জীবনকে বঞ্চিত করে না ইমতিয়াজ। বিশেষ করে শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলা তার প্রিয়। কেমন প্রতিদিন চাঁদটা একটু একটু করে বাড়ে। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে সারা বিছানায় আহ্লাদে লুটিয়ে থাকে। এক জীবনে চন্দ্রস্নান যে কতো হয়েছে!

আজ তাদের বিবাহবার্ষিকী। হয়তো ইমতিয়াজ ফুল নিয়ে আসবে ফেরার পথে। মিলি নিজেদের বাগান থেকেও বেশ কয়েকটা রজনীগন্ধার ডাঁটা নিয়ে

আসে। ফুলদানিতে পুরনো ফুল ছিলো। সেগুলো ফেলে দিয়ে নতুন ফুল সাজিয়ে রাখে। যদিও বাগানের ফুল তুলতে তার ভালো লাগে না। গাছেই দেখতে ভালো লাগে। সে যাক, এতো কাজ কোথা থেকে জমলো আজ কে জানে! ভানুর জ্বর হয়েছে বলে সব কাজ নিজেকে সারতে হলো। পথ্যও রান্না করতে হলো ওর জন্য। ইমতিয়াজের আসতে তো রাত দশটা হয়েই যায়। ভাবলো একটু বিশ্রাম নেবে সন্ধেবেলায়। ক্লান্ত লাগছে।

জানালার পর্দা সরিয়ে টান টান শুয়ে পড়লো। বিছানা ভেসে যাচ্ছে জোছনার বন্যায়। বিছানার সাথে এবার তাকেও প্লাবিত করে দিলো। সারা শরীর ডুবে গেলো নরম আলোর গভীরে। রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরে গেছে। ভাবে, প্রকৃতির অকৃপন দানে জীবন এখনও কতো সুন্দর।

বিছানায় পিঠ পড়তেই গলে গেলো মিলির শ্রান্ত দেহ। নিরার কথাই মনে এলো। বলেছিলো কিছু সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু কি সেটা, তা আর বলেনি।

ইমতিয়াজ আস্তে করে পাশে এসে বসেছে। হাতে একগোছা হালকা গোলাপি রঙের সুরভিত আধোফোটা গোলাপ।
তড়িঘড়ি উঠে বসলো মিলি। বললো, কখন এলে? ডাকোনি যে?
-এই তো এলাম। দেখি রাজকন্যের মতো ঘুমিয়ে আছো চাঁদনির কোলে।
-হঠাৎ এমন কাব্য করে কথা? মিলি অবাক হয়।
-ডাক্তার হলে কি কাব্য করা বারণ?
-তা হবে কেন? বেল বাজালে কখন? দরজা খুলে দিলো কে?
-কি ব্যাপার? জোড়া জোড়া প্রশ্ন করছ যে? উঠলে কেনো?
-উঠবো না? এটা কি শোয়ার সময় হলো? ভানুটার জ্বর এসেছে।
-ঐ তো দরজা খুলে দিলো। দিব্যি আছে দেখলাম।
-তবু এমন সময় শোয়া উচিত হয়নি আমার।
-দোষ তোমার নয় মিলি। এমন চাঁদের আলোর আদরমাখা বিছানার কাছে এলেই তো শুতে ইচ্ছে করবে।
-আবার শুরু হলো কাব্য? অনেক হয়েছে। এবার তুমি মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসো। আমি খাবার গরম করি।
-পরে খাবো। তোমার সাথে বিছানা শেয়ার করি না কিছু সময়!
-দাও গোলাপগুলো ফুলদানিতে রেখে দিই। তুমি অন্তত চেঞ্জ করে নাও।

খুশিতে জোছনার আলো বুঝি বেড়ে গেলো। ঘর আমোদিত রজনিগন্ধা আর গোলাপের সুরভিতে। পাশাপাশি গায়ে গা লাগিয়ে দু'জনে বিছানায় শুয়ে পড়লো। কোনো কথা নেই কারো মুখে। শরীরের এমন নিরব উপভোগ আগে

কখনও হয়েছে কি না মনে পড়ে না মিলির। কি যে আরাম লাগছে! নড়তেও ইচ্ছে করছে না। নিরবতা ভেঙে ইমতিয়াজ বলে, তোমাকে না পেলে কেমন হতো আমার জীবন, সেটা আমি ভাবতেই পারি না।
-আমিও একই কথা ভাবি মাঝে মাঝে।
-আজ তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেবো রানি।
-দাও। দেরি করছো কেনো?
-তুমি নাকি বেয়ানের কাছে জানতে চেয়েছো, বেয়াইকে এমন তরতাজা রেখেছে কেমন করে বেয়ান?
-হ্যাঁ। কিন্তু বেয়ান বলেন নি তো। বলেছেন, তোমার কাছ থেকে জেনে নিতে। তো সে কথা এখন কেনো? আমার সারপ্রাইজ কোথায়? সেটা দাও।
-এই নাও। পকেট থেকে একটা ঔষুধের পাতা বের করলেন ইমতিয়াজ।
-কিসের ঔষধ?
-আমার। আজ খাবো। একটা এক্সপেরিমেন্ট জীবনে বাদ থেকে যাবে কেনো?
-কিসের ঔষধ এটা বলবে তো?
-সেক্স ড্রাগ এনেছি।
-কেনো? পাগল নাকি? হেসে জড়িয়ে ধরে ইমতিয়াজকে।
-হলোই বা একদিন পাগলামি। অন্য কারো সাথে তো নয়। আমার নিজের নারীর সাথেই তো। আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী না? মনে আছে তো?
এ কি? দরজায় দাঁড়িয়ে বেয়ান হাসছেন কেনো? হাতে একটা উপহার। মুখে একটা ছোট্ট বাচ্চাদের বাঁশি। তাদেরকে এমন অবস্থায় দেখে বাঁশি বাজাতে লাগলেন মজা করার জন্য। কিন্তু শব্দটা ফোনের রিংটোনের মতো।

ঘুম ভাঙে মিলির। তড়িঘড়ি করে উঠেই ফোন ধরে বলে, হ্যালো, কে বলছেন?
-দরজা খোলো ভাই। সেই কখন থেকে বেল বাজাচ্ছি। শেষে ফোন করলাম। ভানু গেলো কোথায়?
-আসছি। গোলাপের তোড়া কোথায় রাখলে?
-গোলাপের তোড়া কে দিলো তোমাকে?
-তুমি। আবার কে?
-সেটা তো আমার হাতেই এখনো।
-মানে?
-আরে বাবা, দরজা তো খোলো আগে।
সম্বিত ফিরে পায় মিলি। সে তাহলে স্বপ্ন দেখছিলো? ছি ছি ছি! কি ব্যাপার হলো এটা? ইমতিয়াজ না জানি কতোক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন?

নয়

ইমতিয়াজ কানাডা যেতে রাজি হয়েছেন। এতে খুবই খুশি নিরা। মিলিও কি কম খুশি? সেদিন বললো, কতোদিন হয় নিরা, মাসুম আর কথাকে দেখি নি না?

-তুমি এই কথা বললে মাসুমের মা-বাবা কি বলবেন? ইমতিয়াজ বলেন।

-আমরা প্রায় তিন বছর যাইনি। মন কেমন করে না? কথা ছিলো নিরা সপরিবারে আসবে। কিন্তু আর একটা আসছে যে!

-হাসানের মা বাবা প্রায় সাত বছর যাননি।

-তাই? ওমা কেন? ওরা তো আগে ঘনঘনই যেতেন।

-এখন শরীরে কুলোয় না।

-আমি তো ভাবতাম, পাছে ফ্ল্যাট কেউ দখল করে নেয় তাই যান না। দিনকাল যা পড়েছে।

-ওঁদের ফ্ল্যাটে দখল করার মতো কেউ নেই। চারটে মাত্রই পরিবার। সবাই অভিবাসী ছেলেমেয়ের মা বাবা। বয়সীও।

-আজকাল দখল করতে চাইলে যে কেউ করতে পারে। দেখলাম তো! নানারকম আত্মীয়-স্বজন থাকতেও পারে। বানানো আত্মীয়ও হতে পারে। গাজোয়ারি দখলদারও হতে পারে।

ইমতিয়াজ বোঝেন, মিলি যাত্রাবাড়ির কথা মিন করলো। বলেন,

যাকগে। শোনো, হাসানের মা আবার পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছেন। ফোন করেছিলেন দবির সাহেব।

-সে কি? ওর তো ভাঙা পায়ে লোহা-লক্কড় লাগানো।

-ব্যথা পেয়েছেন কোমরেই। কিন্তু সরে গেছে উরুর হাড়ে লাগানো লোহার কাঠি। হাসপাতালে গিয়েছিলেন। এক্স-রে করাও হয়েছে।

-তারপর? মিলির কণ্ঠে উদ্বেগ।

-দুটো লোহার সরু রড সরে গেছে। সেজন্য প্রচন্ড ব্যথা। ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

-ছেলেকে খবর দেয়া হয়েছে?

-হয়েছে। তবু আসবো বললেই তো আর আসা যায় না। অনেক দূরের পথ যে। টিকিট পাওয়া হয়তো সমস্যা নয়। কিন্তু অন্য সমস্যাও থাকতে পারে।

-হাসানের মার প্লুরেসি হয়েছিলো না, মাত্রই তো সেরে উঠেছেন। আবার কি ঝামেলা দেখো তো! কপালের গেরো আর কাকে বলে?
-দবির সাহেব তাই বললেন, তারপর থেকে মিসেসের শরীর খুব দুর্বল হয়েছে। বেশি চলাচল করতে পারেন না। রান্না করতেও হাঁপিয়ে ওঠেন।
-ওদের তো আবার চিরকেলে সুচিবাই রোগ। কারো হাতের রান্না খেতে পারেন না।
-হয়তো দবির সাহেবই পারেন না। কে জানে?
-সেটা কথা নয়। যখন যেমন তখন তেমন না হলে চলে? একদিন তাহলে দেখতে যেতেই হয় দবির ভাবিকে।
-ঠিক বলেছো। বাইরে যাবার আগে ওদের পাড়ায় একবার যাওয়া উচিত।

গুলশান দুই নম্বরে দবির সাহেবের বাসা। চার বন্ধু মিলে একটা প্লটের ওপরে চারতলা বিল্ডিং করেছিলেন। সবাই ব্রিটিশ আমলের আমলা। বাড়ি তৈরি করেও ছিলেন পাকিস্তান আমলে। চারতলার ভদ্রলোক ছেলের কাছে যাওয়া আসা করতেন। একসময় ছেলে রেখেই দিলো মা বাবাকে। পরে এসে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে গেছেন। কারণ বিক্রি তো আর একার মতে হবে না। এজমালি সম্পদের ঐ এক ঝামেলা।

বাকি তিনজনের সাথে ইমতিয়াজের পরিচয় চোখের চিকিৎসা করার সুবাদে। পরে সেই পরিচয় কাছের হয়ে যায় নিরার কারনে। সেন্ট যোসেফে পড়তো হাসান। ওর মা নিয়ে আসতো হাসানকে। দুই বছরের সিনিয়র ছিলো হাসান নিরার চেয়ে। প্রথমে বন্ধুত্ব হয় মায়ে মায়ে। হাসান তখনই দেশে পড়তে চাইতো না। ওর এক মামা ছিলো আমেরিকায়। সেই হাসানকে বিদেশের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, কলেজে ভর্তি হয়েই চলে গেলো মামার কাছে আইডাহোতে।

মা বাবা কেউই চাননি যে, এতো অল্প বয়সে হাসান বাইরে যাক। কিন্তু বিধির বিধান। ছেলেটা একটু অস্থির মতির। পড়ালেখার চেয়ে ঘুরে বেড়ানোর সখ বেশি। মামার তদারকিতে কোনো রকমে গ্রাজুয়েট হলো। তারপর পৃথিবীর ঐ প্রান্তে কতো জায়গায় যে ঘুরলো! কোনো না কোনো চাকরি করে কিছু পয়সা জমলেই বের হয়ে যায় ঘুরতে। বিয়ে থাও করেনি। সেই এক দুঃখ বাবা মার। বংশে বাতি দেয়ার কেউ নেই বলে মিসেস দবির কেঁদে ফেলতেন কখনও। কিন্তু কখনো ছেলের ওপর বিরক্ত হয়ে একটা কথাও বলতেন না।

দবির সাহেবের তিন ছেলে এক মেয়ে। হাসান সবার ছোটো। প্রথম মেয়ে পেটেই মারা যায়। দ্বিতীয় ছেলে মারা যায় পাঁচদিন বয়সে। হাসপাতাল থেকেই ইনফেকশন নিয়ে বাড়ি এসেছিলেন। তৃতীয় ছেলে মারা যায় ডেঙ্গুজ্বরে।

তারপরে হারাধনের ঐ একটি হাসান। দোয়া তাবিজ, ভালো ডাক্তার এবং সাবধানতার অন্ত ছিলো না। ছোটো বেলায় গলায় এক গাট্টি তাবিজ ঝুলতো। নয়নের মনি করে তাকে মানুষ করেছেন। কিন্তু কাছে রাখতে পারেননি। বড়ো দূরন্ত ছিলো। বাইরে রেখে লেখাপড়া করাতে চাননি। অবশেষে পাঠাতে চাইলেন ধানবাদে। তখন ছেলেই যেতে চাইলো না। সে কি কান্না তার!

সেই ছেলে বড়ো হতে না হতে বিদেশে যাওয়ার জন্য বায়না ধরলো। এক সময় বিদেশে না যাওয়ার জন্য কাঁদতো। এখন কাঁদে বিদেশে যাওয়ার জন্য। বেচারা মা বাবা তখনও কেঁদেছে। পরেও কেঁদেছে। একটাই সান্তনা। মামার কাছে থেকে গ্রাজুয়েশনের গণ্ডি পার হয়েছে।

দেশে আসে কয়েক বছর পর পর। মামার কাছেই তার আসল আস্তানা। দবির সাহেবরা গেলে যেখানেই থাকুক উড়ে আসে হাসান। এই গৌরবের কত যে গল্প করেন মিসেস দবির। শুধু তিনি একা নন, একা থাকা অন্য বয়সী প্রতিবেশিদের সঙ্গে দেখা হলে প্রবাসি ছেলের গল্পে আপ্লুত হয়ে যান। সেই জিপসিমার্কা ছেলে এবার মায়ের একসিডেন্টের কথা শুনে উড়ে আসছে। মায়ের কষ্ট তাতেই অর্ধেক কমে গেছে। শুয়ে শুয়ে লিস্ট করেন, কি কি খাওয়াবেন ছেলেকে।

ইমতিয়াজ আর মিলি একদিন হাজির হলো দবির সাহেবের বাড়ি। মিলি গাজরের হালুয়া আর দইবড়া নিয়ে গিয়েছিলো। মিসেস দবির কেঁদে বললেন, হাসান কি যে ভালোবাসে এগুলো খেতে! কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেবো মিলি?

-ভাবি, হাসান তো আমাদেরও ছেলে। ওর জন্য এইটুকু করবো না? এতোদিন পর দেশে এলো। ধন্যবাদের কথা বলবেন না প্লিজ। আমার তো ওর সেই স্কুলের চেহারা এখনও মনে পড়ে।

-আমি তো এখন আর রান্না করতে পারি না। এবার পড়ে গিয়ে একেবারে বিছানা নিতে হয়েছে ভাই। জানি না আর ভালো হবো কি না?

-কোথায় পড়লেন?

-বাথরুমে। কেমন করে যে পড়লাম তা নিজেই বুঝতে পারলাম না। মাথাও ঘোরেনি, পাও পিছলে যায়নি। তবু পড়ে গেলাম।

-ডাক্তার কি বলেছে?

-অপারেশন করে লোহার কাঠি সেট করে দিতে হবে। কিন্তু আমি আর অপারেশন করতে চাই না।

এমন সময় হাসান ঘরে এলো। মিলি বা ইমতিয়াজ কেউ প্রথমে হাসানকে চিনতেই পারেনি। এখন তো পরিপূর্ণ যুবক। কথা বলে একেবারে বিদেশি স্টাইলের বাংলায়। মিসেস দবির পরিচয় করিয়ে দিলেন, হাসু, এই হলো তোমার ইমতিয়াজ চাচা আর মিলি চাচি। তোমার জন্য খাবার রান্না করে এনেছেন। তুমি যে গাজরের হালুয়া আর দইবড়া ভালোবাসো, সেটা তোমার চাচির মনে আছে।

খুশিতে ভুষিত হয়ে গেলো হাসান। অনেক কথা হলো সেদিন। হাসান চায় এবার বাবা মাকে নিয়ে যাবে আইডাহোতে। মামা বাড়ি কিনে বেশ গুছিয়ে বসেছে। সেও ভাবছে একটা বাড়ি কিনবে। মা বাবা থাকবেন তার সাথে। আর একা নয় ঢাকায়। নিজেরা মামা ভাগ্নে কিন্তু একাই আছে এখনও।

মিসেস দবির বলেন, দুই আটকুড়ে একসাথে থাক। আমি আর কোথাও যাবো না বাবা।
-কেনো মা? আমি এখানে তোমার অপারেশন করতে দেবো না।
-আমি অপারেশন করবোও না।
-দেখেন তো ইমতিয়াজ চাচা, এখানে এই অবস্থায় মাকে রেখে যাওয়া যায়? আর অপারেশন তো লাগবেই। না হলে মা ভালো করে দাঁড়াতেই পারবেন না।
-উনাকে বলে কোনো লাভ নেই বাবা। আমি এখানেও একা, ওখানেও একা থাকবো। সংসারে বৌ নেই, একটা নাতি নাতনিও নেই যে তার সাথে গল্প করে সময় কাটাবো। মিসেস দবির বলেন কাঁদো কাঁদো সরে।
-তুমি এবার একটা বিয়ে করো বাবা হাসান। ইমতিয়াজ বলে।
-বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে চাচা। এখন আর গলায় দড়ি পরতে ইচ্ছে হয় না। একা থাকতেই ভালো লাগে।
-তাতে কি? তোমার পছন্দেই বিয়ে করো।
মিসেস দবির বলেন, আমিও তাই বলি ভাই। বিদেশে থাকা মানে কি ঘর সংসার না করা? আটকুড়ে হয়ে থাকা?
-ঠিক আছে আগে তোমাদের নিয়ে যাই, তারপর বিয়ে করবো। তুমি কয় গণ্ডা নাতি নাতনি চাও তখন দেখা যাবে।
-সত্যি বলছিস বাবা? মহিলার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।
দবির সাহেব বলেন, তোমার বোধ হয় ঔষধ খাওয়ার সময় হলো।
-ছেলেটার কথায় একটু সায় দাও, তা না ঔষধের কথা এখন।

দবির সাহেব হাসেন। বলেন, শুনলাম তো। তোমরা মা ছেলেতে একটা চুক্তি করলে।
-চুক্তি বলছো কেনো? ও তো বললো এবার সত্যি বিয়ে করবে।
-একই কথা তো গতো বারো বছর থেকে বলছে তোমার ছেলে।
-এইবার নাকি সত্যি বিয়ে করবে। আমার হাত ধরে বলেছে। ঘরে নাতি নাতনি না থাকলে আমি কি করবো সারাদিন বলো? আমাদের কপালে তো ঐ হাসু ছাড়া আর কেউ নেই। ওকে নিয়েই আমার যতো স্বপ্ন। আবার গলা ভারি হয়ে আসে মিসেস দবিরের।
-সেটা ঠিক বলেছো। স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচে? এবার তবে ঔষধটা খাও। সময় পার হয়ে যাচ্ছে, দবির সাহেব বলেন।
-ভাবি, একটু হালুয়া বা দইবড়া দিই আপনাকে? মিলি বলে, কিছু খেয়ে তবে ঔষধ খেলেই ভালো হয় না কি?

শোয়ার ঘরেই ছোটো টেবিল এনে খাবার সাজালো মিলি। ঘরটা যেনো এক যৌথ পরিবারের বাড়ি হয়ে উঠলো। অনেক দিন পর দেশের খাবার পেয়ে হাসান ভারি খুশি। মিসেস দবির বললেন, ওপর তলায় একটু করে পাঠিয়ে দাও মিলি। ওরাও বড্ড একা। কখনও রান্না করে, কখনও কিনে এনে খায়। কাজের বুয়া আছে। দু'বেলা কিছু মিছু রান্না করে দেয়। বাজার করে দারোয়ান। আজকাল নিচে ভ্যানে করে সবজি মাছ আনে। তাতে সুবিধে হয়েছে আমাদের।

বাড়ি ফিরে মিলি আর ইমতিয়াজ ওদের কথাই ভাবতে থাকে। মিলি বলে, আসলে কি চাই আমরা বলো তো? ছেলে মেয়ে বিদেশ যাবে। মস্ত বড়ো মানুষ হবে। আমরা দেশে আয়ুর দড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বয়সের দিকে এগোবো। ক্রমশ একাকী হতে থাকবো আর বসে বসে ছেলেমেয়ের গৌরবে গদগদ হয়ে লোকের কাছে গল্প করবো। এইই কি?
-তাই তো দাঁড়িয়েছে বিষয়টা। আমাদের কালে বড়ো হওয়া আর এই কালে বড়ো হওয়ার কনসেপ্ট এক রকম নয়। তখন বাবা মা বলতেন, ছেলে বড়ো হয়ে দেশের দশের একজন হবে।
-আমরা এখনও তাইই বলি।
-না মিলি। এখন তা বলি না আমরা। এখন বলি, ছেলে বড়ো হয়ে বিদেশ যাবে, অনেক টাকা রোজগার করবে, তা দেখে লোকের তাক লেগে যাবে, এই সব। দেশের দশের একজন হবে সেটা বলি না। হয়তো চাইও না। দেশপ্রেম ওদের মধ্যে দিতে পারিনি আমরা। মানে, আমাদের প্রজন্ম।

মিলি মনে মনে ভাবে, ইমতিয়াজ তো সত্যি কথাই বলেছে। বলে, তোমার কথাই ঠিক। আমরাও যেন কেমন হয়ে গেছি।

-বলতে পারো, আমরা ক'দিন নিরাকে সূর্যসেন আর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের গল্প শুনিয়েছি? ইতিহাস ভূগোল তো ওরা পড়েই নি। ওরা জানেই না দেশপ্রেমিক নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা। জানে না ঝাঁসির রানির কথা। জানে না সিপাহি বিপ্লবের কথা।

-একেবারে ঠিক কথা বলেছো। পাখি নিজ ধর্মেই ওড়ে। কিন্তু আমরা তো বাচ্চাদেরকে উড়তে শিখিয়েছি। তারপর একদিন মা বাবার ভালোবাসার খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়েছি। তখনও বুঝিনি শূন্য খাঁচা নিয়ে বয়সী বাবা মার একাকী জীবন কেমন করে কাটবে? ছেলে মেয়ে বাইরে গেলে অর্বাচীন ভালোলাগার ঘোরেই কেটে গেছে মাস বছর যুগ। বিষাদে ডুবে যায় মিলির শেষ কথাগুলো।

-দেখলে তো দবির সাহেব আর মিসেস দবিরের জীবন কেমন করে কাটছে? হাসানকে হয়তো দেশে ধরে রাখা যেতো না। হয়তো যেতো। সেটা বলা যায় না। কিন্তু দেশে কি আর ছেলে মেয়ে নেই? তারা দেশে করে কর্মে কি খাচ্ছে না? আমাদের চিন্তা চেতনায় কোথাও ভুল আছে নিশ্চয় মিলি।

-আমরাও তো দেশের দশের একজন নামি-দামি কর্মী মেয়ে হিসেবে নিরাকে স্বপ্ন দেখাই নি। অনুতাপের সরে বলে মিলি, মেয়ে হয়ে সে বিদেশে যাবে, পড়ালেখা করবে, দেশে ফিরে আসবে, চাকরি করবে, চিরকেলে দেশি সংস্কার ভাঙবে, সকলে অবাক হয়ে দেখবে, এই সবই ভেবেছি। বলেছি তাকে।

-আজ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলাম, দবির সাহেবরা আমাদের ভবিষ্যত ছবি। ক্রমশ একা হয়ে যাবো আমরাও। কেউ থাকবে না কাছে। আমরা দু'জনে একসাথে মরবো, এমনও তো কথা নয়।

মিলির দু'চোখ ভিজে যায়। বলে, বলো না, বলো না এমন করে। আমার কষ্ট হচ্ছে শুনতে।

-এখন শুনতে কষ্ট হচ্ছে। এক সময় সইতে-বইতে কষ্ট হবে দবির সাহেবদের মতো। সেই ভবিষ্যতের দিকেই তো আমরা যাচ্ছি মিলি। প্রবাদটা হলো; ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। আমরা হাসি না, ভয় পাই।

-দবির ভাবির এখন যে অবস্থা, তাতে ছেলের সাথে বিদেশে চলে যাওয়াই ভালো। অন্তত চিকিৎসাটা ভালো হবে।

-তার মানে আমরা অসুস্থ হলে বিদেশে চলে যাবো? অভিবাসী হবো? এই দেশ, এই বাড়ি, এখানকার বন্ধু-বান্ধব, বাপদাদার পরিচিতি, পেশাগত পরিচিতি সব ফেলে অপরিচিত আগন্তুকের মতো বিদেশে গিয়ে দাঁড়াবো শূন্য হাতে? তাই ভেবে রেখেছো?

মিলি জবাব দিতে পারে না ইমতিয়াজের কথার। বুকের ভেতর কেমন একটা বেদনার অনুভব পাক খেতে থাকে।
-একটা কথা বলে রাখি মিলি, আমি কোনোদিন অভিবাসীর জীবন মেনে নিতে পারবো না। যত দুঃখ যত কষ্টই হোক, আমি দেশেই থাকবো। বিদেশে গেলেও ফিরে আসবো আবার।
-মনে হচ্ছে আজ মনটা খুব খারাপ তোমার।
-সত্যি খারাপ। দবির সাহেবের কথাই ভাবছি বার বার। ছেলে তো গেছেই। পেছনে একটা প্রজন্মও রেখে যেতে পারবেন না। ওরা দেশেও আসবে না নিজেদের শেকড়ের খোঁজে। কি বন্ধ্যা জীবন ভাবতে পারো?
-এটা সত্যি খুব দুঃখের কথা। মিলি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
-কিছুকাল আগেও দবির সাহেব ছেলের গল্প করতেন। কতো দেশ দেখেছে। কতো টাকা আয় করে। অসুখ বিসুখ হলে পৃথিবীর সেরা চিকিৎসা পায়। অথচ এখন কেমন নির্বাক হয়ে থাকেন। বিশেষ করে মিসেসের পড়ে যাওয়ার পর বাস্তবটা খুব বেশি নিরেট হয়ে সামনে এসেছে।
-ভাবির শরীরটা এমনিতেই খুব খারাপ হয়ে গেছে দেখলাম।
-তাঁর অভাবে একা কীভাবে বাঁচবেন দবির সাহেব? কি ভয়াবহ জীবন হবে সেটা, বলো? আমি তো কল্পনাও করতে পারি না।
-হয়তো ছেলে সত্যি নিয়ে যাবে দু'জনকে এবার।
-উনি যাবেন না দেশ ছেড়ে। আমি খুব ভালো করেই জানি। গেলে তো আগেই যেতে পারতেন, ইমতিয়াজ বলেন।

বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে মিলির। ইমতিয়াজ নিজের কথাই শোনাচ্ছে মনে হয়। মিলিও জানে, ইমতিয়াজ কিছুতেই বিদেশে থাকবেন না। বয়সী লোকেরা যখন এদেশেই ছেলেদের দ্বারা পুনর্বাসিত হয় ওল্ড হোমে, তখন যেমন তারা ছেলেদের গল্প করে সময় কাটায়, নিজের বাড়িতে একাকী থেকেও দবির সাহেবরা ছেলেদের গল্প করে কতোই না সময় কাটান। সেকি শুধু প্রজন্মের প্রতি নিপাট ভালোবাসা, না নিজেকে ফাঁকি দেয়া? কি আছে তাদের কপালে, কে জানে?

এলোমেলো হয়ে যায় মিলির ভাবনা। জীবনের শেষ প্রান্তে কে যে কোথায় কেমন থাকবে, কেউ জানে না! আসলে জীবনের লম্বা আয়ু ভালো না। তার বাবা বলতেন, জীবনটা ছোটো, কিন্তু পথ অনেক লম্বা। বিশেষ করে প্রান্তিক জীবনের পথ বড়ো উষর। চলতে-ফিরতে কষ্ট, নানা অসুখ-বিসুখের কষ্ট, কারও কারও অর্থের কষ্ট, কারো না কারো কাছে থাকতে হয় সেই অধীনতার কষ্ট। আহারে জীবন! তবু মানুষ বেঁচে থাকতে চায় এই সুন্দর পৃথিবীতে।

বেশ কিছু দিন পর মাসুম মা বাবাকে ফোন করে। ফোন ধরেই মা বলে, এতোদিন পর মনে পড়লো মাকে?

আহত হয় মাসুম। পুকুরে কলসি ভরে গেলে ভুশ করে যেমন জ্বলজ একটা শব্দ হয়, তেমন একরকম শব্দ হয় বুকের মধ্যে, ঠাণ্ডা কিন্তু জানান দেয়া শব্দ। সেটা রাগ না অপছন্দের, না অপমানের, তা বোঝে না। কিন্তু প্রকাশ করে না কিছুই । সে জানে, এরকম করেই কথা বলে মা। বলে, এতোদিন পরে কোথায় মা? কেমন আছো তাই বলো।
-খবর তো পেয়েই যাস বেয়াইদের বাড়ি থেকে।
-কি হলো মা? রেগে আছো কেনো?
-রাগ করবো কেনো বাবা? মাদের তো রাগ থাকতে নেই। ওটা তোদেরই একচেটিয়া বিষয়। তোরা কেমন আছিস বল?
-আমরা ভালো। নিরা একটু টেনশনে থাকে এই যা।
-টেনশন কেনো আবার?
-সিজারিয়ান বেবি হবে তো সেই জন্যই বোধ হয়।
-তাতে কি? ঢাকাতেই তো কতো সিজার বেবি হচ্ছে রোজ় উন্নত দেশে এটা তো কোনো অপারেশনই না।
-তুমি ওকে একটু সাহস দিও মা। আসলে ব্রিজ বেবি শোনার পর থেকেই ওর টেনশন শুরু হয়েছে।
-আমি তো বুঝিনি প্রথমে যে ব্রিজ বেবি কি? তোর বাবা বললো যে, পেটের মধ্যে বেবি পাতালে শুয়ে থাকে। নড়াচড়া করে তো? খুব খেয়াল রাখতে হবে নিরাকে।
মায়ের কথা নরম হয়ে এলো। বললো, কথা খুশি তো?
-খুব খুশি ভাই আসছে জেনে। বলে বোন হলে আমি ওর সাথে খেলতে পারতাম না। স্কি করতে পারতাম না, ক্রিকেট খেলতে পারতাম না।
মা হাসে কথার কথা শুনে। বলে, তুইও বোন চাইতিস না। তোর ছেলে তাহলে তোর মতোই হয়েছে।
মা ছেলে হাসে। মাসুমের পটপ্ল্যান্টের খোঁজ নেয়, কি কি ফুল হচ্ছে, কি কি সালাদের গাছ হচ্ছে, এই সব। মার আবার বাগানের বেশ সখ। নিজের সবজি বাগান আছে, ফুলেরও আছে।
-বাবা নেই বাসায়? দাও না একটু কথা বলি, মাসুম বলে।
-বাবার সাথে কথা শেষ হলে নিরাকে দিস।
-ঠিক আছে।

-হ্যালো মাই বয়, কেমন আছো? কি খুশি খুশি গলা! বাবা বরাবর এই রকম মাই ডিয়ার টাইপের।
-কি করছিলে বাবা?
-আজ শনিবার। ছুটির দিন। তাই পেপারগুলো ভাজা ভাজা করে খাচ্ছি, তোমার মার ভাষায়।
-নিশ্চয় মার দিকে মনোযোগ দাও নি?
-নালিশ করেছে বুঝি?
-না না নালিশ না। মার মনটা প্রথমে ভালো ছিলো না। মনে হলো ডিস্টার্বড একটু।
-নতুন কথা কি? হা হা হা---
-মার বয়স হয়েছে বাবা, একটু কেয়ারিং হতে হবে তোমাকে।
-আসলে হয়েছে কি জানিস? ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পর থেকেই মন খারাপ করে থাকে। আচ্ছা বলতো, এটা তো কিওরেটিভ রোগ নয়, প্রিভেন্টিভ। মানে নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়।
-মা তো মোটামুটি মেনেগুনেই চলে।
-তা চলে। তবে দাওয়াতে গেলেই অনিয়ম হয়। তাছাড়া যে কোনো রোগ পুরনো হলেই বেয়াড়া হয়ে যায়। যাক তোদের কথা বল।
-এই তো চলছে।
-বেবি ঠিক আছে তো?
-ঠিক আছে।
-মা নানিদের কাছে শুনেছি, দাইরা ম্যাসাজ করে নাকি বেবি পজিশনে আনতো। এখন মনে হয়, ওগুলো ব্রিজ বেবি থাকতো।
-বা-বা-, তুমি কি যে বলো না? এখানকার ডাক্তার বলে, ব্রিজ বেবিকে পজিশনে আনা যায় না।
-আমরা কতো আঁধারে জীবন কাটিয়েছি তাই না রে মাসুম?
-ইমানের সাথে কথা হয়েছে?
-হয়েছে।
-কিছু বলেছে?
-কি ব্যাপারে?
-ওরা কানাডায় কুইবেকে আসতে চায়। ভালো একটা চাকরির অফার পেয়েছে।
-হুমম। তাই দেখছি তোর মার মন মেজাজ খারাপ। মালয়েশিয়ায় ছিলো, কাছেই ছিলো। অতো দূরে যাওয়া তার পছন্দ নয়।
-যে দেশে ফিরতে চায় না তার কাছেই কি আর দূরই কি বাবা?

-আমিও তাই মনে করি।
-অফারটা খুব ভালো। অনেক টুর প্রোগ্রাম পাবে সাউথ এশিয়ায়। কে জানে হয়তো মায়ানমার-বাংলাদেশ-শ্রীলংকায় যাওয়ার পথে টুক করে তোমাদের সাথে দেখাও করে আসবে।
-ভবিষ্যত কেউ জানেনা বাবা। ঐ ওপরওয়ালার ইচ্ছে যেমন হবে, সেটাই মেনে নিতে হবে।

নিরা কথা সবাই এসে গল্প করলো। আজকাল ফোনে কথা বলার জন্য হোয়াটসআপ, ভাইবার স্বাগত জানিয়ে রেখেছে। পয়সা লাগে না। কথা বলো যতোক্ষণ ইচ্ছে। মাঝে মাঝে ডিসকানেকটেড হয়ে যায় বটে তবে সে আর কতক্ষণ? কি যে হলো দুনিয়ার! অকল্পনীয়! আসলে প্রযুক্তিই বদলে দিয়েছে মানুষকে। আরো কতো কি যে হবে কালে কালে!

গোছগাছ প্রায় শেষ। তিন মাসের ওষুধপত্র কেনাও হয়ে গেছে। ফ্রোজেন কই মাছ দশটা আর বড়ো পাঙাস মাছের দুটো প্যাকেট নেয়ার জন্য যায়গা রেখেছে মিলির সুটকেসে। একেবারে শেষ মুহূর্তে ওগুলো কাগজে মুড়ে তারপর তোয়ালেতে জড়িয়ে তুলে নিতে হবে। বহুদিন এতো বড়ো কই মাছ পাওয়া যায়নি। ভানু কুটে বেছে রেডি করে দিয়েছে।

ইমতিয়াজের জন্য একসপ্তাহ পেছাতে হলো যাওয়া। চোখের বি-স্ক্যান করার মেশিন আনা হয়েছে। সেটা ইনস্টল করাও হয়েছে সদ্য। তাতেই দেখা গেলো দু'জন রোগির চোখে ক্যাটারাক্ট নয়, হয়েছে রেটিনা ডিটাচমেন্ট। দু'জনেই এক চোখে কিছুই দেখতে পায় না। আরো একজন এপয়েন্টমেন্ট নিয়েছে। সে কোলকাতায় গিয়ে বি-স্ক্যান করে এসেছে। কারণ এখানে কোথাও বি-স্ক্যান করা যায়নি। কোলকাতা যাওয়া আসা চৌদ্দ হাজার টাকা, আর স্ক্যান করার খরচ মাত্র পাঁচশো রুপি। এদের তিনজনেরই অপারেশন করতে হবে। মানে রোগীরা চায়।

অপারেশনটা ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। ঘটনাটা হঠাৎই হয়ে যায়। স্পর্শকাতর রোগী হলে সে তখনই সমস্যাটা বুঝতে পারে। তখন অপারেশন করলে দেখতে পাওয়ার চান্স থাকে। কিন্তু এই তিনজন রোগীর কেসটা পুরনো হয়েছে। দেখতে পাওয়ার চান্স কম। সবার বয়স পঞ্চাশের ওপর। সবারই ডায়াবেটিস।

ডাক্তার হিসেবে ইমতিয়াজ বুঝিয়ে বলেছে বিষয়টা। মানে রোগীদের বলা হয়েছে যে, চান্স ফিফটি ফিফটি। তবু অপারেশন করতে চায় দেশেই।

কারণটা স্রেফ অর্থনীতিক। এটাই হবে ইমতিয়াজের ক্লিনিকের প্রথম সিরিয়াস চোখের অপারেশন। টেনশন আছে তার।

বার্ডেম থেকে বিশেষজ্ঞ সার্জন আনা হবে। ইমতিয়াজ তো থাকবেনই। ইন্ট্রাওকুলার লেন্স তিনি নিজেই বসান। হাত ভালো হিসেবে নামও হয়েছে তাঁর। তবে লেন্সটা তিনি খুব ভালো ব্যবহার করেন। এ পর্যন্ত কোনো কমপ্লেন আসেনি। অপারেশনের দিনগুলোতে ইমতিয়াজের সমস্ত কনসেন্ট্রেশন বন্দি হয়ে থাকে ক্লিনিকের চৌহদ্দিতে। নিজের মানুষকেই তখন মিলি ঠিক চিনতে পারেন না।

ইমতিয়াজ আর মিলি কানাডা চলে গেলে খায়ের সাহেব একা হয়ে যাবেন। দুই বেয়াইয়ে ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে। দেশের নানা সমস্যা নিয়ে অনেক কথা হতো। যা অন্য কারো সাথে শেয়ার করা যায় না। দৈনিক খবরের কাগজ হাতে নিলেই তো রাজ্যের খারাপ খবর। ভালো খবর আর ক'টা থাকে? নাজিফা বলে, পেপার না পড়লেই পারো। মিলি আবার ওরকম কটকট করে কথা বলে না।

এটা নিয়ে মতান্তর হয়ে যায়। দুঃসংবাদ নিয়ে আলোচনা তো দূরের কথা। তখন আরো বেশি করে মনে পড়বে ইমতিয়াজের কথা। কানাডা যাওয়ার আগে বলে যেতে হবে বেয়াইকে, যেনো মাঝে মাঝে দবির সাহেবদের খবর নেন। উনি আর মিসেস খুব অসুস্থ। একেবারে একা থাকেন। কেউ তো কারো কষ্ট নিতে পারবে না। তবু মোরাল সাপোর্ট দরকার হয় মানুষের।

প্রফেসর তো বলেনই, আমরাও একা ভাই। ওদের পথেই এগোচ্ছি। ওদের বয়স একটু বেশি, চলাচলের অসুবিধে। আমরা এখনো সচল আছি, এই যা তফাৎ। আমরা কাজের লোককে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারি। ওরা পারেন না। সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কাজের লোকের ওপর। তবে বেয়াই সাহেব বলেছেন, দেখতে যাবেন ওদের।

কানাডা যাত্রার সপ্তাহ দুই আগে একদিন সকালে বাড়ির ভেতর এসে ভানু কেঁদে বললো, কাল রাতে বাড়ি আসেনি কামরান। কোনো খবরও দেয় নি। বিয়ের পর থেকে ওরা দু'জন থাকে ইমতিয়াজের বাগানের টিন শেড কোয়ার্টারে।

সমস্যার কথা। ইমতিয়াজ খায়ের সাহেবকে জানান বিষয়টা। ভানুর বর হলো খায়ের সাহেবের মালির ছেলে। সব শুনে খায়ের সাহেব আর নাজিফা খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন। কামরানের কোম্পানিতে ফোন করে জানা গেলো,

কোম্পানির কাছাকাছি কাল দুপুরে সন্ত্রাসি হামলা হয়েছিলো। ককটেল ফাটিয়েছে, গোলাগুলিও হয়েছে। সিএনজিতে করে এক ভদ্রলোক ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন। টার্গেট ছিলেন তিনিই। তাকে গুলি করে সব টাকা নিয়ে দূর্বৃত্তরা পালিয়ে গেছে। অথচ কাছেই নাকি পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিলো!

তা এমন ঘটনা তো আকসারই হয়। কামরান জড়িয়ে পড়ায় দুই পরিবারে এখন অশান্তি। ডাকাত ধরতে না পেরে বিকেলেই দু'তিন জন পথচারি আর কোম্পানির দারোয়ানদের ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। এটাও এমনই হয়ে থাকে আজকাল।

যেতেই হলো প্রফেসরকে রমনা থানায়। সে যে কি অবস্থা থানার! কতো রকমের লোক যে আসছে যাচ্ছে। সবাই কথা বলছে উচ্চস্বরে। বেশ একটা হৈ হট্টগোল অবস্থা। ওসি সিটে নেই বলে অন্য কেউ ভালো করে কথাও বলছে না।

তিন ঘণ্টা বসে থাকার পর ওসি মহারাজ এলেন। প্রফেসরের কাছে সব শুনে তিনি ডাকলেন এক এস আইকে। সেই জানালো ঘটনার বিবরণ। ওসি কিছুই জানতেন না। মালিও এসেছে থানায়। ছেলেটা কেবল রোজগার করতে শিখেছে। এর মধ্যে সন্ত্রাসি মামলায় জড়িয়ে ফেললে ওর ভবিষ্যত অন্ধকার।

শ্যালিকাকে ফোন করলেন খায়ের সাহেব। আর এক বন্ধু রিটায়ার্ড এস পি দিলদারকে ফোন করলেন। সহস্র কথা হলো থানায় বসেই। প্রফেসর না গেলে কালই তাকে কোর্টে চালান দিতো। থানা হাজতে তো থাকতেই হতো আজ রাতে। আর কোর্টে গেলেই রিম্যান্ডে। তারপর সেখানে মারধর চলতো জবর। এমন কি হতে পারতো হাজত বাসও। পুলিশের পক্ষ থেকে মিথ্যে মামলা দেয়া তো ডালভাত আজকাল। যাক, কপাল ভালো যে, কামরানকে সাথে নিয়েই বাড়ি এলেন খায়ের সাহেব।

বিকেল থেকে মিলিও এসে বসে আছেন বেয়াই বাড়িতে। ইমতিয়াজের দেরি হবে আসতে। কি ধকলটা যে গেলো সারাদিন বেয়াইয়ের ওপর দিয়ে! মালির বউ এসে বসে আছে সেই দুপুর থেকে। কামরানকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। বললো, বউটাই হলো সর্বনাশী আম্মা। অপয়া এতিম মেয়ে জুটেছে আমার ছেলের কপালে।

আম্মা, মানে নাজিফা শুনেই রেগে গেলেন। বললেন, এসব কি কথা বলছো মালিবউ?

-ছেলেডার মুনে শান্তি নাই আম্মা। বউয়ের চাকরি বাকরি করা নিয়ে রোজই ঝগড়া করে দু'জনা।
-এটাতো খুব খারাপ কথা। একার আয়ে আজকাল সংসার চলে?
-ছেলে না পসিন্দ করলে সেডা শুনতে হবেই তো আম্মা।
-পছন্দ করবে না কেন? আজ না হয় একা আছে। ছেলেমেয়ে হলে তাদের মানুষ করবে কীভাবে? লেখাপড়া শেখাবে কি ভাবে? সেও কি মালি হবে নাকি?

এমন সময় ভানু এসে পড়লো টেকনিক্যাল থেকে। সবাই অভুক্ত। ক্লান্ত-শ্রান্ত। খাওয়ার আয়োজন করলো নাজিফা আর মিলি দুজনে মিলে। খাওয়ার পাট চুকে গেলে তারপর মালি, মালিবউ আর ভানুকে নিয়ে বসলো প্রফেসর, নাজিফা আর মিলি। কথাবার্তায় জানা গেলো, মালিবউ মোটে চায় না যে, ভানু পুরুষ মানুষের মতো বাইরে চাকরি করে। কিন্তু কামরান চায়। তাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই। মালিবউ ও বাড়িতে গেলেই ঝগড়া শুরু করে ছেলের সাথে। ভানুর সাথে নয়।

মালিবউ চায়, ছেলে বেতনের সব টাকা তার মাকে দেবে। যেমন দিতো বিয়ের আগে। ছেলে সেটা চায় না। মালিবউয়ের কথা হলো, তার ছেলে এমন ছিলো না। বউয়ের বুদ্ধি শুনে শুনে বিগড়ে গেছে ছেলে। চারমাস হলো বিয়ে হয়েছে এখনও পেটে ছেলেপেলের দেখা নেই। ছেলেটাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেলো। ভানু অপয়া বলেই তো এসব হচ্ছে।

খুবই বিরক্ত হন নাজিফা। শুধু ছোট শ্রেণি নয়, মূর্খও বটে। ওদের কথা বার্তার কোনো লাইন নেই। মানে নেই। যা মনে আসে বলে যায়। কম দুঃখে লোকে শ্রেণি তুলে কথা বলে না। চাকরির টাকা বউকে দেবে, এটাই তো স্বাভাবিক। নাজিফা জানতে চায়, মালি তার বেতনের টাকা তোমাকে দেয় না?
-দেয় আম্মা। নাহলে সংসার চলবে কেমন করে?
-কামরান তাহলে দোষ করলো কোথায়?
-ওদের তো এখনও সংসার হয়নি আম্মা।
-কে বলেছে হয়নি?
-ওদের বাড়ি ভাড়া লাগে না। বাজার করা লাগে না।
-কে বলেছে ওদের বাজার করতে হয় না?
-কিন্তু আমাকে কিছু টাকা না দিলে আমি একটু ভালো মন্দ খাবো কি করে? মানুষটা দুর্বল হয়ে গেছে। ছোটো ছেলেকে স্কুলে দিতে চাই। মেয়ে দুটা তো বিদায় হয়া গেছে শ্বশুর বাড়ি। আমি তো কামাই করি না আম্মা। ছেলেকে

মানুষ করেছি, তার কাছ থেকে কিছু পাবো না? মানুষ গাছ লাগায় তো ফল খাওয়ার জন্যই।

এইবার আসল কথাটা ধরতে পারে নাজিফা। মালিবউ চায় ছেলে তাকে টাকা দেবে। ওরা তো নিজের মনের কথাটাও গুছিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারে না। শুধু রাগ, হিংসে, ঝগড়া আর মারামারি। নিরেট জন্তু জানোয়ারের মতো জীবন কাটায়। মানুষের জীবন ওরা চেনে না। বোঝে না। শান্তি সমঝোতা জানে না। মিলি একটা কথাও বলেনি এ পর্যন্ত। সে তো মেয়েপক্ষ। আর ভানু কেমন, সেটা মিলি ভালোই জানে। দেখাই যাক না, বরপক্ষ
কি করে? কি বলে?

বোঝাপড়া একটা করে দিলো প্রফেসর আর নাজিফা। প্রতি মাসে মায়ের হাতে নির্দিষ্ট পরিমান টাকা দেবে কামরান। মালিটা নিরিহ। ছেলেটাও হয়েছে বাবার মতো। ভানু আসলেও লক্ষ্মী মেয়ে। নাজিফা তা জানে। মালিবউকে বলে দিলো, ভানুকে কখনও আজে বাজে গালি দিতে পারবে না।

ইমতিয়াজ আসার আগেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। তাতে খুশিই হয়েছে মিলি। বাঁচা গেলো। লোকটা এতো ঝামেলায় থাকে, তার ওপর এই উটকো ঝামেলা তার ভালো লাগার কথা নয়।

এই রেটিনা ডিটাচমেন্ট অপারেশন করতে গিয়ে ইমতিয়াজের মনে হয়েছে, সচেতন মানুষের উচিত মরনের পরে চোখ দান করে যাওয়া। অপারেশনের পর রোগীরা দেখতে পাবে কি না, সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না। না পেলে কি ভয়ানক কথা! যাদের একটা চোখের সমস্যা তারা এক চোখেই জীবন পার করে দিতে পারবে। আর যাদের দুই চোখে সমস্যা, তাদের জন্য জিন্দেগি বরবাদের মতো অবস্থা। কেনো যে এই কথাগুলো আগে মনে হয়নি, সেটা ভেবে নিজেই অবাক হন ইমতিয়াজ।

সুযোগ বুঝে একদিন বেড়াতে এসে কথাটা পেড়েই ফেললেন ডাক্তার। কানাডা যাওয়ার আগে বেশ ঘনো ঘনো যাওয়া আসা হচ্ছে দুই বাড়ির মধ্যে। বললেন, বেয়াই আমি ভেবেছি, আমার মৃত্যুর পরে দুটো চোখই দান করে যাবো।

মৃদু আর্তনাদ করে উঠলো মিলি আর নাজিফা।
-জীবিত থাকতে তো আর চোখ দিচ্ছি না। মৃত্যুর পরে মাটির নিচে পোকা মাকড়ই তো খাবে দেহের সব অঙ্গ। ইমতিয়াজ বলেন।
-বেয়াইয়ের প্রস্তাবটা ভালো। খায়ের সাহেব সমর্থন দেন।

-তার মানে তুমিও চোখ দান করবে নাকি? নাজিফা কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে স্বামীকে।
-তুমিও করতে পারো কাজটা গিন্নি।
-কি যে সব বলো যখন তখন? ভয় করে আমার।
-মৃত্যুটাই একমাত্র এমন সত্য গিন্নি, যা কোনোদিন মিছে হয় না। সে কথা শুনতে ভয় করবে কেনো?
-বেয়াই কিন্তু সত্যি কথাই বলেছেন বেয়ান। ইমতিয়াজ বলেন।
-মিলি কি বলেন? নাজিফা প্রশ্ন করে মিলিকে।
-পাগলের ঘর করলে সব সময় কথা বলতে নেই বেয়ান।
-তুমিও কিই ভয় পাও এসব কথা শুনতে? ইমতিয়াজ প্রশ্ন করেন।
-কে কখন মারা যাবে, সেটা কেউ কি জানে? আগে থেকেই ঢাক ঢোল পেটানোর দরকার আছে কিছু? মিলি বলে।
-ঢাক ঢোল পেটানো নয় গো মিলিরানি। এসব ঠিক ঠাক করে যেতে হয় এবং সেক্ষেত্রে পরিবারের লোকজনদের দায়িত্ব হলো, মৃত্যুর পর বিশেষ সংগঠনকে খবরটা সত্বর পৌঁছে দেয়া।
-আজ নিশ্চয় কেউ এসেছিলো?
-ঠিক ধরেছো মিলি। আমি ওদের ঠিকানা রেখে দিয়েছি। সেটা বেয়াইকেও দেবো।
-চলো এবার। অনেক রাত হয়েছে। কাল নাকি কোন দল হরতাল ডেকেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়াই ভালো।

দশ

আজকাল গ্রামের স্কুল এবং যাত্রাবাড়ির ক্লিনিক নিয়ে কোনো কথাই বলেন না ইমতিয়াজ। এটা স্বাভাবিক লাগে না মিলির কাছে। তার মা বলতো, শোক দুঃখ মানুষ ভোলে না। ক্রমেই তা চলে যায় বুকের একবারে ভেতরে। বিস্মৃতি হয়ে থাকে স্মৃতির ভেতরে। যেমন থাকে শুক্তির বুকের ভেতর মুক্তো।

একদিন জানতেই চাইলো মিলি, যাত্রাবাড়ির কেসের খবর কি?
-জানি না।
-কিছু শোনোনি?
-উমম শুনেছি।
-কই বলোনি তো আমাকে?

-তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি।
-সে আবার কি কথা? আমাদের সুখ দুঃখ কি আলাদা?
-শুনেছি, আজমত আলি ওখানে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরির সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। ইট বালি এসেছে। কাজ শুরু হবে।
-আসল দলিল পেয়েছে নাকি ও?
-আসল দিয়ে কি হবে মিলি?
-কি যে বলো না আজকাল? জমি জমার ব্যাপার। সাফ কবলা দলিল লাগে না? এতোবড়ো কাজ করতে যাচ্ছে?
-ঠিকই বলছি। নকল দিয়েই তো কাজ হচ্ছে দেখা যায়। তাহলে আসলের আর প্রয়োজন কি?
-হুম। বুঝেছি। কিছু বলার নেই আমার।
-কিছু বলতে চেও না। চুপ করেই থাকো।
-তাই বুঝি তুমি চুপ করে থাকো যাত্রাবাড়ির প্রকল্প সম্বন্ধে?
-কিসের প্রকল্প? এখন জোর যার মুল্লুক তার। কোন দেশের রাজা খোঁজ করেছে যে, প্রজারা কেমন আছে? কে কি করছে? কোন প্রকল্প ভালো, কোন প্রকল্প মন্দ? সেদিন গেছে মিলি।

আর কথা এগোয়নি। মিলি বুঝেছে, কতো বড়ো কষ্ট বুকের ভেতর চেপে লোকটা স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। এইরকম আর একবার দেখছিলো তাকে মিলি। যেদিন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিডি আর-এর নির্মম হত্যাকান্ডে মারা গেলেন। অনেক দিন লেগেছিলো তার স্বাভাবিক হতে। মাঝে মাঝে রাতে ঘুম থেকে উঠে বসতেন। কোনো কথা বলতেন না। এক গ্লাস পানি খেয়ে আবার শুয়ে পড়তেন। এই এক স্বভাব ওঁর। কথা বলে, রাগ ক্ষোভ প্রকাশ করে মনের ভার হালকা করেন না। তখন শুধু মুখ বুজে কাজ করে যান। সময় বাড়িয়ে দেন কাজের।

তাই তো ক'দিন থেকে বাড়ি আসতে ইমতিয়াজ রাত করছেন। সবই ঠিক আছে। কিন্তু কোথায় যেনো কি হয়েছে। সুর নেমে যায় বাঁশির হঠাৎ হঠাৎ। খাওয়ার টেবিলেই সেটা ধরা পড়ে বেশি। ভোজন রসিক মানুষ। বেশি খান না। তবে টেবিলের সব পদই নেন একটু করে। আর নানা মন্তব্য করেন মিলিকে খুশি করার জন্য। বেচারা যত্ন নিয়ে রান্না বান্না করে। রান্না খুব ভালো করে মিলি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু একটু প্রশংসা করতেই হয়। মন থেকেই করেন। সেখানেও তাল কেটে যাচ্ছে।

দেখা গেলো কোনো পদের দিকে তাকালেনই না। নারকেল কোরা দিয়ে কচুর লতি আর চিংড়ি মাছের রান্না হলে খুব খুশি হয়ে যান ইমতিয়াজ। সেটা দেখলেনই না সেদিন। রাতে খাওয়ার পরে কিছু না কিছু মিষ্টি রান্না করে মিলি। গাজরের হালুয়া পছন্দ করেন বলে গ্রেটারে গাজর কুরে ডিপ ফ্রিজে রাখে। মাঝে মাঝে হালুয়া করে। সেটাও খেলেন না কাল। তখনই বুঝেছিলো, কিছু একটা নিশ্চয় ভাবছেন ইমতিয়াজ। কিন্তু সেটা যে যাত্রাবাড়ির এই সংবাদে, তা মনেও আসেনি।

কি সাহস লোকটার? নকল দলিলের ভিত্তিতে বাড়িটা শুধু দখল করেনি। সেখানে বহুতল বাড়ি বানানোর ব্যবস্থাও করেছে। তুলে দিয়েছে সব ভাড়াটিয়াদের। ছেলেমেয়েরা সব শুনেও কিছু বলেনা। কারণ বলে কিছু লাভ নেই। আজমত নাকি বলেছে যে, তাদেরকে উচ্ছেদ করেও বাড়ি দখল করতে পারতো সে। কিছুই করতে পারতো না ছেলেমেয়েরা।

মাঝখানে শাকিল একবার ফোন করে বলেছিলো, আঙ্কেল, মিছেই আমরা ছোটো বেলায় জন্মভূমির গান করেছি, 'এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি'। আমাদের আর কিছুই থাকলো না দেশে। মা বাবা নেই, জমি বাড়ি নেই, পরিচয়ও থাকবে না একদিন। দেশে এলে থাকার জায়গা নেই। নিজের দেশে হোটেলে থাকবো আর নিজেদের লোপাট হয়ে যাওয়া সম্পদের দিকে তাকিয়ে থাকবো। সে দেশে মরেও শান্তি নেই আঙ্কেল।

সেদিনও বলেছিলো ইমতিয়াজ, কিছু বলার নেই বাবা। করার তো নেইই। আর তোমরা এতো দূরে থাকো।

তবে একটা দুঃখ ইমতিয়াজের, ছেলেরা ভালো করে জমি বাড়ি দখলে রাখার চেষ্টাও করলো না। আবার এও বলেছিলেন, দেশে থেকেই মানুষ নিজের সহায় সম্পদ দখলে রাখতে পারছে না, ওরা তো থাকেই না দেশে।

ইমতিয়াজ যখন মন উধাও করে দিয়ে গল্প করেন তখন বেশ বুঝতে পারে মিলি, বহুদূর থেকে তিনি কথা বলছেন। এমন সহজ আর সত্য মানুষটার কষ্ট সহ্য হয় না তার। সংসারে আর কতোই কাজ? ঠিকা বুয়া যখন চলে যায় তখন ভানু এসে পড়ে টেকনিক্যাল স্কুল থেকে। অন্যবার দারোয়ান, বুয়া আর ভানুকে রেখে বিদেশে যেতো। ওরা ইমতিয়াজের দেখা শোনা চালিয়ে নিতো বেশ ভালোই। এবার ইমতিয়াজও সাথে যাবেন। কাজেই ভানুর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়িতে তালা দিয়েই যেতে হবে। দারোয়ান আর মালি দেখে রাখবে। পাড়া প্রতিবেশিদেরকেও বলে কয়ে যাবে।

মিলির মেলামেশার চৌহদ্দি খুব ছোটো। তাদের কারো কাছেই রাখা যায় না ভানুকে। বেয়ানকে বলে দেখতে হবে যদি তাদের বাড়িতে থাকতে পারে ভানু আর কামরান? ওদেরও আছে বাহির বাড়ি। সেখানে ড্রাইভার থাকে। টিন কিনে আর একটা ঘর উঠিয়ে দেয়া যায়। তাহলে মানুষজনের মধ্যে থাকতে পারবে। কামরান তো তাদেরই চেনা মানুষের ছেলে। ভানুও অচেনা নয়।

দিন এগিয়ে আসছে। তুর্কি এয়ার লাইন্সের টিকিট আগে করলেও যা পরে করলেও তা। বাংলাদেশে ফ্ল্যাট ব্যবসা। কমা বাড়া নেই। সিজন নেই। তাই তাড়াও নেই। মিলির অনেক দিনের ইচ্ছে ইস্তাম্বুল নগর দেখা। হাজার বছরের বেশি ধরে এই নগর গড়ে উঠেছে। কতো আসাধারণ চোখ ধাঁধানো স্থাপনা আছে। পর্যটকের ঢল নেমেই থাকে সারা বছর। কামাল পাশার প্রাণের শহর।

ইমতিয়াজের মনে যে আসেনি কথাটা তা নয়। সে রাজি হয়ে যায়। বেড়াতেই যখন বের হবে তখন ইস্তাম্বুল নগরটা এবার দেখেই যাবে। তাহলে ট্রানজিট নিতে হয় ইস্তাম্বুলে। এখন তো ইন্টারনেটেই হোটেল বুকিং করা যায়। তাছাড়া ট্রাভেল এজেন্টও করে দিতে পারবে। সমস্যাটা ছিলো সিদ্ধান্ত নিয়ে। সেটা হয়ে গেছে। তারা ট্রানজিট নেবে ইস্তাম্বুলে চার দিন।

ভানুকে তাদের বাসায় রাখার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে খুব ভালো হলো। বেয়াই বেয়ান দু'জনেই তাদের প্রোগ্রাম শুনে আগ্রহী হলেন ইস্তাম্বুল যেতে। বেয়াই ভার নিলেন কোথায় কোথায় যাওয়া হবে, কি কি দেখা হবে তার তালিকা করার। কিন্তু মুশকিল হলো, তুর্কি ভিসা নিতে গিয়ে সেখানে কোনো তথ্য পাওয়া গেলো না। যদিও আজকাল ইন্টারনেটেই সব তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু দেখবে কে? কারোই সে বিদ্যা নেই বলতে গেলে। তবে প্রফেসর বললেন, তার ছাত্রদের দিয়ে তিনি কাজটা করিয়ে নিতে পারবেন।

ইস্তাম্বুলের প্রোগ্রাম শুনে নিরার কি আফসোস। মাসুমও বললো, নিরা ক্যারিং না হলে তারা সবাই আসতো ইস্তাম্বুলে। মিলিরও আফসোস হয়। ইমতিয়াজ বলে, কি জীবন কাটিয়ে দিলাম মিলি! এতো বড়ো পৃথিবী, কয়টা দেশ আর ঘুরলাম? বাড়ির পাশে নেপাল ভুটান, সেও দেখা হয়নি। আসলে মানুষ যা চায় তা পায় না। আর যা পায় তা চায় না। এটাই চিরসত্য।

মিলি বুঝেছে, এবার গ্রামের স্কুলের কথা মনে পড়েছে ইমতিয়াজের। আর যাত্রাবাড়ির ঘায়ে ব্যথা চিন চিন করছে।
মিলি বলে, এই তো এইবার যাবো ইস্তাম্বুল। এটা তো চেয়েছিলাম। এবার পাবো ইনশাআল্লাহ। তাই না, বলো?

হাসে ইমতিয়াজ। বলে, আমার সারিন্দা সুর ধরতে পারে খুব ভালো। না গাইতেই বোঝে কোন গান বাজবে এবার।
-এতকাল ঘর করলাম, এটুকু না বুঝলে চলে? হাসে মিলি।
-যাই বলো মিলি, আমি কিন্তু ভাবিনি যে বেয়াই বেয়ান ইস্তাম্বুল যেতে চাইবেন আমাদের সাথে।
-আমিও না। আসলে বেয়ান খুবই ঘরকুনো। সেবার শ্রীমঙ্গল যেতে বললাম, রাজি হলেন না। জাফলঙেও গেলেন না। আমরা মাধবকুন্ডুর ঝর্না আর পাথর নদী বেশ উপভোগ করলাম।
-তাই তো ভাবছি, এবার একেবারে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত যেতে রাজি।

ভানুর বিয়েটা কাকতালীয় ঘটনার মতো ঘটে গেছে। সেটা সত্যি একটা কপাল। কানাডায় যাওয়ার কথা তো অনেক দিন থেকেই। তো ভানুকে রাখা নিয়ে সমস্যা। এখন তো আর মা নেই খালা নেই যে বাড়িতে এনে রেখে যাবে? দুই বেয়ানে গল্প করতে করতে নাজিফা হঠাৎ বললো, ভানুর বিয়েটা দিয়েই যান এবার।
-মানে? কার সাথে? কোথায়?
বাড়ি এসে মিলি বলে ইমতিয়াজকে, জানো, বেয়ান একটা প্রস্তাব দিলেন ভানুর জন্য।
-কি ব্যাপারে?
-ওদের মালির ছেলে কামরানের সাথে ভানুর বিয়ের।
-কি করে ছেলে?
-একটা কোম্পানিতে সিকিওরিটি গার্ডের ট্রেনিং নিয়ে চাকরি করছে।
-লেখা পড়া জানে?
-গ্রামের স্কুলেই লেখাপড়া করেছে। এস এস সি পরীক্ষা দেয়ার পর ইচ্ছে থাকলেও পারেনি টাকার জন্যে। মালি বুদ্ধি করে ওকে দারোয়ান, মানে সিকিওরিটির কাজের মধ্যে নিয়ে এসেছে।
-তা ভালোই করেছে। আজকাল প্রাইভেট বাসাতেও কোম্পানির লোক রাখে। আমরা তো রাখিই। ওদের একটা জবাবদিহিতা থাকে।
-এই ছেলের জবাবদিহিতা থাকবে। কারণ তার বাবা বেয়াইদের বাসার মালি। বহুদিন থেকে আছে। মিলি প্রস্তাবটার পক্ষে কথা বলে।
-মন্দ হয় না মিলি। ভানুর বাপ নেই মা নেই, তিন কুলে কেউ আছে বলে দেখিনি। আমাদের কাছে মানুষ হয়েছে এটাই ওর পরিচয়।
-তুমি একটু ভেবে বলো।

-আমি কি বলবো? তুমি যদি ভালো মনে করো, তাহলেই হলো। দেখেছো ছেলেটাকে কোনোদিন?
-দেখেছি। তুমিও দেখেছো। মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় বাগানের শাক সবজি পাঠিয়েছেন বেয়াই কামরানের হাতে।
-খেয়াল করি নি।
-স্বভাব আক্কেল বেশ ভালো। এদের বংশধরেরাই তো হবে মধ্যবিত্ত শ্রেনির মানুষ। আমাদের ড্রাইভারের ছেলেও তো কোন ব্যাংকে সিকিওরিটির কাজ পেয়েছে। এদের ঠিক আগের জেনারেশনের যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি আমরা দেখি, সে তো এরাই গড়ে তুলেছিলো। মনে নেই, আমাদের ড্রাইভারের ছেলে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময় ঝামেলা হলো? মেধাবি ছাত্র হয়েও সে ভর্তি হতে পারলো না। এখন ভাবলে দুঃখ হয়।
-হ্যাঁ মনে আছে। সেই ছেলে এখন স্কুলের টিচার হয়েছে।
-আমাদের ভানুর ছেলেমেয়েরাও একদিন কলেজে পড়বে। ইউনিভার্সিটিতে পড়বে। ভালো চাকরি করবে। এই যে একটু হাত ধরে তুলে দিয়েছি, এরা আর নিচে নামবে না।
-ভানুর বয়স কত হলো?
-মনে হয় সতরো বা আঠারো হবে।
-তাহলে আমরা এগোতে পারি মনে হয়।
-আমি হিসেব করেই রেখেছি।
-আমি ভাবলাম, বউয়ের উৎসাহে ভানুর বিয়ে দিতে গিয়ে পাছে বাল্যবিবাহের কেসে পড়ি কিনা?
-ও, আমার সম্বন্ধে এই ধারণা তোমার? গাল ফোলায় মিলি।
-দূর পাগল, আমি ঠাট্টা করেছি। দেখলাম রাগ করো কিনা?
-দিন দিন তুমি ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছো ইমি।
-এখন থেকে এটাই আমার নাম?
-কি করা বলো? যখন তখন তো আর রাজা বলতে পারি না।
-মানলাম। এখন থেকে এটাই আমার এনডিয়ারমেন্ট এড্রেস।

কথাই আছে, জন্ম মৃত্যু বিয়ে, এই তিন বিধাতা নিয়ে। সময় কম হাতে তবু দুই পরিবারের আন্তরিকতায় ভানুর বিয়ে হয়ে গেলো। খুব খুশি হলো নিরা। সেও ভাবতো ভানুকে নিয়ে। কি হবে অবশেষে ওর? নিরা কিছু টাকা পাঠালো ভানুর জন্য। ঠিক হলো, ওরা চলে যাবে খায়ের সাহেবের বাড়িতে। দারোয়ান ড্রাইভার আর মালি তো আছেই দুই বাড়িতে।

কোথাও যেতে হলে কতো দিক যে গোছাতে হয়! ঘর বাড়ি দেশ ছেড়ে বাইরে যেতে গেলে মনে হয় পায়ে পায়ে বাঁধন পড়ে। মাটি মানুষের টান তো আছেই। আর আছে নিজের হাতে গড়ে তোলা সাজানো সংসার। তিন চার মাস ধরে চলছে সাজ গোজ। একটা জিনিস ভালো হয়েছে, কামরানকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলাটাও মিটে গেছে তাদের উপস্থিতিতে।

নির্দিষ্ট দিনে দুই বেয়াই আর দুই বেয়ানের উড়াল শুরু হলো। এক উড়ালেই ইস্তাম্বুল। ঢাকা থেকে সাড়ে ছয় ঘণ্টার মতো লাগে। সব ঠিক করাই ছিলো। দুই ঘরের একটা ছিমছাম ফ্ল্যাট। ইচ্ছে করলে চা কফি করা যায়। পানি ফোটানোর পাত্র আছে। ছোটো কিচেনে কাপ মগ সব আছে। কিন্তু কেউ সেদিকে গেলো না। বাইরে এসে একটু নবাবি করতেই হয়। কোথা দিয়ে কেটে গেলো চার দিন, বোঝাই গেলো না।

আবার শুরু হলো উড়াল। এটা বেশ লম্বা। শূন্যর পথে কোনো নড়াচড়া না থাকার জন্য মিলির অসহ্য লাগে। ইমতিয়াজ বেশ ঘুমাতে পারছেন। মিলির চোখে রিভার ক্রুজের দৃশ্য ভাসছে। ছোটো বেলায় বসফরাস প্রণালির কথা পড়েছে ভূগোলে। এই প্রণালি নাকি তুর্কিকে ভাগ করেছে এশিয়া আর ইউরোপে। বসফরাসের পুবদিকে এশিয়া, আর পশ্চিম দিকে ইউরোপ। তার ধারণা ছিলো, কৃষ্ণসাগরের পানি কালো হবে। ইমতিয়াজ শুনেই হেসে ফেলেছিলেন।

রাগ করে না মিলি। যা জানে না তা জানে না। এখন তো দেখলো। প্লেনটা ইস্তাম্বুলে নামার সময়েই বসফরাসের ওপর দেখা যায় বহু নৌকো। আর পানিতে কেউ যেনো নীল ঢেলে রেখেছে। কি অসাধারণ সেই রং! ব্লু মস্কে যাওয়া হলো না। কারণ বোমা ফেটে অনেক পর্যটক মারা গেছে দুপুরের ঠিক আগেই। কি যে দুঃখ মনে তা আর বলার নয়। আজকাল কি মানুষ কোথাও ভ্রমণে যেতেও পারবে না? বিকেলে তাদের সেখানে যাওয়ার কথা ছিলো। মধ্যরাতেই তো উড়াল। আর যাওয়া হবেও না। কোনোদিনও না।

বাজারটাও ঘুরে দেখার মতো। অসাধারণ। কিছু কেনাকাটা হয়েই গেলো। বেয়ানরাও বেশ কিছু সুভেনির কিনেছেন। আসলে না কিনে উপায়ও থাকে না। এতো নজরকাড়া জিনিস দেখে কতক্ষণ মন টেনে রাখা যায়?

একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস পড়ে মিলির। ভাবে, মানুষ ভাবে এক, আর আসমানের ওপর বসে বসে হাসেন এক মহাজন। কেনো এমন করলে তুমি মহাজন? আর কি আসা হবে কোনোদিন? কে জানে? মনে মনে মিলি ঝগড়া করে তার মহাজনের সাথে। বিশেষ করে ইমতিয়াজের সাথে ঘুরতে তার খুব ভালো

লাগে। ভ্রমন সঙ্গী হিসেবে সে খুবই ভালো। তার ওপর এবার সাথে ছিলেন বেয়াই বেয়ান। ওরা থেকে গেলেন। কাল যাবেন আঙ্কারা। সেখানে দু'দিন থেকে ব্যাক টু ইস্তাম্বুল। হয়তো তখন ব্লু মস্ক দেখবেন। তারপর ঢাকায় ইন, মানে নিজের বাড়ি। হাসে একা একাই। সিটের পেছনের টিভি অন করে। হেড ফোন কানে লাগিয়ে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করে। ভালো লাগে না।

এবার দুজন একসাথে নায়াগ্রা ফলসে যাওয়ার ইচ্ছে। দেখা যাক ঐ মহাজন কোন অংকের খাতা নিয়ে বসে আছেন। পৃথিবীর সাত আটশো কোটি মানুষের হিসেব উনি রাখেন কি ভাবে, সেটাই এক বিস্ময়। এসব কথা বললে ইমতিয়াজ হেসে বলেন, কে তোমাকে এইসব শিখিয়েছে?
-কে আবার? আমি নিজেই।
-তবে তোমার মুখে শুনতে বেশ ভালোই লাগে।
-বলো সত্যি করে, আমার কথা ঠিক কি না?
-ঠিক ঠিক, একেবারে ঠিক মিলি। নইলে আমার চাওয়াগুলো এমন ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে? আমি কি কোনো ভুল কাজ করতে চেয়েছিলাম? বলো?
-শোনো রাজা, আমরা জানি না কোন কাজটা আমাদের মঙ্গল বয়ে আনবে, আর কোনটা নয়। হয়তো কোনো ভালো লুকিয়ে আছে এর ভেতর। আমি তাই বিশ্বাস করি।
-তোমার বিশ্বাসগুলো এতো সহজ সরল যে তর্ক করতে ইছে হয় না। আমি যদি পারতাম তোমার মতো।
-কারণ এই ভাবে বিশ্বাস না করলে আমরা বাঁচবো কি করে?
-আচ্ছা, শয়তান লোকের কি সত্যি সাজা হয় মিলি?
-অবশ্যই হয়। ঐ তার বিচারে কোনো ভুল নেই।

অবশেষে যাত্রা শেষ হলো। বাপরে বাপ! পা ফুলে গেছে মিলির। মনে হচ্ছে গোদ হয়েছে। জুতো পরা যাচ্ছে না। বার বারই হয়েছে। এবার একটু বেশি ফুলেছে। প্লেনের দেয়া স্লিপারটা পায়ে দিয়েই তাকে নামতে হলো। এয়ার পোর্টে সবাই ছিলো। মনে হয় পারলে পরে কথা উড়ে আসে তাদের কাছে। লাগেজ বেশি নেই। দু'জনের দুটো চার চাকা ওয়ালা সুটকেস। হাতে একটা বড়ো ব্যাগ। তাতে দু'জনের ঔষধ পত্র। খুব তাড়াতাড়ি আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলো।

প্রায় আধ ঘণ্টার ড্রাইভ। বাড়ির পাশেই পার্ক। নানা রঙের কাপড় পরে বাচ্চারা খেলছে। যেনো প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে সারা পার্কে। নতুন বাসায় এই প্রথম তারা এলো। তিন রুমের সুন্দর বাসা। মা বাবার জন্য নিরা আর মাসুম ঘর তৈরি করেই রেখেছে। আসলে এটাই হবে বেবির ঘর।

এই তো একটা মাস। তারপর হাওয়াই পাখনা মেলে দিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পাগলা বাতাস বইতে শুরু করবে সেপ্টেম্বর থেকে। নিরার মতো হলো, মা বাবা নায়াগ্রা ঘুরে আসুক। কিন্তু মিলির ইচ্ছে, নাতি আসুক আগে কোলে। মাসুমের সখ ছিলো একটা মেয়ের। কিন্তু ঘরে আসছে আবার ছেলে। নিরার ইচ্ছে আবার একটা চান্স নেবে। তার কথা হলো, মেয়ে না থাকলে ঘর মানায়? কিন্তু ভেটো দিয়েছে মাসুম। কারণ এবারই নিরার সমস্যা আছে। ওপরওয়ালার দয়ায় সেটা কেটে গেলে আর বেলতলাতে না।

মিলি হাসে ওদের কথা শুনে। মনে পড়ে ইমতিয়াজের কথা। খুব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে আর ঝুঁকি নিতে চায়নি। প্রথমটার কথা জানে না কেউ। সিক্রেটই থেকে গেছে। মিলি কতো বলেছে, আমাকে ক্ষতিপূরন দিতে হবে। সে এক সময় গেছে। মধুর ঝগড়ায় দুজনের কথাও বন্ধ হয়ে গেছে কতোবার। কিন্তু ইমতিয়াজ অটল। মিলির ধারণা, হয়তো তাই তারা ভানুকে পেয়েছিলো। তাকে মানুষ করেছে প্রায় কন্যার স্নেহে। ভালো থাক জনমদুখি মেয়েটা।

সোরায়ার কথা মিলিকে জানায়নি নিরা। মিলি জিজ্ঞাসা করবে করবে করে ভুলেই যায়। একদিন মিলি জানতে চায়, আমি এতোদিন হয় এসেছি, সোরায়া আসলো না যে? ও কেমন আছে? আর ওর বাচ্চা?

নিরার মুখে কথা যোগায় না। কি বলবে মাকে? মিলির কেমন সন্দেহ হয়। কি রে কিছু বলছিস না যে?
-তুমি কষ্ট পাবে তাই বলিনি তোমাকে মা।
-তার মানে খারাপ খবর আছে, এই তো?
-হ্যাঁ মা। অপারেশন করে বাচ্চাকে বের করলো কিন্তু মা বাচ্চা কাউকেই বাঁচাতে পারলো না।
অস্ফুট একটা কষ্টের শব্দ করে মিলি।
-রাহিমের ডিপ্রেশন হয়ে গেলো। ক্লিনিকে ওর চিকিৎসা চলছে।
-আহারে! কেনো যে মানুষের এতো কষ্ট এই দুনিয়ায়?
-মন খারাপ করো না মা। যাও তোমার গোছগাছ দেখে নাও। বিশেষ করে তোমাদের ঔষধপত্র চেক করে নাও ভালো করে। পরশু খুব সকালে রওনা দিতে হবে।
সোরায়ার ঘটনায় মিলির মন এতো খারাপ হয়ে গেছে যা বলার কথা নয়। আগামি মাসেই বাচ্চা হবে মেয়েটার। ওর কাছে থাকার জন্যই তো এখানে আসা। মনে হলো, এই সময় নিরাকে রেখে তাদের নায়াগ্রা দেখতে যাওয়া ঠিক হবে না। বাচ্চাটা পৃথিবীতে এসে যাক, তারপরেই যাওয়া যাবে। কোনো কথা না বলে মিলি নিজের ঘরে যায়। ইমতিয়াজ খুব মনোযোগ দিয়ে টিভি

দেখছিলো বসে বসে। এই কদিনে যতো ঘণ্টা টিভি দেখলো, দেশে থাকতে ছয় মাসেও এতো ঘণ্টা দেখা হয় না।

মিলি ঘরে যেতেই ইমতিয়াজ বললো, এক কাপ কফি খেলে কেমন হয়?
-একবার তো খেয়েছো সকালে।
-খেতে ইচ্ছে করছে আর একবার।
-দেশে তো দু'বার কফি খেতে চাইতে না।
-এমন অবসর দেশে হতোও না।
-প্রেসার ঠিক আছে তো? পরে ব্লাড থিনার ট্যাবলেট খেয়েছিলে?
-আহ হা, একেবারে ভুলে গেছি মিলি।
-তাই তো বলি, একবারেই সব ঔষধ খেয়ে নাও। যেমন আমি করি।
-একসাথে অতোগুলো ঔষধ খেতে পারিনা যে!
-এই নিয়ে তিনদিন হলো এমন ভুল।
-ঠিক আছে, কাল থেকে তোমার পন্থাই চালু করবো। সেজন্য মুখ ভার করো না ভাই। কফিটা আনো, আমি কফি দিয়েই ঔষধ খেয়ে নেবো।
-আজ প্রেসার মেপেছো?
-ডাক্তার কে? তুমি না আমি?
-কথা ঘুরিও না। মেপেছো কি না তাই বলো?
-হা হা হা, সেটাও হয়নি আজ। তবে ভালোই আছে মনে হয়।
-এসব ঠিক না একেবারে। এদেশে এসে প্রেসার একটু বেশির দিকেই আছে। আমি মাসুমকে বলে ডাক্তারের কাছে নিতে বলবো।
-না না এতো ব্যস্ত হয়োনা। ওদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলো না প্লিজ। সোনা বউ আমার।
-ওতে ভুলবো না আর। এখন তো আর অন্য মানুষ লাগে না প্রেসার দেখতে। মেশিনটা টেবিলের ওপরেই রাখি যাতে ভুলে না যাও। তবু আলসেমি করো তুমি।
-হয়েছে কি, বসে বসে সত্যি আলসে হয়ে গেছি। তো কফি কি পাবো জনাব?
-আনছি। তুমি প্লিজ প্রেসারটা চেক করে নাও ততোক্ষণ। হাসে মিলি ইমতিয়াজের কথার ধরন দেখে।

কফি খেতে খেতে ইমতিয়াজ জানতে চায়, কখন বেরোবো আমরা পরশু? সময় ঠিক করা হয়েছে?
মিলি চুপ করে থাকে।
-কি হলো? আমি একটা কথা জানতে চেয়েছি তোমার কাছে ভাই।

-ভাবছি, নিরার বাবুটা হয়ে গেলেই যাই। এতোটা পথ এসেছি মেয়েটার কাছে কাছে থাকবো বলে। আর এই সময়ে দূরে যাবো চারদিনের জন্য? ভরা সময়, যে কোনোদিন ব্যথা উঠতে পারে।
মন টানছে না গো।
-তা মন্দ বলোনি কথাটা।
-তাহলে জানিয়ে দিই নিরাকে। হ্যাঁ বলো, প্রেসার কেমন আজ?
-উমম, চলে।
-তার মানে বেশি? এই তো?
-সামান্য।
-ওপরেরটা না নিচেরটা?
-দুটোই।
-মন খারাপ করে দিলে তো?
-এক কাজ করো, আজ দুপুরে আর রাতে দুবেলাই সুপ খাবো। এখানে এসে খাওয়াও বেশি হচ্ছে কিনা।
-দুপুরে সুপ খেলে ভালো। কারণ মাসুম চাইবে রাতে সবাই একসাথে ভাত খেতে।
-কি রান্না করছে আমার মেয়ে আজ?
-আমি করেছি রান্না। ওকে একটু বিশ্রাম দিতে চাই। এসেই যখন পড়েছি।
-তো রান্নাটা করলে কি?
-দুপুরের জন্য বেগুন আর টমেটো দিয়ে তেলাপিয়া মাছ, সজনে দিয়ে ডাল, করলা ভাজি আর শুকনো মরিচ ভেজে আলুর ভর্তা।
-উহ! কোন প্রাণে আমি সুপ খাবো বলোতো মিলি?
-তুমিই তো খেতে চাইলে।
-তখন তো আর তোমার মেনু জানতাম না?
-ছেলেমানুষি করোনা রাজা।
-কোনোটাই কিন্তু গুরুপাক রান্না নয়। মাছ তো সব সময় খাওয়া যায়। আর রাতে অবশ্যই খাবো সবজি সুপ। তা মেনু যাই থাক। তবু শুনি কি খাওয়া হবে রাতে?
-মাসুম বলেছে মুরগির সাসলিক আর নান রুটি আনবে। আমি রান্না করেছি মুরগি কিমা দিয়ে ক্যাপসিকাম স্টাফড আর একটা নিরামিষ। পরে সালাদ করবো।
-রাতের খাবার আমি স্যাক্রিফাইস করবো। তবে একটা শর্ত।
-কি সেটা?
-একটা সাসলিকের স্টিক আর একটা স্টাফড ক্যাপসিকাম দিতে হবে।

-এমন হয়েছো কেনো তুমি? খাওয়া নিয়ে বাচ্চাদের মতো করোনি তো কোনোদিন?
-কথা আছে না, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা? এখানে এসে অবধি টিভি দেখা আর খাওয়া। ক'টা দিন ক্রিকেট খেলা ছিলো, এখন তাও নেই। বুঝতেই পারছো ভাই।
-জানি না কি বলবো।
-এটাও বলতে পারবে না যে, নেই কাজ তো খই ভাজ। খই ভাজার সাজ সরঞ্জাম যোগাড় করা যাবে না এখানে। হা হা হা--

দু'তিনদিন থেকে রোজই একটু একটু ব্যথা হচ্ছে নিরার। নিজে নিজে ক্লিনিকেও যাচ্ছে। ডাক্তার বলেছে, এগুলো ফলস পেইন। তবে যেকোনো সময় লেবার পেইন উঠতে পারে। আর যদি পানি লিক করে, তাহলে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্লিনিকে চলে আসতে হবে। বাসায় গাড়ি না থাকলে ফোন করে দিলেই যাবে এম্বুলেন্স। তাছাড়া ব্রিজ বেবি তো। সময় পুরো না হলেও যে কোনো সময় ডাক্তার অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

বিদেশে এসে বেশ শক্ত হয়েছে নিরা। কথার জন্ম হয়েছিলো নরমাল। কিন্তু এটা ব্রিজ বেবি। অপারেশন করতে হবে।
ইমতিয়াজ বলে, এটাই হবে আসল ভূমিপুত্র। অভিবাসী মা বাবার সন্তান আর অভিবাসী হবে না।
-নিরা মাসুম তো বাংলাদেশি। সেই সূত্রে এই বেবিটা একেবারে বিদেশি কি করে হয়? মিলি যুক্তি তোলে।
-হয় হয় মিলি। এর জীবনে কানাডাই আসল দেশ হবে।
-তা হলোই বা। যাওয়া আসা তো থাকবে।
-বেঁচে থাকতে থাকতে আমাদের বাড়িটা দান করে যেতে হবে।
-কেনো? কেনো দান করবে?
-নাহলে ভূতের বাড়ি হবে। তবে মানুষ ভূতেরাই দখল করে নেবে। আমি অভাবে তুমি একলা ঐ বাড়িতে পারবে না থাকতে।
-কি সব বলো না আজকাল?
-যা বাস্তব তাই বলি ভাই। দেখলে তো যাত্রাবাড়ির ঘটনা।
-আর আমি অভাবে তুমি খুব সুখে থাকতে পারবে, তাই না?
-প্লিজ মিলি, আমার আগে চলে যাওয়ার ধান্দা করো না। জীবনে অনেক ধান্দা সয়েছি। তোমার ধান্দা সইবে না।
-তাহলে তুমিও আজে বাজে কথা আর বলো না। আমার ভয় লাগে। পছন্দ করি না আমি।

-মনটা ভালো থাকে না আজকাল মিলি। মেয়ে তো আর দেশে থাকার জন্য ফিরবে না। দেখা হবে কালে ভদ্রে। তো বাড়ি রেখে কি করবো? বলো?
-কি আর করা? পৃথিবী বদলে গেছে। অনেক দিন থেকেই শুনছি, পৃথিবী এখন 'গ্লোবাল ভিলেজ'। সেটা বুঝিনি। এখন তা বুঝতে পারছি হাড়ে হাড়ে।
-সেই বিশ্বগ্রামে আমরা কোথায় থাকবো?
-নিজের দেশে থাকবো। পরিযায়ী পাখির মতো মৌসুমি আসা যাওয়া হবে আমাদের, মিলি বলে।।
-তোমাকে একটা কথা বলতে চেয়েও বলতে পারছি না।
-কি এমন কথা যে, আমাকে বলতে পারছো না? বলো প্লিজ।
-না, এমন কিছু না। ভাবছি, এবার দেশে গিয়ে মা বাবার কবর জিয়ারত করবো। সেদিন স্বপ্নে দেখলাম মা বাবাকে। বিমর্ষ হয়ে দেশের বাড়ির দাওয়ায় বসে আছেন।
-কিন্তু আমাদের সেই বাড়ি তো নেই। সেখানে হিমাগার উঠেছে।
-কবরস্থানে যাবো। মিলাদ দেবো। কিছু সাহায্য করবো গরিব মানুষদের। চলো বাড়ি যাই। নায়াগ্রা টায়াগ্রা যাবো না। দেশের মাটি আমাকে টানছে। আর ভালো লাগছে না এখানে।

আজকাল কি সব যে ভাবে একা একা বসে লোকটা! আসলে কাজের মধ্যে থাকলেই ভালো থাকেন ইমতিয়াজ।

ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেলো। নাম তো আগেই ঠিক করে রাখতে হয় এদেশে। বাবা মা 'আদর' নাম পছন্দ করে রেখেছিলো। রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলো জন্মের সাথে সাথেই। একেবারে মাসুমের মতো কপাল আর নিরার মতো ঠোঁট আর চিবুক। তবে এই চেহারা কতোবার বদল হবে! মেশানো চেহারাই হবে।

পাঁচদিন পর নিরা বাড়ি এলো নতুন বাবুকে নিয়ে। দিব্যি হাঁটা চলা করছে। দেখে মনেই হচ্ছে না, মাত্র পাঁচদিন হলো বাবু হয়েছে। মিলির তবু ভয়। না জানি কোথায় ব্যথা পায় মেয়েটা? বলে তুই শুয়ে রেস্ট নে বাবা। আমি সব সামলে নেবো।

বন্ধুরা দাবি করেছে একটা খাইদাই চাই। মাসুমও খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেছে। নিরা চাইলো বাড়িতেই সে রান্না করবে। মিলি তাতে রাজি না। তার কথা হলো, চল্লিশদিন না হলে পরিশ্রম করা চলবে না। সেই পুরনো নিয়ম মায়েদের।

নিরা বাবার কাছে নালিশ জানাতে গিয়ে দেখে বাবা বুকে ম্যাসাজ করছেন। বলে, কি হয়েছে বাবা? বুকে ম্যাসাজ করছো কেনো?
-মনে হয় গ্যাস হয়েছে। আদর এসেছে পর থেকে তো খাওয়ার কামাই নেই। এই বয়সে এতো খাওয়া ঠিক নয় মা।
-মাকে বলি লিকুইড এন্টাসিড দিতে?
-না না আমি নিজেই নেবো।
-ঠিক আছে আমিই নিয়ে আসছি। নিরা চলে যায় কাবার্ডের ওপর রাখা ঔষধটা আনতে। এমন সময় মিলি নিরাকে ডেকে বলে, এই জুসটা দিয়ে আয়তো তোর বাবাকে।
-একটু পরে দিই মা। আগে ওষুধ দিয়ে আসি।
-কি ওষুধ? কাকে? মিলি বুটের হালুয়া করছিলো। কেবল দলা পাকিয়ে আসছে। এখন নাড়া দিতে হবে ভালো করে।
-লিকুইড এন্টাসিড। বাবাকে দেবো। নিরা বলে।
-কাল রাতেও একবার বলেছে, গ্যাস হয়েছে। বললাম, ওষুধ দিই। বললো, থাক।
-আমি নিয়ে যাই তো। দেখি খাওয়াতে পারি কি না। নিরা বলে।
-তুই যা, আমি হালুয়াটা প্লেটে ঢেলে দিয়েই আসছি।

কয়েক মিনিটের মধ্যে মিলির পৃথিবীটা উল্টে গেলো। উত্তর মেরু যদি দক্ষিণ মেরুতে উল্টে আসতো তাহলেও এতোটা অসম্ভব মনে হতো না ঘটনাটা। নিরা ঘরে গিয়ে দেখে ইমতিয়াজ নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। শুধু টল টলে চোখে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো খোলা কিন্তু দৃষ্টি নেই।
নিরা ভাঙা গলায় ডাকলো, মা ওমা তাড়াতাড়ি ঘরে এসো।

ছুটে আসে মিলি। একি? কি হলো ইমতিয়াজের? বলে, কি হলো তোমার? কোথায় কষ্ট বলো? মিলি দিশেহারা হয়ে যায়। ইমতিয়াজের দুই গালে হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরে, বলে, কথা বলো প্লিজ। কি হয়েছে বলার চেষ্টা করো। শুনছো? এই যে আমি ডাকছি তোমাকে। কথা বলো।

ইমতিয়াজের চোখের কোন থেকে টপটপ করে পানি পড়লো। টলটলে চোখে শূন্য দৃষ্টি। জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা মিলির।

কি করবে এখন? বিদেশ বিভুঁইয়ে কি বিপদ হলো?
নিরা দৌড়ে গিয়ে ফোনে ডাক্তার ডাকে।
ইমতিয়াজ তখন চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। নিঃশ্বাসের লক্ষণ নেই দেহে। সোফার ওপর এলিয়ে পড়েছে মানুষটা। যেন ঘুমের ভারে আর বসে থাকতে পারেনি।

ডাক্তার এলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই। কতো কিছু যে করলো। নাকে অক্সিজেনের টিউব দিলো। বের করলো কতো রকম মেশিন পত্র! বুকে চাপ দিয়ে পাম্প করতে লাগলো একজন।
মিলির মনে হলো সে কোনো সিনেমা দেখছে। নিরা মাসুমকে ফোন করে আসতে বললো বাসায়। শুধু বললো, বাবাকে হাসপাতালে নিতে হবে।
মাসুম হতভম্ব হয়ে যায়। বলে, কি হয়েছে বাবার?
কাঁদতে কাঁদতে বলে নিরা, জানি না। তুমি যতো তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো।
ডাক্তারেরা নানা রকম চেষ্টা করেই যাচ্ছে। মিলিকে সরে যেতে বলেছে ঘর থেকে। কারণ বুকে চাপ দেয়ার দৃশ্যটা বড়োই কঠিন। অনেক সময় রোগীর বুকের বাতা ভেঙেও যায়। রোগী ভালো হলে পরে তার চিকিৎসা হবে। প্রথমে ডাক্তারেরা চেষ্টা করেন হার্ট সচল করতে। হার্টের স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে।

মিলি কোন প্রাণে যাবে ইমতিয়াজকে ছেড়ে? কার্পেটের ওপর বসে আছে সে পাথরের মতো। ভাবছে, বিদেশের জীবন যিনি পছন্দই করতেন না, মেয়ে অভিবাসী হয়েছে বলে যার আফসোসের সীমা ছিলো না, বয়সের ভার নেমে এলে দুটো নিঃসঙ্গ জীবন কেমন করে কাটাবে বলে যিনি গভীরভাবে চিন্তা করতেন, দেশের টান মাটির মায়া ফেলে যিনি এদেশে আসতেই চাইতেন না, তিনি এতো অনায়াসে কি করে নিজে নিজেই অভিবাসী হয়ে যাবেন চিরদিনের জন্য এই নিরেট পরদেশের মাটিতে? এমন গাঢ় ঘুমে ডুবে যাওয়ার আগে কিছুই তো বলেননি তার চল্লিশ বছরের চেনা মানুষটা!

তার দৃঢ় বিশ্বাস, ইমতিয়াজ ঠিক হয়ে যাবেন। একটু পরই নিঃশ্বাস নেবেন। উঠে বলবেন, আমি ঠিক আছি মিলি। বলবেন, চলো দেশে যাই। নায়াগ্রা টায়াগ্রা দেখার দরকার নেই।

চোখের সামনে কি ঘটছে, সেটা মিলি আর দেখতে পায় না। চারদিক আঁধার হয়ে গেছে। চোখে তার পানি নেই। বুকের ভেতর ধুক ধুক শব্দটাও কি বন্ধ হয়ে গেলো? কি হলো ইমতিয়াজের? উঠে বসছেন না কেনো? ডাক্তারেরা যন্ত্রপাতি গুটাচ্ছেন কেনো?

মুখ দিয়ে কথা সরে না মিলির। শুকনো চোখে বোবা দৃষ্টি।

মাসুম এসে ঘরে ঢুকলো হন্তদন্ত হয়ে। খোলা দরজা দিয়ে দমকা একটা বাতাস এলো। যেনো উড়িয়ে দিতেই এসেছিলো বাতাসটা ইমতিয়াজের দেহের ভেতরের প্রাণপাখিটাকে, সেই তারার দেশে। মানুষের চির অভিবাসনের দেশে।